

মতিউর রহমান মল্লিক
র•চ•না•ব•লী

৬ষ্ঠ খণ্ড

মতিউর রহমান মল্লিক রচনাবলী

৬



মতিউর রহমান মল্লিক রচনাবলী
ষষ্ঠ খণ্ড

দেশজ প্রকাশন

মতিউর রহমান মল্লিক রচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ড

সম্পাদক

আবুল আসাদ

সম্পাদনা পরিষদ সদস্যবৃন্দ

ড. আ জ ম ওবায়দুল্লাহ

মোশাররফ হোসেন খান

সোলায়মান আহসান

তাফাজ্জল হোসাইন খান

সাইফুল্লাহ মানছুর

সাবিনা মল্লিক

কামরুন্নেসা মাকসুদা

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

নাঈম আল ইসলাম মাহিন

সহকারী সম্পাদক

আফসার নিজাম

ইয়াসিন মাহমুদ

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০২৪

গ্রন্থস্বত্ব : কবি পরিবার

প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম

প্রকাশক

মনোয়ারুল ইসলাম

দেশজ প্রকাশন, ক-১৫/২/এ, বি-১, (৩য় তলা),

জগন্নাথপুর, ভাটারা, ঢাকা-১২২৯

মোবাইল: ০১৭০৮১৬৯৩৩৮,

ই-মেইল : deshoz2017@gmail.com

ISBN : 978-984-98985-8-0

মূল্য : ৬৫০/ (ছয়শত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)।

সম্পাদকের কথা

বর্তমান সেকুলার সভ্যতার অন্যতম জনক আর্নল্ড টয়েনবী বলেছেন, ‘জগতের মৌলিক মহৎ সৃষ্টি ও কাজ ঈশ্বরের ইশারা থেকে হয়’। একজন খুব বড় চিকিৎসক তাঁর মেটেরিয়া মেডিকায় বলছেন, ‘চিকিৎসা আমরা করি না, ঈশ্বর করেন। ঔষধ দিয়ে যাচ্ছি কোনো ফল হয় না। হঠাৎ একদিন মাথায় এসে নতুন চিন্তার উদয় হলো। ঔষধ দিলাম, রোগ চলে গেল। এই চিন্তা আমার নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছা’। জগতের বিষয়কর সব মহৎ কর্মের ব্যাখ্যা এটাই। মহান আন্দোলন হোক, মহৎ মহাকাব্য হোক- সব মৌলিক চিন্তা ও সৃষ্টির পেছনে এবং মহৎ পরিবর্তনের মধ্যে থাকে দয়াময় আল্লাহর ইচ্ছা। বাংলা গানের জগতে মতিউর রহমান মল্লিকের রেনেসাঁর কথা যখন চিন্তা করি, তখন এটাই মনে হয় যে, বাংলা গানের এই রেনেসাঁ আল্লাহ রাক্বুল আলামিনের ইচ্ছা ও প্রেরণার ফল।

মল্লিকের লিখা গান, মল্লিকের গাওয়া গান বাংলা গানের চলমান ধারায় একটা বড় ঝড়, একটা বড় সয়লাব। কিন্তু এটা ধ্বংসের নয়, সৃষ্টির। বাংলা গানের চলমান ধারায় মল্লিকের গান নিয়ে আসে শক্তিমান ও সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা, লক্ষ্যকে করে সুনির্দিষ্ট। এই ক্ষেত্রে মতিউর রহমান মল্লিকের কোনো পূর্বসূরী নেই। মহাকবি কায়কোবাদের কাব্যে আমরা আজান শুনি, কিন্তু সেটা বিলাপের মতো। তা মসজিদের দরজা খোলে না, মুসলিম টানে না। দিকে দিকে পুনঃ জুলিয়া উঠিছে ধীন-ইসলামের লাল মশাল, ‘বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা শির উঁচু করি মুসলমান, ‘ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি, ইত্যাদির মতো হাজারো যুগান্তকারী কথা আমরা মহাকবি নজরুলের কবিতা-কাব্যে পাই। এগুলো আমাদের জন্যে মূল্যবান পাথেয়, কিন্তু পথ আমরা পাই না, পথের ঠিকানা এখানে নেই। আখা-অন্ধকার সেই যুগে মহাকবি নজরুলের পক্ষে তা দেয়া সম্ভবও ছিল না। ইসলামের কবি মহাকবি ফররুখ তাঁর কাব্য-মহাকাব্য-কবিতায় হেরার রাজতোরণের স্বপ্ন দেখেছেন। চেয়েছেন সেই রাজতোরণের দিকে মুসলমানদের আবার নতুন অভিযাত্রা হোক। তাই তিনি ‘রঙীন মখমল দিন’ এর শেষ ঘোষণা করে ‘মাঝি সিন্দাবাদ’কে ‘নতুন পানিতে’ সফরের জন্যে ‘হালখুলে’ দিতে বলেছেন। এখানে ফররুখ স্বাপ্নিক মহাকবি, বাস্তবের নায়ক তিনি নন। তিনি মঞ্চ পাননি, সামনে মানুষও পাননি। কিন্তু কবি মতিউর রহমান মল্লিক বাস্তবেরও নায়ক। তিনি গান লিখেছেন, সুর দিয়েছেন, আবার মঞ্চে তিনি তাঁর গানের গায়কও। তিনি স্বাপ্নিকমাত্র নন। তাঁর আহ্বান সুনির্দিষ্ট,

চাওয়া একেবারে সুস্পষ্ট। তাঁর গান দেশে ‘পূর্ণ ইসলামী সমাজ’ দাবি করে। বঞ্চিত মানবতার মুক্তির জন্যে ‘রাশেদার যুগ’ ফিরে পেতেও তাঁর গান উচ্চকণ্ঠ। সবার উপরে কবি মতিউর রহমান মল্লিক সৌভাগ্যবান যে, তাঁর অবর্তমানে তাঁর এই গানের পতাকা ভুলুষ্ঠিত হয়নি, ধারাবাহিকতা ধারণের জন্যে অব্যাহত পতাকাবাহীদের তিনি পেয়েছেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ, কবি নজরুল, কবি ফররুখের মতো কবি মতিউর রহমান মল্লিকও গানের জগতে একজন যুগস্রষ্টা। সফল ও ক্রমবর্ধমান একটা নতুন ধারার তিনি জনক এবং এই ক্ষেত্রে তিনি কিছুটা অনন্যও। কবি নজরুল, কবি ফররুখ, গায়ক আব্বাস উদ্দিন মুসলিম জনতাকে যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, যে জাগরণের বীজ তাঁদের মনে বপন করেছিলেন, সে জাগরণকে কবি মল্লিক ভাষা দিয়েছেন, পরিচয় দিয়েছেন, পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন। একটা উপযুক্ত সময়ে, প্রয়োজনের মূল্যবান মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের একটা ইচ্ছা তাঁর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

কবি রবীন্দ্রনাথ, কবি নজরুলদের বিশাল সাহিত্য-কর্মের মতো নয় কবি মতিউর রহমান মল্লিকের সাহিত্যকর্ম। তবে সংখ্যা দিয়ে সব সময় সাফল্য বিচার হয় না। ম্যাক্সিম গোর্কির এক ‘মা’ উপন্যাস রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ছিল মধ্যমণি। একটা গান, একটা কবিতা, এমনকি একটা কথাও বদলাতে পারে অনেক কিছুই।

অপরিশত বয়সে সবাইকে কাঁদিয়ে আমাদের মাঝ থেকে চলে গেছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। এই যুগস্রষ্টা কবির সাহিত্য-কর্মকে সংগ্রহে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগের ফল হিসেবে মতিউর রহমান মল্লিক রচনাবলী প্রকাশিত হলো। আমরা আশা করছি এতে মানুষের চাহিদা পূরণ হবে ইনশাআল্লাহ।

মল্লিক রচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডে ১টি কবিতার বই— কোকিল জ্যোতি; ১টি গানের বই— মোদের যাত্রা আল্লাহর পানে; ১টি ছড়ার বই—পঙ্গপাল গীতিকা; ২টি গল্পের বই—এক পেয়ালা অশ্রু, গল্প দাদুর আসর; ১টি স্মৃতিকথার বই— স্মৃতির মানিক; ২টি অনূদিত প্রবন্ধ; অনূদিত উপন্যাস— মহানায়ক (আংশিক); অভিভাষণ, ফ্ল্যাপ, গ্রন্থালোচনা, চিঠি, রচনাবলী সংগ্রহের ইতিকথা ও অ্যালবাম সংকলিত হয়েছে।

আবুল আসাদ

ষষ্ঠ খণ্ডে গ্রন্থিত বইসমূহ

কবিতার বই কোকিল জ্যোতি	১১
গানের বই মোদের যাত্রা আল্লাহর পানে	৬৫
ছড়ার বই পঙ্কপাল গীতিকা	১০৭
গল্প এক পেয়ালা অশ্রু গল্প দাদুর আসর	১১৫ ১৫৫
স্মৃতিকথা স্মৃতির মানিক	২০৩
অনূদিত প্রবন্ধ	২৬৭
অনূদিত উপন্যাস মহানায়ক	২৭৫
অভিভাষণ ফ্ল্যাপ গ্রন্থালোচনা চিঠি মল্লিক রচনাবলী সংগ্রহের ইতিকথা	২৮১ ৩২৩ ৩২৯ ৩৪৭ ৩৫৫

কোকিল জ্যোতি

[অগ্রদ্বিত]

কোকিলজ্যোতি

মতিউর রহমান মল্লিক



প্রসঙ্গ কথা

‘কোকিল জ্যোতি’ কবি মতিউর রহমান মল্লিকের একটি অশ্রুচিত কবিতার পাণ্ডুলিপি। মল্লিকের অধিকাংশ গান কবিতায় আল্লাহর পবিত্রতা ও রাসুলের স্তুতি দেখা যায়। এখানে তার ব্যত্যয় ঘটেনি। নজরুল তার প্রিয় কবি। তাকেও এখানে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছেন। তার প্রিয় মানুষদেরকে ঘিরে রয়েছে কিছু কবিতা। আরো কিছু কবিতা লিখেছেন সেগুলোতে বরাবরের মতই সমাজের নানা অসঙ্গতির বিরুদ্ধে শিরদাঁড়া উঁচু করে প্রতিবাদের পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে গেছে তার কবিতা। এ পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ লেখাই অপ্রকাশিত। পাণ্ডুলিপিটির প্রচ্ছদ ঐকেছেন আফসার নিজাম।

সূচিপত্র

সাম্প্রতিক/ ১৭
রাসূল (সা.)- এর শানে/ ১৮
ডানা খোলার শব্দাবলী/ ২১
আতিথেয়তা/ ২২
নজরুল/ ২৩
বিদ্যুৎ/ ২৫
মোবাইল/ ২৮
ফলক কবিতা/ ২৯
ধাওয়া/ ৩০
টাকার খেলা/ ৩১
সালমানের বিয়ে উপলক্ষে/ ৩২
প্রিয় বায়জীদ ও তাবাসসুম/ ৩৩
বিবাহ বার্তা/ ৩৪
বেঁচে রবে চিরদিন/ ৩৫
কবিতার প্রতি ভালোবাসা/ ৩৭
গীবতকারীরা/ ৩৮
দালাল/ ৩৯
সাধারণ/ ৪০
অলস/ ৪১
একটা কবিতা/ ৪২
উন্টোটাই/ ৪৩
বুশ/ ৪৪
ভয় আজ সব দিক/ ৪৫
খতম/ ৪৮
সকল দোষের/ ৪৯
সত্যবাদী সমাচার/ ৫০
ঔদ্ধত্য/ ৫১

একদা যখন/ ৫২
ভালো লোক সে হে/ ৫৩
আমার ভালো লাগে/ ৫৪
দেখো/ ৫৫
অর্থ/ ৫৬
একা একা আমি আর বয়ে পারছি না অসুখ/ ৫৭
শীতল ছায়া/ ৫৮
গোলপাতা/ ৫৯
ভোরের আলো/ ৬০
মানুষকে এখন মানুষই সন্ধান করে ফিরছে/ ৬১
তেল/ ৬৩

সাম্প্রতিক

এক.

ডালে ডালে উলুক বসেছে বানর;
[শঙ্কিত সকলেই- নারী কিবা নর!]
তছনছ করবে কি সাজানো বাগান-
হঠাৎ থামিয়ে দেবে পাখিদের গান।

দুই.

মাথার ওপরে ওড়ে শকুনের পাল-
ছায়ায় ছায়ায় কাঁপে সময় বেহাল;
ইতিউতি বয় হাওয়া দুর্ভাবনার-
সুখের ঠিকানা বুঝি করলো সাবাড়।

তিন.

হায়নার হাসি দেখি সর্বত্র
আড়ালে আড়ালে তার মারণাঙ্গ;
হিংসার হিংস্রতা ভরা বিদ্রূপ
দিশেহারা জনগণ বিস্ময়ে চুপ।

চার.

তবুও অতীত হেসে সাহস জোগায়,
ইতিহাস কাঁধে নেয় আগামীর দায়।
তবুও জ্বলতে থাকে আশার আশা-
বাড়াই কদম, বলি- খোদা ভরসা।

রাসুলের (সা.) শানে

রাসুলের শানে করা যাবে মাহফিল,
হরদম করা যাবে জস্নে জুলুস,
তঁার শানে শিরনির আপত্তি নেই,
দেদার খরচ করো টাটকা ফুলুস !

তঁার নাম-অঙ্কিত-পতাকা সবুজ,
বেহদ্ বানাও যতো ইচ্ছে মতোন,
তঁার শানে শ্রোগানের বন্যা বহাও,
চাঁদা তোলো একদম যখন-তখন !

তঁার শানে মঞ্চের সজ্জা আলোর
শতগুণ বাড়ানো সহস্র গুণ,
নতুন কাপড়ে পারো আতর লাগাও;
দমে দমে তঁার নাম করো গুণগুণ !

তঁার নাম লেখা টুপি মাথায় লাগাও,
ওয়াজের জয়বায় গড়াগড়ি দাও,
তঁার নাম শুনলেই বুড়ো আঙ্গুলে
চোখ বুজে চুকচুক করে চুমু খাও !

সুগন্ধি লোবানের ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায়
আঙ্গিনা সারা বাড়ি-ঘর ভরে যাক,
বয়ে যাক মচ্ছব গোলাপ পানির;
চারদিক মিলাদের সাড়া পড়ে যাক !

দরুদের মাঝখানে সবাই দাঁড়াও
অথবা দাঁড়াও কেনো কঠোর নিষেধ;
তঁার মানে ধ্যান করো কলবে কলব
এবং বৃদ্ধি করো শরীরের মেদ !

তাঁর শানে সুললিত প্রেস রিলিজ,
সুলিখিত বিবৃতি নরম-নরম,
সুশোভিত আয়োজন সিরিজ-সিরিজ,
তাঁর নামে বক্তৃতা গরম গরম !

তাঁর প্রেমে পাগড়ী ও লম্বা জামা-
গোলগাল-কানিফাড়া- যে-কোনো ঢঙের
পাঁচকলি-কিস্তি কি গান্ধী ও জিন্নাহ
ফটাফট পরে নাও যে- কোনো রঙের !

তাঁর শানে নাতিয়া-আবেগ-বিধুর,
তাঁর শানে উপদেশ অশ্রুসজ্জল,
তাঁর শানে হেদায়েত-মথিত-হৃদয়,
তাঁর শানে ত্রন্দন অধৈ-অতল !

তাঁর শানে হামদ-না'ত প্রতিযোগিতা
তাঁর শানে প্রবন্ধ-কবিতা ও গান-
যতো পারো লিখে যাও কোনো বাধা নেই
তাঁর নামে আবৃত্তি আজিমুশশান !

কোনো বাধা নেই বের করো পোস্টার,
পোস্টারে ভরে ফেলো প্রতিটি দেয়াল,
তাঁর বাণী দিয়ে আরো করো ফেস্টুন
দেয়ালের দিকে লোক দিক্না খেয়াল !

কোনো বাধা নেই করো নানান আসর,
তাঁর শানে গম্ভীর-গুরু সেমিনার,
তথ্যবহুল কোন করো প্রকাশনা,
ফাঁকে ফাঁকে ব্যবসার প্রচার-প্রসার !

কোনো বাধা নেই কেনো গরু-ছাগ-মেঘ,
প্রেমের পাল্লা দিয়ে কিনে আনো উট
[সিরাসরি আরবের মূল মাটি থেকে],
তাঁর শানে কোরবানী-বাত্ নেহী খুট !

রসূলের শানে সব উজাড় করার
উদ্যোগ নাও খাঁটি? আশেকে রসূল?
এশকের দরিয়ায় মারো জোরে গুতো-
এশকের বন্যায় ভাসাও দুকূল !

মণ-মণ জিলিপি ও বাতাসার মেলা
বসাও যেখানে তুমি বসাতেই চাও,
তাঁর শানে মোটামোটা দাও মোমবাতি,
তাঁর শানে মাজারের জেল্লা বাড়াও !

তাঁর শানে গাঞ্জায় দম মারা যাবে,
তাঁর শানে খিচুড়ির করো ধুমধাম,
তাঁর শানে কাওয়ালীর ক্যাসেট চালাও,
মাস্তকালান্দার জোর দামাদাম !

তাঁর শানে বাজি মারো বোমাও ফাটাও,
বিকট শব্দে কেঁপে উঠুক সবাই ।
লেগে যাক হুড়োহুড়ি পাড়ায়-পাড়ায়
কী যে মীলাদুল্লবী বুঝুক সবাই !

তাঁর শানে নানাবিধ অনুষ্ঠানের
তলেতলে কূটচাল উর্ধ্বতলার,
তলেতলে কূটনামি ক্ষুদ্র মনের-
একজন অন্যকে পেছনে ফেলার !

তাঁর শানে খাস দোয়া দরুদ-সালাম,
একছের যতো খুশি ততো পড়া যাবে;
বিশেষ চেল্লা দেয়া, হালকা জিকির-
তাঁর শানে যাহা খুশি তাহা করা যাবে ।

গুধু তাঁর রাজনীতি, তাঁর পথে দল,
কিলকুল নাজায়েজ, হারাম-হারাম !
সমস্ত ইবলিস, সব শয়তান
একযোগে ফতোয়ার দাগলো কামান...

ডানা খোলার শব্দাবলী

ক'জন মানুষ এমন আছে যে
বাজপাখির মতো ওপরে উঠে যেতে পারে এবং
এক নীলিমা থেকে আরেক নীলিমায়
ছড়িয়ে দিতে পারে খোলা ডানার শব্দাবলী

বেশীর ভাগ মানুষই এখন
হৃদয়ের মধ্যে দুর্গন্ধ ধারণ করে আছে
অথবা মাকাল ফলের মতো
গাঢ় রঙের ওপর চালাকি ধরে রাখতে লাগলো ।

ক'জন মানুষ এমন আছে যে
বৃক্ষের মতো কাউকে হিংসে করে না
ছায়ার মতো উন্টিয়ে ফেলে না ক্রমধারা
নদীর বহতর মতো বয়ে যায় সবার জন্য
দখিন হাওয়ার মতো উড়ে যায় সকল দিকে

স্বাধীন পাখির মতো গান গেয়ে যায় সমস্ত আকাশে
বেশীর ভাগ মানুষই এখন
বিশ্বাসঘাতকতায় ব্যস্ততম শহুরে গাঁই অন্তত
এক-একটা সিঁড়ি মাড়িয়ে থুথু ছিটাতে লাগলো প্রতিটি সিঁড়িতে প্রায়
এবং পাড়ি দেয়া পথের ওপরেই ফেলে গেলো
অকৃতজ্ঞতার সর্বশেষ আবর্জনা

ক'জন মানুষ এমন আছে যে
এক নীলিমা থেকে আরেক নীলিমায় ছড়িয়ে দিতে পারে
ডানা খোলার শব্দাবলী

আতিথেয়তা

অতিথি সেবার কিছু নিয়ম আছে
যার আছে জ্ঞানা তাহা
সে সেবাটা করা আহা
পানির মতোন লাগে তাহার কাছে

অতিথি সে যেই হোক— অনেক বড়
প্রথমেই তারে তুমি সালাম করো
যত্নের সাথে পরে: বসতে বলো
হাত ধরে বসবার ঘরকে চলো

তারপর কুশলাদি জেনে নাও তাঁর
জেনে নাও কেমন আছে তার পরিবার
নিশ্চয় অতিথির কাজ আছে কোনো
বিনয়ের সাথে তাই তার কথা শোনো

নজরুল

আকাশের বুক থেকে সূর্যটা ডুবে গেলে
আকাশের থাকলোটা কি
বাতাসের মুখ থেকে নিঃশ্বাস উবে গেলে
বাতাসের থাকলোটা কি

পাহাড়ের গৌরব ভূমিধসে মিশে গেলে
পাহাড়ের থাকলোটা কি
বাহারের সৌরভ ঝঞ্ঝায় পিষে গেলো
বাহারের থাকলোটা কি

সাগরের গেহ থেকে তরঙ্গ উড়ে গেলে
সাগরের থাকলোটা কি
আগরের দেহ থেকে সুগন্ধ দূরে গেলে
আগরের থাকলোটা কি

পাখিদের পাখা থেকে পালকরা খসে গেলে
পাখিদের থাকলোটা কি
আঁখিদের নীড় থেকে দৃষ্টিরা চলে গেলে
আঁখিদের থাকলোটা কি

বৃক্ষের অন্দর ঘুণে ঘুণে ভরে গেলে
বৃক্ষের থাকলোটা কি
নিঃশ্বের অন্তর ধুকে ধুকে মরে গেলে
নিঃশ্বের থাকলোটা কি

মানুষের মন থেকে মানবতা চলে গেলে
মানুষের থাকলোটা কি
ফানুসের কোণ থেকে বায়ুকণা গলে গেলে
ফানুসের থাকলোটা কি

স্বদেশের মাথা থেকে জাতীয়তা মরে গেলে
স্বদেশের থাকলোটা কি
স্বদেশের ভাষা থেকে রং-রূপ ঝরে গেলে
স্বদেশের থাকলোটা কি

দাদাদের গাড়ি থেকে রবি বাবু পড়ে গেলে
দাদাদের থাকলোটা কি
আমাদের বাড়ি থেকে নজরুল সরে গেলো
আমাদের থাকলোটা কি

বিদ্যুৎ

বিদ্যুৎ মানে না সে কাউকেই
মানে না সে বড়লাট রাষ্ট্রপতি
এই এলো এই গেলো ইচ্ছে মতো
বোঝে না সে কারো কোনো লাভ ও ক্ষতি

বিদ্যুৎ একদম থোড়াই কেয়ার
মানে না সে বড় বোন-ভগ্নিপতি
যেমন সে ফ্যানগুলো থামালোই
নিলো না তো কারো কোনো অনুমতি

কখনো সে বাথরুমে রাত্রি আনে
বুড়ো কি শিশুর মতো তার হেঁয়ালী
পাকের ঘরেও তার বড় অনিয়ম
বিদ্যুৎ মোটামুটি খামখেয়ালী

বলা যায়, লেখাপড়া চায় না তো সে
চাইলে তো ছুট করে যেতো না
পরীক্ষা ভালো হোক তাও চায় না
এতো আলো-হাওয়া লুট করে খেতো না

আমাকেও দেয় না সে পাতাই
দিলে ঠিক ঢাকতো না আঁধারেই
আমাদের সকলকে খাইয়েই
হাত দেন ঠিক যেই খাবারেই

বই টিভি পত্রিকা তাও তার সয় না
জমতে না জমতেই হঠাৎ উধাও
রেগেমেগে পেট যতো উঠুক ফুলেই
লাভ নেই দিয়ে তার পেছনে ধাওয়াও

বিদ্যুৎ বরাবরই বেশ ব্যাকোল
খোকনের সঙ্গেও মারে ইয়ার্কি ,
দুই চোখজুড়ে তার ঘুম নামতেই
ঢাকা ছেড়ে চলে গেলো নিউ ইয়ার্ক কি

একরোখা বিদ্যুৎ নিয়ে কথা উঠাতেই
বললেন দাদু ভাই হেসে এক গাল
বিদ্যুৎ দোষী নয় দোষী আমরাই
আমরাই আমাদের করি পয়মাল

তার মানে আমরাই যারা নাগরিক
আমরা কি আমাদের ধর্ম ধারি
ছাড়তে কি পারলেন উপরি-পাওয়া
মানে যারা বিদ্যুৎ কর্মচারী

মানুষের মতো এরা কাজ করে কি
কামচোর নাকি এরা বর্ণচোরা
ভালো জন দুই চার সবকি ভালো
অধিকাংশের কাজ গর্ত খোঁড়া

গর্তটা খোঁড়ে এরা চোখে-মুখে-বুকে
গর্তটা খোঁড়ে এরা হায় কলিজায়
গর্তটা খোঁড়ে এরা গরিব দেশের
ঈমান-আমল আর দেহ-আত্মায়

এই দশা দুর্দশা সবখানে ভাই
সব ভাগে, বিভাগে ও সব সেক্টরে
এই দশা সারাদেশে অস্তুবিহীন
সত্যি কি না তা দেখো চেক করে

হাঁপ ছেড়ে দাদু ভাই চুপ করতেই
সকলেই একসাথে বলে উঠলাম
দাদুভাই এর কোনো সমাধান নেই
সকলেই একসাথে জ্বলে উঠলাম

আল্লার ভয় ছাড়া সমাধান নেই
সুশাসন ছাড়া কোনো নেই সমাধান
তার মানে আল্লার দেয়া সে আইন
যে আলোয় সত্বলোক রাষ্ট্র চালান

এই বলে দাদুভাই শেষ করলেন
আমাদের চারিপাশে তখনো আঁধার
তখনো আসেনি ঘরে ফিরে বিদ্যুৎ
অথচ উঠলো নড়ে হৃদয়ের তার

অন্তরে অন্তরে জ্বললো হঠাৎ
অদ্ভুত বিদ্যুৎ রোদের অধিক
আঁধারের বুক চিরে আলোর রেখা
উপলব্ধির দূত বোধের অধিক

মোবাইল

একেক রকম মোবাইলের
একেক রকম শব্দ
শব্দ শুনে বোকার মতোন
হই যে হঠাৎ জন্ম

মিউ-মিউ-মিউ ডাকলো বিড়াল
সেদিন বাসের ভেতর
ঘাড় ফিরাতেই দেখতে পেলাম
ফোনের মধ্যে এ- ঘোর

ঘোড়ার ডাকে অবাক হলাম
তীব্র হ্রেষা হি-হি-
একটু পরে পাখির আওয়াজ
সূক্ষ্ম এবং মিহি

ঘেউ ঘেউ ঘেউ কুস্তা ডাকে
দৌড় দিয়েছি যেই
কে যেনো কয় কল এসেছে
পালাস কেনো এই

একদা এক অনুষ্ঠানে
অবাক হলেন বাজান
পাশের লোকের হাতের ভেতর
উঠলো বেজে আজান

চমকে সেদিন কান পাতলাম
মিষ্টি গানের সুরে
আমার মোবাইল বাজছে দেখি
আমার পকেট জুড়ে

যার যে-রকম রুচিরে ভাই
যার যে-রকম কাজ
তার মোবাইল তুলবে ঠিকই
তার তোলা আওয়াজ ।

ফলক কবিতা

এক.

ব্যাংকার

শাপলা, হরিণ, যমুনা কি মসজিদ

মারার ব্যাপারে দারুণ

অথবা বিকট লালসার কাছে

হার মেনে যায় কারুন

রিরংসা এস্তার।

দুই.

ব্যাংকার

অফিসেই রাখে দড়াদড়ি যতো

অফিসেই রাখে গিট

ঘরের জন্য বরাদ্দ শুধু

কাত হয়ে থাকা পিঠ

জানে না জীবন কার?

তিন.

ব্যাংকার

গাধার মতোন খাটে ভোর থেকে

রাত তক্ একটানা

দেশ-জাতিগত স্বপ্ন এবং

ছেলে-মেয়ে সাক্ষ্যনা

কঠিন সাধনা তার।

ধাওয়া

ভার্সিটিতে বইছে পাগলা হাওয়া
সকাল-বিকাল ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া

কোথায় গেলো খাতা-কলম-বই
কে রাখে খোঁজ, কে জানে তা কই
তার বদলে হকিইস্টিক এবং
বরাক বাঁশের
লাঠির বাড়ি খাওয়া

‘যে কোনো জ্ঞান অর্জন করা যায়’
কতেক ছাত্র পেয়েছে সেই সায়
তাই কি তারা শিখতে ফাটাফাটি
ক্যাম্পাসে রোজ করছে আসা-যাওয়া

মানুষ গড়ার আঙিনার ঐ ভূত
অজ্ঞানতার অন্ধকারের দূত
সবাই মিলে আচ্ছা মতো করে
সাইজ করার বানাও নতুন দাওয়া

প্রাচ্যদেশের অক্সফোর্ড ফের ঠিক
ভরাক বিপুল খ্যাতিতে দশ দিক
ছাত্র-ছাত্রী আবার নতুন করে
পড়ার নেশায় ভুলুক খাওয়া-নাওয়া

টাকার খেলা

চলছে টাকার ছড়াছড়ি আজ চতুর্দিকেই টাকার খেলা;
চোখ মেলে দেখো- ভেতরে-বাইরে বসেছে কেমন টাকার খেলা।

টাকায় ভ্রষ্ট হচ্ছে যে নীতি, ভ্রান্ত হচ্ছে বহু নীতিবিদ-
খুঁড়ছে দেশের ভেতরে তারাই শত্রু ঢোকানো গোপন সিঁদ!
বিক্রয় করে দিচ্ছে স্বদেশ মহামুক্তির ডুবিয়ে বেলা।

মুক্তমাটির ওপর এ-কোন পরাধীনতার কাল-আছর?
বসেছে জগৎ শেঠের আসরে ঘষেটি বেগম, মীর জাফর!

টাকা খেয়ে খেয়ে খাচ্ছে বিবেক, খাচ্ছে আত্মমর্যাদা সব-
স্বাভ্যাত্যবোধ বেচে দিয়ে আজ করছে এ- কোন মহা-উৎসব!
মাতৃভূমিরে ডুবিয়ে হায়রে ভাসায় নিজের সুখের ডেলা।

সালমানের বিয়ে উপলক্ষে

তোমার স্বভাবে
বিনয় দেখেছি,
দেখেছি যে ভদ্রতা;
অহংকারের বদলে দেখেছি
উদার মানসিকতা।
যোগ্য-পিতার সন্তান তুমি,
যোগ্য মায়ের ছেলে;
তোমার মতো সুচারু সুবোধ
খুব কি একটা মেলে।

নতুন জীবনে তুমি আরো হও
শুভ সমুজ্জল,
মোছাও সাদরে জাতির অশ্রু,
দেশের অশ্রুজল।
সকল মানুষ তোমার নিগড়ে
খুঁজে পাক সান্ত্বনা,
সবাই তোমার শুভ কামনায়
যাক করে প্রার্থনা
তোমার নতুন ঘরের ওপরে
নামুক জোছনা ধারা
দখিনা বাতাস নতুন আবেগে
হোকনা আত্মহারা

নতুন ডানার নতুন পাখিরা
আকাশে উড়াল দিক
নতুন প্রভাবে
নতুন আলোর
দিগন্ত চিনে নিক

তোমরা আলী ও ফাতেমার মত
হও সেরা দম্পতি
স্বপ্ন এবং বাস্তবতায়
গড়ে তোলো সংহতি

প্রিয় বায়জীদ ও তাবাসুম

খুশি মনে কিনে নিও
তোমরা যা চাও
দিলাম হাজার টাকা
দু'হাত বাড়াও ।

তোমাদের সুখ হোক
অনন্ত সুখ
শান্তিতে তোমাদের
ভরে যাক বুক ।

আমরা দু'হাত তুলে
করি মোনাজাত
তোমাদের দুজনের খুলুক বরাত
সব বাধা পার হও দুজনে
ভরে যাক ধরা কুহু কুজনে ।

বিবাহ বার্তা

ভাই, হুমায়ুন কবির ভাইয়ের
বিয়ের খবর শুনে,
যেতে টেতে পারবো না, হায়
দেখলাম তারিখ শুনে।

তবুও দোয়া থাকলো আমার
ভাই ও ভাবীর জন্য,
ফুল-ফসলে হউক তাদের
নতুন জীবন ধন্য।

এবং যদি যাই কখনো
হঠাৎ গাজীপুর,
শিল্পী-লেখক সঙ্গে নিয়ে
ভাবীর হাতের রান্না খেয়ে,
পেটটা যেনো হয়গো মোদের
খাবারে ভরপুর।

বেঁচে রবে চিরদিন

[মরহুম মাহমুদ হোসাইন আল-মামুন ভাই স্মরণে]

নিজামী ভাইকে দেখলে তোমাকে দেখি,
অথচ দেখিনা কোথাও তোমাকে আজ,
আমিন ভাইকে দেখলে তোমাকে দেখি,
অথচ দেখিনা কোথাও তোমাকে আজ,
শাকের মণিকে দেখলে তোমাকে দেখি,
অথচ দেখিনা কোথাও তোমাকে আজ,

মগবাজারের মানুষের ভীড়ে তোমাকে পাই না কেন?
আসাদ ভাইয়ের দোকানের কাছে তোমাকে পাই না কেন?
দৈনিক সংগ্রামের নিকটে তোমাকে পাই না কেন?
বাগান বাড়ির বাসাতে এখন তোমাকে পাই না কেন?
ঢাকা শহরের কোথাও এখন তোমাকে পাই না কেন?
তোমার মেহেন্দীগঞ্জে এখন তোমাকে পাই না কেন?
গোটা বরিশালে কোথাও এখন তোমাকে পাই না কেন?
সারাবাংলার কোথাও এখন তোমাকে পাই না কেন?

শান্ত-ভদ্র তোমাকে দেখি না আজ,
জ্ঞানী-পণ্ডিত তোমাকে দেখি না আজ,
গুণী-সংগ্রামী তোমাকে দেখি না আজ,
নীরব সাধক তোমাকে দেখি না আজ,
লোভহীন লোক তোমাকে দেখি না আজ,
বন্ধু ও ভাই তোমাকে দেখি না আজ,
আল্লাহর দাস তোমাকে দেখি না আজ,

তোমার দারসে কুরান শুনিয়া হয়!
তোমার দারসে হাদীস শুনিয়া হয়!
তোমার বিনীত ভাষণ শুনিয়া হয়!
তোমার হাসির শব্দ শুনিয়া হয়!
তোমার মিষ্টি আদেশ শুনিয়া হয়!
তোমার কঠোর নিষেধ শুনিয়া হয়!

আজ আর কোন সফর করোনা কেন?
মায়ের জন্য পেরেশান নও কেন?
বৈঠকে যেতে তাড়াছড়া নেই কেন?
অধ্যয়নের সুযোগ খোঁজোনা কেন?
রিপোর্ট রাখার নিয়ম মানো না কেন?
ছেলেমেয়েদের খবর রাখ না কেন?
কর্মীর সাথে যোগাযোগ নেই কেন?
সুখীদের সাথে দেখা করো না কেন?
বোন-ভাইদের পত্র লেখো না কেন?
আমাদের সাথে কথাও বলো না কেন?
সংগঠনের খোঁজও রাখনা কেন?

বুঝি- তুমি আর কোথাও আজকে নেই,
বুঝি- তুমি আর জবাব দেবে না কোনো,
বুঝি- তুমি আর ফিরবে না কোনো দিন,
বুঝি- তুমি আর কইবে না কোনো কথা।

জানি- তবু তুমি আদর্শে অমলিন!
জানি- তবু তুমি প্রেরণায় প্রোজ্জ্বল!
জানি- তবু তুমি মোমিন মৃত্যুহীন!
জানি- তবু তুমি উৎসাহ মনোবল!
জানি- তবু তুমি জেহাদে ও সংগ্রামে
আমাদের মাঝে বেঁচে রবে চিরদিন!

কবিতার প্রতি ভালোবাসা

যে হাসি দেয় না নারী তা-ই তুমি দাও
যে গান গায় না নারী তা-ই তুমি গাও
অথবা নারীর মত গান গাও বলে
কবিতা তোমার কাছে পড়ে রইলাম
জীবনের সব জ্বালা-পোড়া সহিলাম

গীবতকারীরা

গীবতকারীরা হাসির আড়ালে হাসে
মিছরির ছুরি দুই ঠোঁটে স্টেটে রাখে
ঝরে ঝরে পড়ে বিনয়ের এসরাজ
বিনয় নাকি সে ছোবলের ছলকলা

গীবতকারীরা গুপ্তচরের হাত
সম্ভরণে ঢুকে পড়ে তলদেশে
তারপর সব শেকড়ের দিন শেষ
ঝুই-কাতলাও তাদের নিকটে চুল

গীবতকারীরা মূলত জগৎশেষ
নাকি কেল্লাইভ-তিমিরের ব্যবসায়ী
মীরজাফরের ভেতরের কালসাপ
ওপরে ওপরে সাদা হাস্যের সাঁই

গীবতকারীরা হরিণ-শাপলা সব
সুযোগ পেলেই পকেটে ঢোকায় দ্রুত
হাত-সাফাইয়ের সুদক্ষ কারিগর
অনেক মিথ্যা বয়ে চলা গুয়েমীই

গীবতকারীরা মৃত ভ্রাতাদের গোস
শকুনের মতো পরমানন্দে গেলে
তারপর যতো দুর্গন্ধের টিবি
ফেরি করে ফেরে জনান্তে জনে জনে

গীবতকারীরা উদ্ধত হাতে ছেঁড়ে
সম্পর্কের সব মধ্যস্থতা
এবং ছড়ায় বীভৎস হানাহানি
গৃহযুদ্ধের নাকাড়া বাজানো লোক
এরা এনে দেয় সিরাজের পরাজয়।

দালাল

দালাল দালাল আন্ত দালাল
চতুর্দিকে দালাল
কারোর বা নাম নির্মল সেন
জলিল কিম্বা জালাল

কেউবা দালাল ছাগল-ভ্যাড়ার
কেউবা দালাল পাগল-ত্যাড়ার;
কেউবা দালাল-ঘুষখোরদের
সুদ করেছে হালাল

দালাল দালাল
ভারতীয় দালাল সবচে জঘন্য
এই দালালদের ঠোঁড়তে চাই
একান্তরের সৈন্য ।

সাধারণ

কেউ আসে দুনিয়ায় বড় নেতা হতে ভাই
জাঁদরেল ব্যবসায়ী হতে কেউ
কেউ আসে সাগরের জ্ঞানী-গুণী হতে আর
দরদী হাতেম তায়ী হতে কেউ

সিপাহসালার কেউ হতে আসে দুনিয়ায়
চিকিৎসা শাস্ত্রের সেরা হতে কেউ
প্রযুক্তি-বিজ্ঞানে তুলনাবিহীন হতে
আসে মহাশক্তির ডেরা হতে কেউ

কেউ আসে ক্ষমতার বাগডোর হতে ভাই
দণ্ড ও মুণ্ডের হবু হতে কেউ
ফেরাউন-নমরুদ-বুশ হতে আসে কেউ
নির্মম-নিষ্ঠুর প্রভু হতে কেউ

একেবারে সাধারণও হতে কেউ আসে
সহজ-সরল হাসি আঁধারেও হাসে।

অলস

অলস মানে বাজে
সে লাগে না কাজে
বরং সে এক বিরাট বোঝা
হরেক বোঝার মাঝে ।

একটা কবিতা

একটা কবিতা চাঁদের চেয়েও রহস্যময়
কেননা চাঁদ আবিস্কৃত হয়ে গেলেও
এখনো আবিস্কৃত হয়নি অনেক কবিতা

একটা কবিতা ছাপত্যের চেয়েও বিশালতা

উল্টোটাই

বুশ মশায়ের স্বপ্ন ছিলো একদিনেই
কম্বাকবার করবে সারা বাগ্‌দাদের।

দালান-কোঠা গুড়িয়ে দেবে,
রাস্তা-ঘাটও উড়িয়ে দেবে,
লাশের পরে লাশ মাড়িয়ে পথ চিনেই
তারপরে ঠিক ধরবে টুটি সাদ্দামের।

কিন্তু হলো এককেবারে উল্টোটাই-
নিচ্ছে খুলে ছিড়া-ছিড়া,
ক্যাচক্যা মারে ইরাকীরা,
ল্যাংটা করে বুশসেনাদের জাঙ্গে-টাই!

বুশ

বাসপেতে বারোয় দেহি কি
জিউতপালা বুশরে দিছে ফাঁসি
তারের বেড়ায় কল্লা ঝুলতিছে
পাছার মন্দির ফেলাগ দুলতিছে
অলপেট্টু আগোয় গেলাম যেই
কাণ্ড দেখে চমকে ওঠলাম সেই
বুশের হাতে হেরকিনেই হয়
বাঁশ ঢোকানো জাগার মতো জাগায়

বাংলামোটর আটে যাতি যাতি
বুশরে নয়ে দ্যাকলাম মাতামাতি
কেউবা তারে টানতিছে কান দরে
গুয়ার কয়ে দিতিছে গাল জোরে

মুহম্মদপুর ফিরে যায়ে দেখি
বুশের গালে তালে তালে একি
ছেঁড়া জুতো মাতিছে ছেমড়ারা
জাংগে ধরে টানতিছে ত্যাড়ারা

বাসায় এ্যাসে ভাবতি লাগলাম মেলা
হঠাৎ দেখলাম এহানেও এক খেলা
ছোটো মায়ে বুশের ছবি আঁকে
ঝাটা দিয়ে বাড়েতিছে ব্যাকে

ছোয়ালডাও বাতিলা বালিশ নিয়ে
বুশ বানায়ে জুতোর মালা দিয়ে
কুস্তা কয়ে গাল দিতিছে মানে
বুশের শ্রাদ্ধ কত্তিছে সমানে

বড় মায়ে কি আর কত্তি পারে
বুশের পাছায় লাগায় লাখি ঝাড়ে
ঝাড়ির চোটে অমনি অকস্মাৎ
বুশডা হলো জনুর কুপোকাত
বুশের হয় না হুঁশ
যতোই পোড়াক পুত্তলিকা কুশ।

ভয় আজ সব দিক

ভয় আজ সব দিক
সবখানে ভয়-ডর
মন কাঁপে প্রাণ কাঁপে
বেশী কাঁপে অন্তর

সেই সাথে এক ফাঁকে
বেলটিপে ডাকাতির
ভরাকোপ চাইনিজ
কুড়ালের চাপাতির

ঘরে ভয় রাগারাগি
ঘোর ঝড় ঝঞ্ঝার
অহেতুক কালো মেঘ
অহেতুক ঝগড়ার

পথে ভয় হানাহানি
রাহাজানি হাইজ্যাক
ছিনতাই বোমাবাজি
সারাদেশে এক দেখ

আরো ভয় সহসাই
গাড়িচাপা পড়বার
পথে ঘাটে একেবারে
অকারণে মরবার

অফিসের ভয় ভাই
বড় বেশী ভয়নক
কার পেটে লাথি পড়ে,
নেমে আসে মহাশোক।

সরকারী অফিসের
বড় ভয় আজকাল?
সরকারী দলছাড়া
চাকরিটা বানচাল!

ভার্সিটি জুড়ে ভয়
কার যায় ইজ্জত
সেধুরিকারীদের
সীমাহীন হিম্মত

বস্ত্রটা হারানোর
ভয় আজ সেখানেও
লজ্জার মাথা খেকো
ক্ষয় আজ সেখানেও

লেখাপড়া না হওয়ার
মেলা ভয় কলেজেও
মাস্তানী কারবার
চুকেছে এনলেডেও

স্কুল খালি নেই
এখানেও গুন্ডার
ভয়ে কাঁপে ছেলে মেয়ে
ভোঁ-ভোঁ করা ছন্ডার

লঞ্চার ভয় নাকি
আনসার পুলিশও
রহস্য গুটু এর
বোঝে গাথা-ফুলিশও

বাসে ভয় পকেটটা
এই বুঝি হয় সাফ্
ঘর থেকে বের হওয়া
নিশ্চয় মহাপাপ

উপদেশ দিতে গেলে
ভয় কি যে ঘটে যায়
কোন বেয়াদব ফের
ভয়ানক চটে যায়

মজ্জিমে কোরানের
তাকসীর করা ভয়
যদি সেই তাকসীরে
জালেমের ক্ষতি হয়

টুপি-দাড়ি নিয়ে চলা
ফেরা করা ভয় খুব
গালি খেয়ে মার খাওয়া
বিচিত্র নয় খুব

মাদরাসা গড়ে তোলা
আজকাল আরো ভয়
সরকারী অনুদান
পাওয়া অতো সোজা নয়

দ্রব্যের দাম দেখে
হাঁটু কাঁপে বাজারেও
পাওয়া যেতো শত'তে যা
পাওয়া দায় হাজারেও ।

খতম

বুশ মানে না জাতিসংঘ
বুশ মানে না কিছু
বুশটা এমন জারো এবং
বুশটা এমন নীচু
বুশ মানে না আল্লা-খোদা
বুশ মানে না যীশু
নির্বিচারে তাইতো মারে
মানুষ-নারী-শিশু
কোন্ হারামী বুশের সঙ্গে
করতে চাচ্ছে আপোষ
বানা তারে
টয়লেট পেপার
বানা তারে পাপোষ
কাছা মাইরা
বুশের চামড়া
তুইলা লাগা লবণ
ব্রেয়ারের সঙ্গে তারে
কুপাইয়া কর খতম ।

সকল দোষের

খিন্তি-খেউড় আজন্মকাল
করতে যে অভ্যস্ত
অষ্টপ্রহর সবসময়ে থাকবে
সেতো সেই কাজেতেই ব্যস্ত

ঠোটকাটা ঐ বুয়ার
স্বভাব বাচাল গৌয়ার
যে জীবন তার ছন্নছাড়া
যৌবন অবিন্যস্ত

আসলে তার জীবন অবিন্যস্ত
ন্যস্ত তার উপর সব যদিও ন্যস্ত
দেখলে সে জজ্ উকিল
করেই ছাড়বে একটা হ্যস্ত ন্যস্ত

সম্প্রতি জজ্-উকিল
দেখলে দেখায় কিল
আর সে বলে: সকল ডাকাত
ওরাই পোষে-মদদ দাতাও আস্ত

তার দিতে হয় নিত্য গালি
কারণ ছাড়াই খালি-খালি
নিজের ঘাড়ের সব অপরাধ
করতে যে হয় অন্যের ঘাড়ে ন্যস্ত

চরিত্র তার আবরু মারা
কে বিচারক উকিল কারা
দেখে না সে কেননা তার
জীবন এবং যৌবন অবিন্যস্ত

সংসদে হায় সে যদি যায়
সময় কাটায় কুৎসা গাওয়ায়
এবং চোরের মায়ের মতো
করেই ছাড়ে একটা হ্যস্ত-ন্যস্ত ।

সত্যবাদী সমাচার

সত্যবাদী তার চে বড়
কে আছে আর বলো !
সেই দাবীরই প্রমাণ দিতে !
তাকেই বলতে হলো—

সত্য কথা বলেই যাবো ,
না হয় গালিগালাজ খাবো ,
না হয় আমায় বললো লোকে
ধাপ্পাবাজ আর খল্-ও ।

বিচারকরা ঘরে-ঘরে ,
সম্মানীদের লালন করে ,
উকিলরাও সেই তাদেরই
করছে ঠিকই ফলো ।

রসিকরা কয় সকল বিচার ,
নিজের দলের পক্ষে নিবার
তরেই ওসব লম্বা কথা
জঘন্য কৌশল-ও !

ঔদ্ধত্য

ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়াটা
আমার একেবারেই বরদাস্ত হলো না বলে
সত্যিই সরে দাঁড়িলাম ।

দেখি, প্রথম পুরুষের চেয়ে
প্রথম মহিলা খুব বেশী রকমের ভয়ানক
এবং একটা চৌকাঠ
পুরো ঘরটাকেই দাবড়িয়ে বেড়াচ্ছে
দেখি রসের বিনিময়ে পাওয়া তাদের এক সম্বন্ধ সূত্র
আরো ভয়ঙ্কর-আরো গডফাদার
আরো সাইলকের মতো ধড়িবাজ

রৌদ্রের উজ্জ্বলতার মধ্যে অন্ধকারের
পক্ষপাত আমি সহ্য করতে পারলাম না বলে একান্তই সরে দাঁড়িলাম

দেখি, দারোগার চেয়ে মাঝি আরো রক্তচক্ষু
পদলেহীদের পৈত্রিক ভাষায় তা ঔদ্ধত্যও হতে পারে ।

একদা যখন

একদা যখন রাজনীতি ছিলো সংস্কৃতির বাহন
অর্থনীতির বাগডোর ছিলো দুর্কষ্টির বাহন
শিক্ষানীতির সবকিছু ছিলো মনুষ্য উন্মেষ
মুক্তির উদ্দেশ্যসমূহ তখন নদী বয়েছিলো বেগে
পাখি উড়েছিলো নীড়-ফেরা উড়েগে

একদা যখন রাজনীতি ছিলো তমদ্দনের গান
নায়কেরা ছিলো গায়কের মতো শায়কেও ছিলো প্রাণ
শিল্পীর মতো চিকিৎসকের মতো ও পথের
মেলবন্ধন ছিলো মৌলিক ধারায় সেবার সকল পাড়ায়

একদা যখন রাজনীতি ছিলো কবিতা-স্বদেশ-জাতি
এনেছিলো কাছে দূরের আকাশ স্বাভী হয়েছিলো জ্ঞাতি ।

ভালো লোক সে হে

ভালো লোক সে হে
যতো ভালো হোক
যতো দাম তারে
দিক শত লোক
ভেতরে ভেতরে
সেই লোক যদি
সহায়তা দেয়
অন্যায় কাজে
তার তো থাকে না দ্বীন

আত্মহ নিয়ে পাপ কাজ করে
পরকালে উদাসীন
তাওবার কথা করে না স্মরণ
এতোই চেতনা হীন
খারাপ লোকেরা
খারাপের মাঝে
খুঁজে ফেরে যতো
আনন্দ বাজে
ইচ্ছে করেই
ঐ পরিবেশে
মানিয়ে নেয় যে
পুরোই নিজেকে
তার আশা বড় ক্ষীণ

আমার ভালো লাগে

আমার ভালো লাগে—

ভালো মানুষ

উদার মানুষ

হাসির মানুষ

খুশির মানুষ

সরল মানুষ

সহজ মানুষ

ধ্যানের মানুষ

জ্ঞানের মানুষ

অহংকারী মানুষ আমার

ভালো লাগে না...

দেখো

রক্তচোখের অধিকারিণীকে দেখো
কথা বানাবার কতো কৌশল তার
আদমের চিরশত্রুও হেরে যায়
ধার-সে ধারে না দু-চোখের পর্দার

কোন্ বিড়ালীনি হত্ব করে এসে বলো
‘ঈদুর হোঁবে না’- শপথ রেখেছে ঠিক
কয়লার কাছে স্বচ্ছতা চাওয়া ভুল
কেননা যে তার ময়লা তো মৌলিক ।

অর্থ

অর্থের খোঁজে জীবন করেছে পাত
অথচ কখনো জীবনের কোনো
অর্থ খোঁজেনি: উদ্দেশ্য অর্থাৎ

একা একা আমি আর বয়ে পারছি না অসুখ

একা একা আমি আর বয়ে পারছি না অসুখ
তবুও আমি আমার অপারগতার চূড়া স্পর্শ করে বলি:
ইচ্ছে করলেই আমার ছায়াকে আমি তাড়াতে পারবো না।
কোনো বৃক্ষও তা পারে না।
কোনো মেঘমালাও তা পারে না।
এবং ধোঁয়ারও এক ধরনের ছায়া আছে।
সে ছায়াও অমান্য করতে পারে না সে।
অসুখও আমাকে এখন বিবিধ ছায়ার মতো তাড়া করে ফিরছে।
অবিকল যেমন আমার ভাগ্য আমাকে সারাবেলা তাড়া করে ফেরে।
সবকিছুরই কোনো না কোনো ছায়া আছে
জীবনের ছায়া আছে।
মৃত্যু হচ্ছে জীবনেরই ছায়া
অনিশেষ অন্য এক ছায়ার নাম।

শীতল ছায়া

পাতারচরে আমার স্বপ্নরবাড়ি হয়েছে
সেই বাড়িতে হৃদয় আমার পড়ে রয়েছে । ।

পুকুর পাড়ের নারকেল গাছে জোসনা পিছল যায়
গাছগাছালির শীতল ছায়া আপন করে নেয় । ।

গোলপাতা

নদীতীরে, খালকুলে
সুন্দরবনে
গোলপাতা দোল খায়
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে

কালচে-সবুজ পাতা
খয়েরী ডাটায়
মনে হয় নারকেল
চারাই কাদায়।

কাদার ভেতর গোল-
পাতার বাহার
আরো বেশি শোভা পায়
আসলে জোয়ার।

ভোরের আলো

অনেক লোকের সয় না আদৌ
ভোরের আলো
অনেক লোকের ভান্নাগে না
কারোর ভালো
অনেক লোকের ভেতর বাড়ি
শুধুই আঁধার
অনেক লোকের একটাই সুর
আমার আমার
অনেকের কাছে তার
সবকিছু সেরা
সেই শুধু উঁচু আর
নীচু অন্যেরা
অনেক লোকের চক্ষে নাচে
সাপের ফনা
অনেক লোকের
বক্ষ জুড়ে
গরল বোনা
অনেক লোকের জিব্বার আগায়
লোভের লাল
অনেক লোকের অর্থ জুড়ায়
মনের জ্বালা
অনেক লোকের হিংসা থাকে
এক শত ভাগ
অনেক লোকের অষ্ট প্রহর
প্রচণ্ড রাগ
অনেক লোকের অহংকারই
সকল কিছুর
অনেক লোকের ক্ষুদ্র মন আর
স্বভাব নীচু ।

অনেকেই ওসবের ধারে-কাছে নেই
সবচেয়ে ভালো লোক আছে অনেকেই
অনেকের জীবনের সীমাহীন চাওয়া
লালসার লাল পথে গান গেয়ে যাওয়া ।

মানুষকে এখন মানুষই সন্ধান করে ফিরছে

শ্রোতকে যেমন শ্রোতাই সন্ধান করে ফেরে
এখন

মানুষকে তেমনি মানুষই সন্ধান করে ফিরছে
কোন ঘর্মাক্ত মেহনতি তার টুকরি নিয়ে
খুব উপর থেকে দুটাকা
অথবা প্রাণ বন্ধ থাকা লোহার গেট থেকে
দেড়টাকা নিয়ে অবোদন ফিরে গেলেও
বড় বেশী খোলামেলা হতে চেয়েছিল
সহানুভূতি হয়তো একটু সহানুভূতি জন্যেই
করেছিল অষ্টপ্রহর অপেক্ষা

পথকে যেমন পথই সন্ধান করে ফেরে
এখন

মানুষকে তেমনি মানুষই সন্ধান করে ফিরছি,
যে একজন নির্ধারিত কক্ষে ঢুকলেই
সমস্ত পরিবেশের উপর দিয়ে বয়ে যায়
উত্তপ্ত বাতাস
সেই দাউ দাউ অগ্নিকাণ্ডকে
চুক্তিবদ্ধ ঘাম সম্পর্কে কোন রকম
প্রশ্ন করতেই
প্রার্থনাকারীরা অগ্নিদম্ব হয়ে ফিরে গেল
তবুও তারা
উনুখ বক্ষের মত প্রশমন চেয়েছিল
যেন মনুষ্যত্ব একটু খানি মনুষ্যত্বের জন্য
হাজার বছর ধরে উদ্বীষ
প্রেমকে যেমন প্রেমই সন্ধান করে ফেরে
এখন
মানুষকে তেমনি মানুষই সন্ধান করে ফিরছে

একদা ভাবপ্রাপ্তদের নিয়ে
কারো কোন মাথা ব্যথা ছিল না
নিসর্গের মত নির্ভেজাল দলিল পত্রের মধ্যে
তারা ডুবে থাকতেন
সহসা তাদের আঙুল ফুলতো না বলে
প্রতিবেশের ভেতরে জন্ম নিত
অবিতর্কিত গাছপালা গাছপালার ছাড়া
অথচ মাথা ব্যথা থেকে বিতর্ক অবদ্বি
এখন সততা কেবল সততাকেই
সন্ধান করে ফিলছে।

সৌন্দর্যকে যেমন সৌন্দর্যই সন্ধান করে ফেরে।
এখন
মানুষকে তেমনি মানুষই সন্ধান করে ফিরছে।

তেল

তেলো মাথায় তেল-না-দিলে
হয় না কিছু,
জায়গা মতো তেল পাঠানোর
বানাও ইস্যু।

কথায় আছে তেলো মাথায়
তেল দিতে হয়,
তা-না-হলে বুঝবে তখন
ফেল কিতে হয়?
দরকার হলে তেলের দামে
দাও না টিস্যু।

নিরপেক্ষ তেলের কদর
আজো আছে,
সর্বদা তাই তেলের শিশি
রাখো কাছে,
তেলেসম্মতির কাজটা সেরেই
করো হিসু।

তিল খরিদের সামর্থ্য নেই
এমন ব্যাটাও,
তেল মাখিয়ে সারতে পারেন
হাতির ল্যাঠাও,
তেলের সাধক তাই লেগে যাও
তেলের পিছু।

কোন কেসেমের লাগবে তোমার
তেল? জানা চাই,
সকল কষ্ট সহ্য করে
তেল আনা চাই,
তাই চলে যাও দিল্লি কিংবা
মোগাদিসু।

মোদের যাত্রা আল্লাহর পানে

অগ্রস্থিত



মোদের যাত্রা আল্লাহর পানে

মতিউর রহমান মল্লিক

প্রসঙ্গ কথা

‘মোদের যাত্রা আল্লাহর পানে’ কবি মতিউর রহমান মল্লিকের একটি অম্বুছিত গানের পাতুলিপি । এ পাতুলিপির অধিকাংশ গানই জাগরণমূলক । একজন ধ্বানের দায়ীকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা রয়েছে এসব গানের কথায় । পাশাপাশি একজন মানুষের নিত্যদিনের যাপিত জীবনের সুখ-দুঃখের স্মৃতি রোমাছিত হয়েছে । পাতুলিপিটির প্রচ্ছদ ঁকেছেন আফসার নিজাম ।

সূচিপত্র

মোদের যাত্রা আল্লাহর পানে/	৭১
খোদা তোমার নামেরই গান/	৭২
মানুষেরে তুমি সুমতি দাওগো প্রভু/	৭৩
তোমার শিল্পী/	৭৪
এক অনুপম সত্যের/	৭৫
চলো চলো চলো মুজাহিদ/	৭৬
সত্যের জন্য আসমান জমিন/	৭৭
অনেক বেশি উদার হলে/	৭৮
মনোনীত প্রতিনিধি/	৭৯
খোদার পথে চলতে গেলে/	৮০
ইসলাম আসছে সে আসবেই আসবে/	৮১
তার সে খবর আকাশ দিয়েছে/	৮২
দেহ আর মন রুগ্ন যাপন/	৮৩
ঈদ আসে না কার ঘরে/	৮৪
কে যেন কয় কোরবানী দে/	৮৫
সুন্দর সুন্দরবন যে আমার/	৮৬
আমরা সুন্দর পৃথিবী চাই/	৮৮
এই দুনিয়ার বন্ধু স্বজন যত আছো শোন/	৮৯
বিবর্তন সংগীত/	৯০

আল্লাহর আইন আর/ ৯১
অর্থ-বিস্ত-পদমর্যাদা/ ৯২
সেই অভিমানী/ ৯৩
গানের জন্য গান করি না/ ৯৪
কওতো দেখি/ ৯৫
পষ্ট কথা পষ্ট কর/ ৯৬
যদি গভীর রাতে প্রশ্ন জাগে মনের আঙ্গিনায়/ ৯৭
সূর্যের দিন এসে ঘন ঘোর আঁখিয়ার/ ৯৮
কুরানের কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ/ ৯৯
রোদের ভিতর ইলশে গুঁড়ি/ ১০০
কভু আনন্দে কখনো ব্যথায়/ ১০১
আল্লাহ তালার বান্দা যারা/ ১০২
হায়াত-মউত তাঁর হাতে/ ১০৩
আল্লাহ ছাড়া করবো না তো/ ১০৪
আয় রাসুলের পথে চলি/ ১০৫
কেউ যদি চাও এই উম্মতের/ ১০৬

মোদের যাত্রা আল্লাহর পানে

মোদের যাত্রা আল্লাহর পানে
রাসূলের পানে আর
আঁকাবাঁকা পথ পাড়ি দিয়ে দিয়ে
পৌছাব পারাবার ।।

এ পথে যদি আঘাত এসে
ভেঙ্গে দেয় দুটি পা
হাত দিয়ে হেঁটে মাঝিলে যাবো
সয়ে সয়ে বেদনা
খুন রাঙা পথ অঙ্কিত হবে
বিপ্লবী কাফেশার ।।

এ পথে আছে শহীদি মরণ
এ পথেই জান্নাত
দৃষ্ট কদমে ছুটে চলে যাবো
পেরিয়ে আঁধার রাত
আল্লাহ আছেন সহায় মোদের
ভয় নেই হারাবার ।।

খোদা তোমার নামেরই গান

খোদা তোমার নামেরই গান
গাই দিবাযামী
মনের কালি দূর করে দাও
হে অন্তর্যামী ।

তোমার রাহে করো রাহী
গুধুই তোমার আলো চাহি
হৃদয় জুড়ে তোমার সাহস
চাই প্রভু আমি । ।

তোমার প্রিয়জনের
ঈমান আমায় দাও
দ্বীনে হকের দীপ্ত দিশার
নিশান আমায় দাও ।

তোমার রঙে করো রঙীন
দু'হাতে দাও ন্যায়ের সঙ্গীন
স্বপ্ন সফল দাও গো প্রভু
দাও বিজয় দামী । ।

মানুষেরে তুমি সুমতি দাওগো প্রভু

মানুষেরে তুমি সুমতি দাওগো প্রভু
ক্রমাগতভাবে মানবতা মাটি
হয়ে যায় মরু-ভূ ।।

চারিদিকে আজ বর্বরতার একি অভিশাপ
মানুষ হয়েও মানুষের বুকে অস্ত্র চালিয়ে
এ কোন আঁধারে শয়তান হলো
জীবনের প্রতিভু ।।

নিরাশার মাঝে ছড়াও আশার আলো
দূর করে দাও কুফুরির ঘন কালো ।

রসূলের যুগে যেমন মানুষ ফিরে এসেছিলো পথে
ফিরে এসেছিলো পদাঘাত হেনে শিরক ও জুলুমতে
তেমনি এখানে দ্বীনদারী দাও
চরিত্র দাও তবু ।।

তোমার শিল্পী

তোমার শিল্পী করে নাও আমারে
করে নাও তোমার কবি
করে নাও অবিকল
রসূলের কবিদের প্রতিচ্ছবি ।।

জেহাদের ময়দানে তৎপর থাকি যেন
চিরদিন চিরকাল তোমার প্রেমে
কোরানের কাঙ্ক্ষিত কর্মীর মত শুধু
পথ চলি আমরণ কভু না থেমে
প্রতিভার সবটুকু টেলে দেই
তোমাতে বিলাই সবি ।।

তোমার স্বপ্নচারী কর আমারে
করে নাও তোমার ভাবুক
কবি লবীদের মত বিশ্বাসে ভরে রাখ
আমার এ বুক ।।

সবখানে সবকাজে যথাযথভাবে যেন
সর্বদা মেনে চলি তোমার হুকুম
মেনে চলি আজীবন অন্তরে বাহিরেও
প্রিয়তম রসূলের রেওয়াজ রসুম
অবশেষে হই যেন ঈমানের পথেরই অরুণ রবি ।।

এক অনুপম সত্যের

এক অনুপম সত্যের সন্ধান তুমি দিয়ে গেছ হে প্রিয় হযরত
আমি ধন্য জীবনে মরণে হয়েছি তোমার উন্মত ।।

এক আল্লাহর বান্দা আমরা
তুমি প্রথম ওগো বলেছো
আমীরে ফকিরে নাই ভেদাভেদ
বিলাস বিভব তাই দলেছো
তুমি মনের কাবায় থেকে চিরদিন
চাই তোমার শাফায়াত ।।

মহা সাম্যের গান তুমি শুনায়ে
মানুষে মানুষে দিলে অধিকার
প্রতিবাদ প্রতিরোধ যুদ্ধ
হাতে তুলে দিলে তলোয়ার
তুমি মিথ্যাকে করেছ ছিন্ন
সত্যের দিলে হকুমাত ।।

চলো চলো চলো মুজাহিদ

চলো চলো চলো মুজাহিদ
জিহাদের ময়দানে চলো
শহীদের ঈদগাহে চলো
অন্যায় জুলুম বাতিলের ভিত্তি
বজ্রের হুংকারে দলো ।।

অশান্ত এই পৃথিবীতে মানবতা আজ বন্দি
অবিচার অনাচার বাতিলের সঙ্গে
হয়েছে যে তাগুতের সন্ধি
তৌহিদী হেরার রাহী জাগো রে
কুফরীর বুনিয়াদ ভাঙ রে
কুরআনের সমশির হাতে তুলে নাও বীর
জিহাদের ময়দানে চলো ।।

ধরাতল জুড়ে আজ অশান্তি শুধু হায়
অস্ত্রের ঝন ঝন ঝংকার
হায়েনার মত আজ বড় বড় শক্তি
কেড়ে নেয় মানুষের অধিকার ।

দিগন্তে ওই শোন শোন মজলুমানের কান্না
রোগে শোকে অনাহারে দুঃখুঠো অন্ন
এতোটুকু ঔষধও পায় না
পথে পথে পড়ে আছে অসহায়
সমাজের ওরা যেন কেউ নয়
ওই সব মানুষের মুক্তির জন্যে
জিহাদের ময়দানের চলো ।।

সত্যের জন্য আসমান জমিন

সত্যের জন্য আসমান জমিন
সত্যের জন্য কুল মাখলুক
একদিন সত্যের জয় হবে নিশ্চয়
উজ্জ্বল হবে মহা সত্যের মুখ ।।

মিথ্যাকে তাই তুমি করো না তো পরোয়া
সত্যের পথে থাকো উন্নত শির
আপাতত মিথ্যার রুদ্ধ দাপট দেখে
হয়ো না তো চঞ্চল ভীকু অস্থির
তোমার মহান প্রভু স্রষ্টাও মহাজ্ঞানী
আশার আলোয় যিনি ভরে দেন বুক ।।

তুমিতো পেয়েছ জানি সূরাভুল ফাতিহার মত
মহা অবদান মহা সম্পদ
পেয়েছ কুরআন সেরা বিশ্বের বিন্ময়
নেই যার কোন সীমা কোন সরহদ
ছুটে চলো অবিরাম কোরআনের পথে তাই
পেয়ে যাবে বিজয়ের অনিঃশেষ সুখ ।।

বিস্ত বৈভবে ডুবে আছে যারা আজ
ভুলে আছে পরকাল আহা আখেরাত
রেখো না তাদের তুমি দু'চোখের সীমানায়
করো না তাদের দিকে দৃষ্টিপাত
মহা সম্পদ জানি মুমিনের ভালোবাসা
বিশ্বাসী হৃদয়ের প্রেম সবটুক ।।

অনেক বেশি উদার হলে

অনেক বেশি উদার হলে
কাজ করা খুব সহজ হয়
এই সমাজে উদার মানুষ
পাওয়া অত সহজ নয় ।।

ছোট মনের মানুষগুলো
হয় যে ভীষণ বাঁকা
কথায় কথায় প্যাঁচ মারে সব
কাজের বেলায় ফাঁকা
ঘোলা করে পানি খাওয়াই
গাধার পরিচয় ।।

ঐ যে আকাশ উদার বলে
চন্দ্র-সূর্য হাসে
মহাসাগর উদার তাই তো
চেউয়ের পাহাড় ভাসে ।

যারা যত উদার বন্ধু
তারা তত বড়
তাদের কাছে অনায়াসে
আসে আপন-পরও
উদার মানুষ বরণ্য যে
সারা জগৎময় ।।

মনোনীত প্রতিনিধি

[মীর কাশেম আলী ভাইকে]

আমরা তো আল্লার মনোনীত প্রতিনিধি
আমরা তো আল্লার খলীফা
আমাদের কাজ হলো আল্লার দুনিয়ায়
আল্লার হুকুমত কায়েম করা ।।

আমরাই দুনিয়ার স্বেচ্ছাসেবক সেরা
সৃষ্টির কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ
মানুষের মুক্তির জন্যেই আমাদের
নিশ্চিত আগমন, নব উত্থান ।
দায়িত্ব আমাদের সংঘবদ্ধভাবে
জুলুমের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া ।।

মিথ্যার উৎখাতে আমাদের সংগ্রাম
আঁধারের শিকড়ের উৎপাটনে
আমাদের সংগ্রাম স্বষ্টি ও শাস্তির
স্বাধীনতা-স্বাধিকার উদযাপনে ।

আমরা তো কাজ করি কোরানের ইনসাফ
ন্যায়-নীতি কায়েমের লক্ষ্যে সবাই
সমাজের বুক থেকে পরকীয়া-সন্ত্রাস
পরগাছা-দুনীতি উপড়াতে চাই ।
আমাদের দায়ভার খেলাফতে রাশেদার
প্রদীপ্ত নকশায় রাস্তা গড়া ।।

খোদার পথে চলতে গেলে

খোদার পথে চলতে গেলে
অনেক বাধা বাঁকে বাঁকে
বজ্র বিষ-বিষাণ-বারিধী
সব বাঁকে মুখ খুলে রাখে ।।

আল-মুমিনের চির দুশমন
সেই লাহাব সেই জেহেল শয়তান
নিয়ে সকল শক্তি সম্বল
সবখানে ওঁৎ পেতে থাকে ।।

তাই বলে কি চলবে না পথ
হারিয়ে বুকের সব হিম্মত
বন্দী হবে সিংহ খাঁচায়
সব্যসাচী পড়বে পাকৈ ।।

উবাইর দল চির বুজদিল
করে যায় চক্রান্তের মাহফিল
কোন ঠিকানায় ওদের মঞ্জিল
সকলে তাঁর খোঁজ রাখে ।।

বদরের অম্লান ইতিহাস
চিরদিন যার আশা আশ্বাস
আল্লাহ ছাড়া ত্রিভুবনে
করবে ভয় সে আর কাকে ।।

কারবালার সেই আগুন জলে
বুকে যাহার পলে পলে
তারিক মুসার বংশধর যে
কী করে সে ঘুমিয়ে থাকে?

ইসলাম আসছে সে আসবেই আসবে

ইসলাম আসছে সে আসবেই আসবেই আসবে
শত্রুরা হত বসে পরাজিত ক্ষোভে রোষে
হতাশার আঁখি জলে ভাসছে,
সে ভাসবেই ভাসবেই ভাসবে ।।

নাস্তিকতার দিন হয়েছে বিলীন,
শ্বেত ভল্লুক তার দেহ প্রাণহীন
দ্বীন আসে বিজয়ের, দ্বীন আসে কোরানের,
সেই সুখে সারা দেশ হাসছে
হাসবেই হাসবেই হাসবে ।।

মরণের ভয়ে আজ থর থর কাঁপে
সব আযাযিল আর সব শয়তান,
ভেঙ্গে পড়ে অবশেষে কুফরী ও বাতিলের
সমস্ত আশ্তানা সব জিন্দান ।

মজলুমানের ঐ মিলিত মিছিল,
পায় সন্ধান নব হেরার নিখিল
শোষকের পতনে দ্বীন আসে দু'চোখে
তৌহিদী জনগণ জাগছে
সে জাগবেই জাগবেই জাগবে ।।

তার সে খবর আকাশ দিয়েছে

তার সে খবর আকাশ দিয়েছে
তার সুখবর বাতাস দিয়েছে
তার সে খবর নতুন করে
পরিদ্রাণের আশ্বাস আর আভাস দিয়েছে ।।

সে আসে ঐ সন্ধ্যার আঁধার পর্দা সরিয়ে
আল কোরানের আলোকিত আয়াত পড়িয়ে
ইফতারী আর সেহরী খাওয়ার
মেদুর মধুর লগ্ন আবার
আত্মনিবেদনে রঙিন রঙে ভরিয়ে ।।

মাঠের ঘাসে গাছের পাতায় নদীর তরঙ্গে
সে এসেছে সে এনেছে অযুত নিযুত বিহঙ্গ সঙ্গে ।

তারতরে ঐ ফেরেশতারা আসর জমালো
ধূলির ধরায় কোহেতুরের নূর যে ঘনালো
ঈমানদারের দরবারে তার
খবর ছড়ায় আসর বসার
পবিত্র হুঁর গিল্মানে গল্লের ।।

দেহ আর মন রুগ্ন যাপন

দেহ আর মন রুগ্ন যাপন
এল তখন স্বপ্ন মগন
নিরাময়ে সময় মহান
এলো রে এলো রমযান ।।

সব মুমিনের আকাশজুড়ে
উঠলো আশার চাঁদ
জাগলো নতুন সৃষ্টি
আলোয় আলোয় ভরল হৃদয়
ভাঙল কালো দাগ
নাফরমানির কবর দিয়ে
হল পুণ্যবান ।।

আল্লাহ তায়ালায় সন্তোষ আর
মাগফিরাতের তরে
সকল চোখে অনুতাপে
অশ্রু আমার ঝরে ।

চতুর্দিকে আজ গরিবের হল পুণ্যময়
হল জ্যোতির্ময়
ঈমান এবং আকীদার যে আসল পূর্ণ জয়
ঘুচল দ্বিধা ভয়
কোরান বোঝার আসল লগন
সময় মহীয়ান ।।

ঈদ আসে না কার ঘরে

ঈদ আসে না কার ঘরে
তার আগেই খবর নাও
যদি তুমি পুরোপুরি
নিজের মনের মত করি
ঈদের খুশি পেতে চাও ।।

অনাদরে অবহেলায় জীবন কাটে যার
ভাগ্যে শুধু লাঞ্ছনা আর নিত্য অনাহার
তুমি পরম বন্ধু হয়ে
দরদ ভরা বক্ষ লয়ে
তার পাশে দাঁড়াও ।।

সিয়াম শেখায় সংযমি হও সবার দুঃখ বোঝা
সবার বুকে বুক মিলিয়ে ঈদের খুশি খোঁজ ।

একা একা কে সে কোথায় ঈদ করেছে হায়
ঈদের আছে আরো দাবি আজ যে অসহায়
উঁচু নিচু এক না হলে
ঈদ হবে না কোন কালে
বন্ধু জেনে যাও ।।

কে যেন কয় কোরবানী দে

কে যেন কয় কোরবানী দে ইবরাহীমের মত
কে যেন কয় কোরবানী দে ইসমাইলের মত
তবেই হবে জীবন যে তোর সত্যে সম্মুখত ।।

কোরবানী দেয় ত্যাগের মনোবল
আল্লাহ তায়ালার অশেষ পুণ্যফল
দেয় সে সেবায় উৎসাহ আর ত্যাগী মন অন্তত ।।

লোক দেখানো কোরবানী হয় হয় না জানি কবুল
গোশত রক্ত আসল তো নয় শুদ্ধ নিয়ত মূল ।

ইবরাহীমের নিয়ত ছিল ঝাঁটি
মন ছিল তার শুদ্ধ পরিপাটি
কোরবানী তার তাই তো হলো আদর্শ ও শাস্ত ।।

সুন্দর সুন্দরবন যে আমার

সুন্দর সুন্দরবন যে আমার
মন ভরিয়ে দিল
অস্তর জুড়ে আল্লাহ তায়ালার
হামদ ছড়িয়ে দিল
যে তার হামদ ছড়িয়ে দিল ।।

রূপের নদীর দ্যুতি ভরা
গড়ান গেও কেওড়া গোলপাতা
চোখ যায় যদুর গহীন গভীর
নিবিড় সবুজ প্রান্তহীন খাতা
দৃষ্টির ভাঁজে ভাঁজে শুনি
মধুর মেদুর গোপন স্বপ্নিল
রঙ ভরিয়ে দিল ।।

মুক্তো হীরে কাঞ্চন দিয়ে
মরা খালের উপর পাখির ঝাঁক
চেউ খেলে যায় আকাশজুড়ে
মেঘের মত হারিয়ে বনের বাঁক
কাব্য করার অনুরক্তি
গানের ভেতর গানের পঙ্ক্তি
প্রাণ জুড়িয়ে দিল ।।

সাগর নদীর সিংহান ধরে
বাঘ হরিণের এই যে অরণ্য
হাজার প্রাণীর চঞ্চলতায়
ধ্যান ধারণায় অধীর অনন্য
বন মোরগের হঠাৎ ডাকে
রোদ্দুর নীচে পাতার ফাঁকে
হৃদয় কেড়ে নিল ।।

এ যে এক দেশ ভাঙারে যার
অশেষ অলীক অথৈ রহস্য
চতুর্দিকে নির্জনতা
শান্ত নরম নিটোল নিসর্গ
কার মহিমায় এই সুন্দরবন
কার প্রেমে মন হল উন্মূন
মাথা নুইয়ে দিল ।।

আমরা সুন্দর পৃথিবী চাই

আমরা সুন্দর পৃথিবী চাই
প্রিয় বাংলাদেশ রাঙাতে চাই
এসো না নতুন প্রভাত আনি
থাকবে না হিংসা দুঃখ গ্লানি ।।

আজ সাইমুম সুরের পাখী গল্প গানে স্বপ্ন আঁকি
আজ সাইমুম নিত্য সরব সবাই মিলে করি উৎসব
উৎসব উৎসব উৎসব আজ সাইমুমেরই উৎসব ।।

ওই দেখো আকাশে সোনা ঝরা বাতাসে
বিধাতার কথাগুলো ভাসছে
তাই যেনো সাগরে মন ছুঁয়ে
পাহাড়ে কাক্তিকত স্বরধ্বনি বাজছে ।

আমাদের উৎসব
এই উৎসব এই আনন্দ এই সঙ্গীত নাট্য-ছন্দ
চেতনার জন্য কেবলই
জনতার প্রাণে জীবনের গানে প্রেরণার জন্য কেবলই ।

মহা মিলনের ডেকে যাই যত উদাস্ত আহ্বান
সময় এসেছে স্বদেশের তরে হতে হবে কুরবান
ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী সাধনায় মহামুক্তির বিপ্লবী বাসনায়
নিতে হবে সব উদ্যোগ প্রেমেরই জন্য কেবলই ।।

এই দুনিয়ার বন্ধু স্বজন যত আছে শোন

এই দুনিয়ার বন্ধু স্বজন যত আছে শোন
বসনিয়াতে আমরা যারা শিশু
কেমন আছি তা কি তোমরা জানো ।।

এখন মোদের পথে না হয় জেলখানাতে ঘর
আবু আম্মু আছে কি নেই পাই না সে খবর
খেতে পাই না পড়তে পাই না
পাই না আদর কোন ।।

সার্ভিয়রা চায় না মোরা যত শিশু আছি
বসনিয়াতে হেসে খেলে একটা দিনও বাঁচি ।

বোমার ঘা' এ বন্ধু মোদের দেয় যে উড়িয়ে
বুলেট মেরে হাত পা মোদের দেয় যে গুঁড়িয়ে
আমরা শিশু তবু তাদের
পাই না ক্ষমা কোন ।।

বিবর্তন সংগীত

তরুণ প্রাণের অরুণ আবেগ দীপ্ত বিবর্তন
আমরা তরুণ আমরা অরুণ আমরা বিবর্তন
ন্যায়ের পথে চলবো
নতুন সমাজ গড়বো,

নতুন যুগের, আমরা হবো নতুন বিবরণ
চাই জীবনের আকাশজুড়ে আলোর উদ্বোধন

আমরা প্রতিবাদী
জীবন দিতেও রাজী,

রুখবো তবু জুলুম পীড়ন শোষণ নির্যাতন
মোদের চলার ছন্দে
চতুর্দিক আনন্দে,

দুঃখ শোকের, দেয়াল ভাঙার করবো আয়োজন।

আল্লাহর আইন আর

আল্লাহর আইন আর
সবলোকের শাসন ছাড়া
বিশ্ব ভুবন যায় না গড়া
অশান্ত পৃথিবীর মানুষগুলো
তাই তো আজি দিশেহারা ।।

শান্তি শান্তি বলে মজলুম মানবতা
চীনের প্রাচীর ভেঙ্গে তুলেছে আওয়াজ
কা'বার থেকে ওই সুদূর জাকার্তায়
মুক্তির শ্লোগান উঠেছে আজ
কমবোডিয়া রোমানিয়া
আজারবাইজান নামিবিয়া
ভাঙছে জালিমের পাষাণ কারা ।।

অসৎ লোকের দুঃশাসনে
হিংসা বিদ্বেষ অকারণে
যুদ্ধ বিধ্বংসী আগ্রাসনে
বিশ্ব বিবেক আজ পাগলপারা ।

মানুষের মনগড়া মতবাদে আজ
চারিদিকে বইছে বিষাক্ত বাতাস
কাশ্মীর আফগান ফিলিস্তিনে ঐ
বারুদের গন্ধে থেমে যায় সাঁঝ
অবুঝ শিশুর আর্তনাদে
আকাশ কাঁদে বাতাস কাঁদে
স্বাধিকার আদায়ে লড়ছে তারা ।।

অর্থ-বিস্ত-পদমর্যাদা

অর্থ-বিস্ত-পদমর্যাদা
ভোগ-বিলাসের উপকরণ
আল্লার প্রিয় বান্দা হবার
নয় নয় তাতো উদাহরণ;
জীবনের যতো রং বরং । ।

ধন-সম্পদ মানুষের তরে
নিত্য-নতুন পরীক্ষার এক বিষয়
আসল-নকল মেপে দেখবার
সবচেয়ে দামী নিষ্ঠি যে-নিষ্ঠয়;
হিসাবের খাঁটি সংকলন ।

সৌন্দর্যের সংজ্ঞা আলাদা
সংজ্ঞা আলাদা চরিত্রের
রঙের বাহার বাইরে শুধুই
ভেতরের রূপ পবিত্রের ।

রেজেকদাতা সে-আল্লার দেয়া
রেজেক যাদের অধিক প্রিয়
ফিরেও দেখে না কারো পার্থিব
উন্নতি তারা- করে না তা গ্রহণীয়;
তারা লালসার করে সংবরণ । ।

সেই অভিমানী

সেই অভিমানী মান করে গেছে
গান আর সে তো কভু গাবে না
জনসভা জলসায় মাহফিলে মাজলিসে
তারে আর কেউ খুঁজে পাবে না ।।

স্মৃতি তার কথা কয় আজ নানা কাজে
হৃদয়ের ছেঁড়া তারে ব্যথা হয়ে বাজে
হারানো সে বনফুল সে কেন করে আকুল
মন বলে তারে ভোলা যাবে না ।।

এ আকাশ এই নদী সবই তো আছে
যে ছিল আপন বড় সে ই চলে গেছে ।

হৃদয়ের বেহালায় তার যত হাসি
প্রপাতের মত বাজে বারে বারে আসি
আঁখি জল বেদনায় যায় বেলা বয়ে যায়
মন বলে তারে ভোলা যাবে না ।।

গানের জন্য গান করি না

গানের জন্য গান করি না সুরের জন্য সুর
তাল-লয় মান নিয়ে মোদের যাত্রা অনেক দূর ।।

যে সব মানুষ অন্ধকারে,
পথ হারালো বারে বারে ।
আমরা তাদের সামনে শুধু ছড়ায় আশার নূর,
ছড়ায় রাতের বক্ষভেদী দ্বীপ্ত দিন-দুপুর ।।

আমরা গায়ক আল-কুরআনের আমরা কবিতার
অকুতোভয় শিল্পী মোরা দেশ ও জনতার ।।

যে অচেতন গভীর ঘুমে,
যার খেয়েছে বিবেক ঘুনে ।
আমরা তাদের জাগতে বলি গুনিয়ে সুর মধুর,
হৃদয় দিয়ে ভরাট করি শূন্য হৃদয়পুর ।।

কণ্ডতো দেখি

কণ্ডতো দেখি সবচে বড় বন্ধু তোমার কে
যার সাথে ভাব সবচে বেশি সে কী আসলে ?

নাকি তোমার ক্লাসের বন্ধু বড়
যার সাথে রোজ স্কুলে যাও
টিফিন খেলে ভাগ করে খাও
এক সাথে যোগ-বিয়োগ গুনও কর
সেইকি তোমার বন্ধু সবচেয়ে বড় ।।

নাকি তোমার গাঁয়ের বন্ধু বড়
দাদা বাড়ি যাও যখন
সামনে তাকে পাও তখন
একছুটে ঠিক দুজন গাছে চড়ে
সেইকি তোমার বন্ধু সবচে বড় ।।

ঠিক করে কও সবচে বড় বন্ধু তোমার কে
সকল কাজে সহায়তা কে দেয় তোমাকে ।

পারলে না তো খেলায় কর তবে
সবচে বড় বন্ধু হল জ্ঞান
লেখাপড়ায় সেই যে জ্ঞানের প্রাণ
সারাজীবন জ্ঞানই সঙ্গে রবে ।।

এই দুনিয়ায় যখন যেথায় যাবে
পাও বা না পাও বন্ধু কোন
জ্ঞানই সত্যি বলছি শোন
ত্রাণের দু'হাত আগাম যে বাড়াবে ।।

জ্ঞান আছে যার সেই তো আসল ধনী
সেই চিনেছে নিজেকে নিজে
সেই চিনেছে শিক্ষা কী যে
সেই চিনেছে আল্লাহ কাদের গণী ।।

পষ্ট কথা পষ্ট কর

পষ্ট কথা পষ্ট কর

নষ্ট হবে না

পথ ভ্রষ্ট হবে না ।।

কষ্ট করে ঘাম ঝরালে গো

কর্মবীরে নাম ছড়াবে গো

তার চেয়ে বড় কথা হলো

ভুলের হলে দুষ্ট হবে না ।।

পরিশ্রমী মানুষ খোদার প্রিয়

ঠিক সে হয় সবার বরণীয়

আহা সবার অরণীয় ।।

কষ্ট কর সদা সর্বদা

কষ্ট করা মানে মর্যাদা

তার চেয়ে বড় কথা হলো

অধম ও নিকৃষ্ট হবে না ।।

যদি গভীর রাতে প্রশ্ন জাগে মনের আগ্নিনায়

যদি গভীর রাতে প্রশ্ন জাগে মনের আগ্নিনায়
কোন কারণে ভালোবেসে পাঠালেন আমায়
প্রভু পাঠালেন আমায় ।।

জানিনা যে কেমন করে করবো জীবন পার
কেমনে তাঁরে করবো খুশি জীবন মরণ যার
কেনো মনের ব্যাকুলতা ভাবি নিরানায়
প্রভু পাঠালেন আমায় ।

এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আমি শ্রেষ্ঠ আমার কাজ
রং তামাশায় পরম সুখে কাটে সকাল সাঁঝ
আসল কাজের নেই তো খবর সময় বয়ে যায়
প্রভু পাঠালেন আমায় ।।

সূর্যের দিন এসে ঘন ঘোর আঁধিয়ার

সূর্যের দিন এসে ঘন ঘোর আঁধিয়ার
অবশেষে তাড়ায় যেমন ।।
ঘরে ঘরে আলো জ্বালে
ইসলামী ছাত্রীসংস্থা তেমন ।

মুক্তির দিকে ডাকে সুফিয়া আয়েশা আর
ফাতিমার পথের পথিক
ভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্নভিন্ন করে
খরতর শ্রোতের অধিক
আলোকিত জীবনের এনে দেয় সন্ধান
প্রভাতের দিশারী এমন ।

সকল আঙিনাজুড়ে পুষ্পের সমারোহ
পাখিদের নীড়ে ফেরা গান
অথবা নতুন করে নদী ও নারীর দেশে
ইমানের নব উত্থান ।।

জিহাদের প্রেরণায় যারা চলে অবিরাম
কোরানের কাঙ্ক্ষিত রাহে
মিথ্যার বাধা যত দলে যায় যারা
শহীদি স্বপ্ন উৎসাহে
ঝাঙলার এ বাহিনী গড়ে তোলে সংগ্রাম
সময়ের দাবি যা এখন ।

কুরানের কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
গড়বেই গড়বে আল্লাহর হুকুমাত
গড়বেই গড়বে খিলাফাতে রাশেদা
জনগণ নন্দিত পরিবেশ
কুরানের কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ ।।

নীলিমা নতুন কথা বলবে
নদীরা দ্বিগুণ বেগে চলবে
বইবে দখিনা নিয়ে ফাগুনের রেশ ।।

পাখিরা নতুন গান গাইবে
শিশুরা নতুন প্রাণ পাইবে
উঠবে নতুন এক সূর্য অশেষ

সবহারা মানুষ আর কাঁদবে না
ভিক্ষারির মত হাত পাতবে না
থাকবে না উঁচু নিচু কোন রেষারেষ ।।

লাঞ্ছিত শ্রমিকের হবে জয়
বঞ্চিত কৃষকের হবে জয়
হবে জয় শোষিতের জয় অনিঃশেষ

রোদের ভিতর ইলশে গুঁড়ি

রোদের ভিতর ইলশে গুঁড়ি
সঙ্গে পাখির ডাক
আম বাগানের ভিতর যেন
মৌমাছদের ঝাঁক ।

মন মেলে দেয় পাখা
যায় না ঘরে থাকা
আকাশে কার তুলির আঁচড়
রঙধনুকের আঁক ।

ঘাসের ডগায় হীরক জ্বলে
মুক্ত ফুলের বুকে
হঠাৎ হাওয়া দোল দিয়ে যায়
একটুখানি ঝুঁকে ।

কে এক রাখাল ছেলে
ছুটল মাথাল ফেলে
সোহাগে তার উঠল নেচে
হিজলবনের বাঁক ।

কভু আনন্দে কখনো ব্যথায়

কভু আনন্দে কখনো ব্যথায়
লিখে যাই কবিতা ।।

গভীর পাঠক নিয়ে ভীড় পাঠিকা
পড়ে কোন কবিতা
কভু আনন্দে কখনো ব্যথায়
লিখে যাই কবিতা ।।

প্রকৃতির গান গেয়ে গেয়ে আমি
হঠাৎ কোথাও --- থামি
পাখির কণ্ঠ অন্তরে মাখি
করি না তো ভনিতা ।

আমাকে আমার দেশের বেদনা নিত্য কাদায়
তার সফলতা শুভ সংবাদ আবার হাসায়

জীবনের কথা ভেবে হই সারা
কখনো সে হই আনন্দ ধারা
ঈমান নিহত ছন্দে ছন্দে
উঠে আসে সবিতা ।

আল্লাহ তালার বান্দা যারা

আল্লাহ তালার বান্দা যারা
দ্বীনের কাজে পাগল-পারা
চায় না তারা কারোর কাছে কোনো বিনিময়
চায় কেবলই খোদার সন্তোষ
দ্বীন-ইসলামের জয় ।।

আল্লাতালার বান্দা যারা ত্যাগী সুনিশ্চয়
আল জেহাদে আত্মহারা
মানবতার বন্ধু তারা জানি সুনিশ্চয়
লোভ-লালসা-হিংসা-বিদ্বেষ সব করেছে ক্ষয় ।।

হাত পাতে না কারোর কাছে কড়ু
অল্পতে সে খুশি
সদা তার ভরসা প্রভু
লেন-দেনে সে স্বচ্ছ-সাদা ।

রাগ দমনে অতুলনীয়
ক্ষমা করার স্বভাব
তারে করেছে সুপ্রিয়
চরিত্রে তার সুবাস ছড়ায়
নশ্রুতা-বিনয় ।।

হায়াত-মউত তাঁর হাতে

হায়াত-মউত তাঁর হাতে
তাঁরই একক কুদরাতে
কায়েম হবে কেয়ামত যে
বিচারের নিমিত্ত ।।

সকল রাজ্য-রাজত্ব
করবে তাঁরই দাসত্ব
তাঁরই আদেশ তাঁরই নির্দেশ
আহ্বান উদাত্ত ।।

জাতির পিতা ইব্রাহীম
বিশ্বনেতা আল আমীন
এটাই দর্শন এটাই বিজ্ঞান
কল্যাণের উপাত্ত ।।

আল্লাহ ছাড়া করবো না তো

আল্লাহ ছাড়া করবো না তো
কারো আনুগত্য
তিনিই মালিক তিনিই খালিক
তিনিই পরম সত্য ।।

সব ক্ষমতা এক আল্লাহর
সার্বভৌমত্ব যে তাঁর
তিনি রহীম তিনিই করীম
তাঁরই আধিপত্য ।।

যা প্রশংসা সবই তাঁর
তাঁরই হাতে সব বিচার
তিনিই জব্বার তিনিই কাহ্‌হার
তাঁর কাছে সব তথ্য ।।

ধন-সম্পদের মূল ভাণ্ডার
যা কভু নয় শেষ হবার
সব কিছু তা তাঁরি কবজায়
নির্ভেজাল এ-তত্ত্ব ।।

আয় রাসূলের পথে চলি

আয় রাসূলের পথে চলি
দীপ্ত-দৃঢ় শপথ নিয়ে
তঁার পথে ভাই চলতে গিয়ে
যাক না জীবন, জীবন যদি যায় ।।

আয় রাসূলের জীবন থেকে
জেহাদ করার শিক্ষা গ্রহণ করি
যার যা আছে সব কিছু তার
উজাড় করে আবার সবাই লড়ি
শেষ করে দেই খোদাদ্রোহীর
সব আয়োজন কঠিন কঠোর ঘায় ।।

আয় রাসূলের কথা বলি আয়
সকল বাধা তুচ্ছ করে
ভয়-বাধাহীন বজ্র স্বরে
সারা জাহান জয়ের ইশারায় ।

আয় রাসূলের সমাজ গড়ি
সব মুজাহিদ ঐক্যবদ্ধভাবে
এই জেহাদে শেষ অবধি
বাঁচলে বাঁচি, না হয় জীবন যাবে
আল কোরানের বিজয় আনি
নতুন করে নতুন জমানায় ।।

কেউ যদি চাও এই উম্মতের

কেউ যদি চাও এই উম্মতের
সত্যিকারের সংশোধন
প্রথম যুগের পদ্ধতিরই
করো তবে উদ্বোধন ।।

আল কোরানের জ্ঞানার্জনে
পাগলপারা হও
সাহাবীদের ন্যায় তুমিও
সকল কষ্ট সও
সকল কিছুর উর্ধ্বে উঠে
সকল বাধ-বন্ধন টুটে
বিশ্বনবী মোস্তাফারই
করো গো অনুকরণ ।।

খোদাদ্রোহী কাফেরদেরকে
প্রভু মেনো না ভুলেও
মুসলমানদের দুশমনদেরকে
মেনো না ভুলেও ।

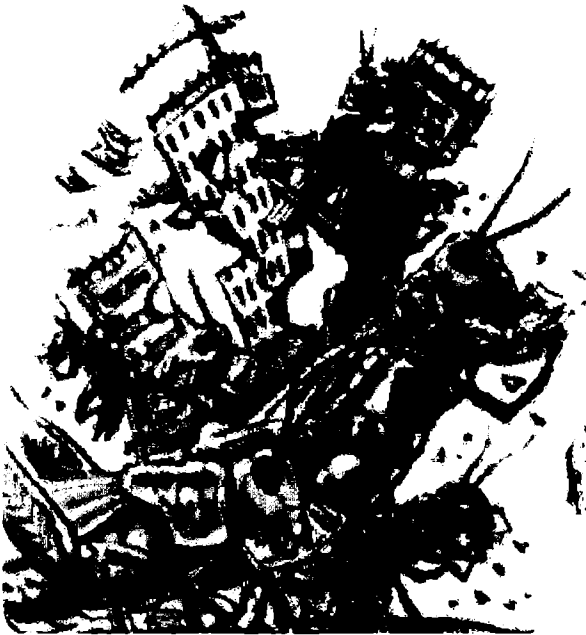
জেহাদ করো আল্লাহর পথে
উজাড় করে সব
মজলুমানের পাশে দাঁড়াও
করো অনুভব
তাদের দুঃখ তাদের জ্বালা
তাদের যতো অবহেলা
মানবতার মুক্তির তরে
করো তীব্র আন্দোলন ।।

পঞ্চপাল গীতিকা

[অনুদিত]

পঙ্গপাল গীতিকা

মতিউর রহমান মল্লিক



প্রসঙ্গ কথা

‘পদ্মপাল গীতিকা’ কবি মতিউর রহমান মন্সুরের একটি অপ্রচ্ছিত ছড়ার পাণ্ডুলিপি। এটি একটি দীর্ঘ রম্য ছড়া। এ ছড়ায় একটি বিশেষত্ব রয়েছে। অতি অল্প কথনে সমাজের একটি বাস্তব চিত্র লেখক এখানে তুলে ধরেছেন। আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এটি একটি পাণ্ডুলিপি আকারে এখানে সন্নিবেশিত করা হলো। পাণ্ডুলিপিটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন আফসার নিজাম।

কোন আঁধারের গহবর থেকে
অন্ধ পঙ্কপাল
উড়ে এসে জুড়ে বসে ফসলের
ক্ষেত করে পয়মাল !
ধান খেয়ে যায় পান খেয়ে যায়
গান খেয়ে যায় প্রাণ খেয়ে যায়
পাট খেয়ে যায় মাঠ খেয়ে যায়
ভাঁট খেয়ে যায় ঘাট খেয়ে যায়
মেঘ খেয়ে যায় ভেক খেয়ে যায়
রেক খেয়ে যায় রেখ খেয়ে যায়
পাতা খেয়ে যায় মাথা খেয়ে যায়
বাতা খেয়ে যায় রাতা খেয়ে যায়
ফুল খেয়ে যায় কুল খেয়ে যায়
কুল খেয়ে যায় মূল খেয়ে যায়
গরু খেয়ে যায় চরু খেয়ে যায়
তরু খেয়ে যায় মরু খেয়ে যায়
ঘাস খেয়ে যায় শাঁস খেয়ে যায়
হাঁস খেয়ে যায় মাষ খেয়ে যায়
পাখি খেয়ে যায় রাখি খেয়ে যায়
হাসি খেয়ে যায় বাঁশী খেয়ে যায়
খায় বন- বনোতল
খেয়ে খেয়ে সারা করে দেয় যত
সবুজের অঞ্চল ।

হাট-ঘাট খায় কাঠ-খাট খায়
গাঁঠ-গাঁত খায় আঁট-সাঁট খায়
চাল-ডাল খায় তাল-ঝাল খায়
আজকাল খায় হালচাল খায়
দর্জিও খায় মরজীও খায়
সবজিও খায় কবজিও খায়
মুড়কিও খায় সুরকিও খায়
মুরগিও খায় গুড়-ঘিও খায়

লংকাও খায় টংকাও খায়
সংজ্ঞাও খায় জংঘাও খায়
বাজারও খায় মাজারও খায়
খাঁজারও খায় সাঁঝারও খায়
অন্দর খায় বন্দর খায়
ঘরদোর খায় অন্তর খায়
আমদানী খায় জামদানী খায়
রফতানী খায় রথ-রাণী খায়
আসনও খায় শাসনও খায়
বাসনও খায় ভাষণও খায়
খাই-খাই-খাই-কল
খায়রে আকাশ খায়রে বাতাস
খায়রে জলচুল ।

অংশও খায় বংশও খায়
অংগও খায় সংঘও খায়
আধুলিও খায় মাদুলীও খায়
গা-ধূলিও খায় পা-ধূলিও খায়
ছন্দও খায় গন্ধও খায়
খন্দও খায় নন্দও খায়

পদ্যও খায় গদ্যও খায়
মদ্যও খায় বৈদ্যও খায়
তথ্যও খায় সত্যও খায়
পথ্যও খায় বত্তও খায়
অন্নও খায় বস্ত্রও খায়
সৈন্যও খায় অস্ত্রও খায়
অর্থও খায় শর্তও খায়
স্বর্গও খায় মর্ত্যও খায়
ইজ্জত খায় হিম্মত খায়
কুওয়াত্ খায় উখুওয়াত্ খায়

তখ্‌তও খায় রক্তও খায়
শক্তও খায় ভক্তও খায়
খেয়ে করে রসাতল
উড়ে এসে বসে সব জায়গায়
এ-কোন গণ্ড-গোল ।

দধি যার খায় গদি তার খায়
অধিকার খায় অঙ্গীকার খায়
অলিগলি খায় তলি-থলি খায়
কলবলি খায় খল-খলি খায়
ফলাফল খায় চলাচল খায়
জলা-জল খায় হলাহল খায়
রাজনীতি খায় কাজনীতি খায়
মাবনীতি খায় তাজনীতি খায়
ঘরনীতি খায় পরনীতি খায়
চর-নীতি খায় ঝড়-নীতি খায়
জননীতি খায় সুনীতি খায়
ধননীতি খায় রণনীতি খায়

পাঠনীতি খায় আটনীতি খায়
ঠাটনীতি খায় ডাটনীতি খায়
খোদ নীতি খায় রোধ-নীতি খায়
বোধ-বোধি খায় নদ-নদী খায়
মিড়িয়াও খায় পিড়িয়াও খায়
চিরিয়াও খায় ছিড়িয়াও খায়
ধর্মও খায় বর্মও খায়
কর্মও খায় ঘর্মও খায়
খেয়ে করে পেট ঢোল
এ-জাতির ঘাড়ে চাপলো এ-কোন
বেতমীজ বেক্কোল ।

এক পেয়ালা অশ্রু

[অপ্রদ্বিত]

এক পেয়লা অঙ্ক

মতিউর রহমান মল্লিক



প্রসঙ্গ কথা

‘এক পেয়ালা অশ্রু’ কবি মতিউর রহমান মল্লিকের অপ্রকাশিত একটি পাতুলিপি। এটিই কবির একমাত্র গল্পের পাতুলিপি। তবে এখানকার অধিকাংশ গল্পই কবির অনূদিত। মৌলিক গল্প মাত্র একটি। কবির জীবদ্দশায় বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও সংকলনে এ গল্পগুলো প্রকাশিত হয়েছে। এখানে ৬টি গল্প ছান পেয়েছে। পাতুলিপিটির প্রচ্ছদ ঐকেছেন আফসার নিজাম।

সূচিপত্র

আবদুর রহমান সাহিদ আত্মহত্যা করেছে/ ১২১

এক অহংকারী শাহজাদীর গল্প (অনুবাদ)/ ১২৭

দাদীর উপদেশ (অনুবাদ)/ ১২৯

অচেনা অশ্বারোহী (অনুবাদ)/ ১৩২

বেধীন (অনুবাদ)/ ১৩৭

এক পেয়ালা অশ্রু (অনুবাদ)/ ১৪৬

আবদুর রহমান সাহিদ আত্মহত্যা করেছে

হ্যালো, আতিক ভাই নাকি? আমি মাহফুজ, মাহফুজ হালদার।

কি সৌভাগ্য! আপনি মাহফুজ ভাই?

হ্যাঁ, আমি আতিক, আপনি ভাই ট্যালেন্ট, একেবারে জিনিয়াস, আপনি বুঝলেন কি করে আমি এখানে আছি?

ভরসঙ্কায় তো আপনি অফিস করেন না। তাই ভাবলাম, লেখক মানুষ আর কেথায় থাকবে!

পত্রিকা অফিসেই খোঁজ করে দেখি, পাই কি-না। তো হাতের কাছেই আপনার দৈনিকটা ছিলো, পেয়ে গেলাম আপনাকে। একটা দুঃসংবাদ আছে, আবদুর রহমান সাহিদ আত্মহত্যা করেছে, ওর লাশ এখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-মর্গে।

আচ্ছা মাহফুজ ভাই, এই ভরসঙ্কায় দুটুমি না-করলে হতো না? না-হয় অনেকদিন আপনাদের ওদিকে যাওয়া হয় না, কিন্তু প্রতিশোধ কি তাই বলে এইভাবে নেবেন?

না, আতিক ভাই, সিরিয়াসলি বলছি। আমরা ওর আত্মহত্যার খবর পেয়েছি অফিসে বসে। কিন্তু ঐ সময় আপনাকে খবর দেয়া সম্ভব হয়নি। বস্ বাগেরহাট অঞ্চলের সবাইকে ডেকেছিলেন। ওর লাশ আজই পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে বললেন এবং একেবারে গ্রামের বাড়িতে। অফিস থেকে একটা ট্রাকেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, লাশের সাথে আপনি যাবেন। আর যাবে ফকিরহাটের আনিস ভাই। আনিস ভাইকে তো আপনি চেনেন। সোনালী ব্যাংকে আমরা একসাথে চাকরি করি।

মাহফুজ ভাই, এসব আপনি বলছেন কি! সাহিদ আত্মহত্যা করার মতো ছেলে নয়!

আতিক ভাই, আপনি তাড়াতাড়ি চলে আসুন। রেডি হয়ে আসুন। ট্রাক এতোক্ষণে মেডিকেল পৌছে গেছে। দুঃখ-কষ্ট সইবার মতো মানুষ আপনি, সেই কারণে কোনো ভূমিকা না-করে, সরাসরি খবরটা দিয়েছি। রাখি...

আতিক-উর-রশীদ রিসিভার ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেলো। কিন্তু পড়ে যাচ্ছে বলে মনে হলো তার। বসে পড়লো। নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। এক সাংবাদিক বন্ধু এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন: কি হয়েছে? কার সাথে কথা হলো আপনার? শেষের দিকের কিছু কথা শুনলাম। নিশ্চয় কোনো দুঃসংবাদ হবে। ব্যাপারটি কি বলুন তো!

আতিক-উর-রশীদ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, ফোন করেছিলেন মাহফুজ ভাই। মাহফুজ ভাইকে আপনি চেনবেন না। সোনালী ব্যাংকের অফিসার। হেড অফিসে আছেন। আমরা একই গ্রামের মানুষ। ছোটবেলায় একসঙ্গেই খেলাধুলো করেছি। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবদুর রহমান সাহিদ মাহফুজ ভাইয়ের সাথেই চাকরি করতো। আত্মহত্যা করেছে। মাহফুজ ভাই-ই খবরটা দিলেন। কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না। আবার বিশ্বাস না করেও পারছি না, মাহফুজ ভাই মিথ্যা বলার মতো লোক নন।

দুই.

আতিক-উর-রশীদ এক কাপড়েই পৌছে গেলো ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে। মর্গের সামনে তখন প্রায় শ'খানেক লোক। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে। কি যেনো এক বিষণ্ণতায় স্তব্ধ হয়ে আছে। আতিক-উর-রশীদকে দেখেই ছুটে এলেন মাহফুজ হালদার। জড়িয়ে ধরলেন। কারো মুখে কোনো কথা নেই। ব্যথায় নিখর।

অনেকক্ষণ কেটে গেলো নীরবতায় এক অদ্ভুত আঁধারে। তারপর প্রথম মুখ খুললো আতিক-উর-রশীদ :

মাহফুজ ভাই, এমনটা তো হবার কথা ছিলো না। সাহিদ তো আত্মহত্যা করার মতো মানুষ নয়। আমার তো ওর সাথে গ্রামে যেতেই হবে। কিন্তু কি জবাব দেবো ওর মাকে আমি। কী বলে সান্ত্বনা দেবো? আমি যে কিছুই জানি না। বুঝতে পারছি না কিছুই।

আপনি কি জানতেন, সাহিদ বিয়ে করেছিলো? আমরা কিন্তু জানতাম না। জানলাম মাত্র এখনই। ওর বিয়াই সাহেব বললো। ভদ্রলোক ঢাকায় চাকরি করেন। ঐ যে লম্বা মতো ফর্সা লোকটি। আনিস ভাইয়ের সাথে কথা বলছেন।

উনিই সাহিদের বিয়াই সাহেব। শেষ পর্যন্ত ঐ বিয়াই সাহেবের সাথেই ওর কিছুটা যোগাযোগ ছিলো।

বলেন কি মাহফুজ ভাই? সাহিদ বিয়ে করেছিলো? আপনারাও জানেন না? আমাকেও তো জানায়নি।

হ্যাঁ, বিয়ে করেছিলো প্রেম করে। মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে সাহিদের কলিগ। ফর্সা মত। স্বাস্থ্যবান। মটরসাইকেলওয়ালা গলায় স্বর্ণের চেন পরা। ফিটফাট থাকে সবসময়। কেনো, বাংলা একাডেমির পাশের মেসেজ-কতোবারই তো আপনার দেখা হয়েছে।

জ্বি, চিনতে পেরেছি।

গত দু-বছর ধরে ঐ শাহজাহান সাহেবের সাথেই থাকতো সাহিদ। এটাই জানতাম আমরা। আপনার সাথেও যে তেমন একটা যোগাযোগ রাখতো না সাহিদ, তাও আজ মাত্র বুঝতে পারলাম।

তিনমাস আগে একবার আমি ওর অফিসে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, চোখ বুজে চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগারেট টানছে। আমি তো অবাক। কষ্ট এবং লজ্জায় আমি তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ফিরতে চাইলাম। পারলাম না। হঠাৎ ওর 'আতিক ভাই' ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়ালাম। চোখের দিকে তাকিয়ে দেখি, রক্তলাল। চেয়ার ছেড়ে ছুটে এলো ও। তারপর কি এক আবেগে সমস্ত শক্তি দিয়ে জাপটে ধরলো। অনেকক্ষণ কেটে গেলো এ-ভাবে। আবদুর রহমান সাহিদের মুখেও কোনো কথা থাকলো না, কথা থাকলো না আমার মুখেও। এক সময় ওই বললো। বললো দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে, জীবনের ভার আমি আর সইতে পারছি না। তুমি কিছু মনে করো না আতিক ভাই। ঠিকই দেখো, সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি একদিন।

আপনি ঠিকই বলেছেন আতিক ভাই। বছর দুয়েক আগেই ওর মধ্যে একটা এলোমেলো ভাব লক্ষ্য করেছি। আমাদের এড়িয়ে চলতো বলে, সাহিদ-কে আমরাও এড়িয়ে চলতাম। আসলে শাহজাহান সাহেব আস্ত একটা মদখোর, ধুরন্ধর মেয়ে শিকারী। অফিসের বাজে লোকেরাও লোকটিকে বাজে লোক বলে। ঐ লোকটির সাথেই কি করে যেনো সাহিদের দহরম-মহরম শুরু হয়ে গেলো। আমরা সবাই মিলে সাবধান করলাম। কিন্তু আমাদের ও ভুলই বুঝলো।

মাহফুজ ভাই, সাহিদের কাছ থেকে সেদিন যখন বিদায় নিচ্ছিলাম, তখন ও এমন কয়েকটি কথা বলেছিলো যে, কয়েকদিন পর্যন্ত আমি কথাকয়টির অর্থ খোঁজার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোনো অর্থ শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাইনি। ও বলেছিলো, আতিক ভাই, আজকাল তো তুমি আমার খবর রাখো না। কিন্তু ঠিকই একদিন তোমার কাঁদতে হবে, চোখের পানি ফেলতে হবে আমার জন্য।

সে যাকগে। মাহফুজ ভাই, সাহিদের আত্মহত্যা সম্পর্কে ওর বিয়াই কোনো কিছু বলে থাকলে তা-ই বলুন।

আতিক ভাই, আপনি জানেন যে, আবদুর রহমান সাহিদ ছিলো আমাদের ব্যাংকের বিনিয়োগ বিভাগের পদস্থ অফিসার। ওর বিয়াই-ই বললো, একটা ভুয়া পার্টি যখন কোনোভাবেই সাহিদের কাছ থেকে বিনিয়োগ আদায় করতে পারলো না, তখন শাহজাহান সাহেবকে-দিয়ে প্রেমের ফাঁদে ফেলে দিলো সাহিদকে। মেয়েটি আগে থেকেই শাহজাহান সাহেবের সাথে অবৈধ সম্পর্ক রাখতো। শাহজাহান সাহেবেই মেয়েটিকে প্রেমের অভিনয় করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। আবদুর রহমান সাহিদ কিছুই বুঝতে পারেনি। কিন্তু ও সত্যি সত্যিই প্রেমে পড়ে গেলো এবং অবৈধ পথে অগ্রসর না-হয়ে তড়িঘড়ি করে বিয়ে করে ফেললো। বিয়ে করলো একান্ত গোপনে। বিয়ে করার পরেই নতুন বউয়ের অনুরোধে ঐ ভুয়া পার্টিকেই দিলো বিরাট অংকের বিনিয়োগ। তারপর একসময় ঠিকই ফাঁসে গেল সাহিদ। দায়ী হয়ে গেলো ব্যাংকের কাছে। ঠিক একই সময় শাহজাহান সাহেবের সাথে অবৈধ কর্মরত অবস্থায় ধরা পড়লো নতুন বউ। এবার আবদুর রহমান সাহিদ বউকে নিয়ে গ্রামে যাবার জন্য পাগল হয়ে উঠলো। সাহিদ যে-দিন আত্মহত্যা করেছিলো, সেদিনই ও সকাল সাতটার দিকে বউকে নিয়ে গিয়েছিলো শপুর বাড়ি। ওখানে গিয়েই ও বউকে সরাসরি প্রস্তাব দিয়েছিলো : যা হবার হয়েছে আক্কা-আম্মার কাছে যাই, আমি তাদের বড় ছেলে, নিশ্চয় আমাদের মাপ করে দেবেন। সাহিদের এইসব কথাবার্তা সাহিদের ছোট শ্যালকই শুনেছিলো। এই শ্যালকপ্রবর সাহিদের খুবই ভক্ত ছিলো। সে আরো শুনেছিলো, তার বোনকে বলতে, আমি কিছুতেই গ্রামে যাবো না। তুমি আমাকে তালাক দিয়ে দিতে পারো। তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক না-রাখলেও চলবে। বউয়ের ঐ চ্যালেঞ্জ সাহিদ গ্রহণ করেনি বরং বাজার থেকে দড়ি কিনে নিয়ে বাসায় ফিরেছিলো। ফিরে আর দেরী করলো না। ঝুলে পড়লো ফ্যানের সাথে। আজ সকালে বাসার কাজ করতে এসে কাজের মেয়েটা দরজার ফাঁক দিয়ে গলায়-দড়ির দৃশ্য দেখে বেহুঁশ হয়ে যায়। বেহুঁশ হয়ে যায় বিকট চিৎকার দিয়ে। চিৎকারে জড়ো হওয়া লোকজন সাহিদকে নামিয়ে মেডিকলে নিয়ে যায়। আসলে সাহিদ গত রাতেই শেষ হয়ে গেছে।

তিন.

আতিক-উর-রশীদে সারাটা রাত কেটে গেলো ট্রাকের ওপর। বন্ধু আবদুর রহমান সাহিদের লাশের পাশে। স্মৃতি ঘেটে-ঘেটে কখন যে-পথ শেষ হয়ে গেছে টেরই পায়নি। টের পেলো গ্রামের বাজারে পৌছে। হাতের দিকে তাকিয়ে দেখে সকাল দশটা।

মাহফুজ হালদার ঢাকা থেকে বাসে রওনা দিয়েছিলেন আতিক-উর-রশীদেদের সাথে কথা বলেই। লাশ পৌছবার আগেই আবদুর রহমান সাহিদদের বাড়িতে যাতে খবর পৌছানো যায়।

হাসপাতালের নিয়ম-কানুন শেষ করে লাশসহ ট্রাক নিয়ে রওনা দিতে বেশ দেরী হয়ে যায় আতিক-উর-রশীদেদের। ফলে মাহফুজ হালদার অনেক আগেই পৌছে গেছেন আবদুর রহমান সাহিদদের গ্রামের বাড়ি বারুইপাড়া। মাহফুজ হালদার এবং আতিক-উর-রশীদেদের গ্রামের বাড়িও এই বারুইপাড়ায়।

আতিক সাহিদেদের আত্মহত্যার খবর শোনার পর থেকে শোকে পাথর হয়ে গিয়েছিলো। কাঁদতে পারেনি। কিন্তু বারুইপাড়া বাজারে পৌছে অনুভব করলো, সে কাঁদছে। দু-গণ্ড বেয়ে তার প্রবাহিত হয়েছে অশ্রুর নদী। অশ্রুর নদী তখন বারুইপাড়ার প্রতিটি মানুষের চোখে।

আতিক ট্রাক থেকে নামার সাথে সাথেই মাহফুজ বললেন, আতিক ভাই, সাহিদেদের আত্মার অবস্থা খারাপ। খুব কায়দা করেই তাঁকে খবরটা দিয়েছিলাম। কিন্তু কোনো কায়দা-কানুনে কাজ হয়নি। খবর পাওয়ার সাথে-সাথেই বেহুঁশ হয়ে গেলেন। হুঁশ ফিরেছে কিছুক্ষণ আগে। কিন্তু কেবলই প্রলাপ বকছেন। মানুষের যে অবস্থা তাতে ট্রাক এতো তাড়াতাড়ি ছাড় পাবে না। বরং আপনিই তাড়াতাড়ি চলুন সাহিদেদের সবচেয়ে কাছে মানুষ আপনি। ওর মা আপনাকে দেখলে হয়তো স্বাভাবিক হতে পারেন। কিন্তু নাইমের ছোট বোনের অবস্থা আরো করুণ। সাহিদেদের মৃত্যুর খবর শোনার পর থেকেই মেয়েটি বেহুঁশ।

নাইমের ছোট বোন আফসানা। আতিকের খালাতো বোন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। অসাধারণ সুন্দরী। একটি আদর্শবাদী সংগঠনের নেত্রী, খুব ভালো ছাত্রীও। সেই আফসানার বেহুঁশ হবার কথা শুনে কেঁপে উঠলেন আতিক। মাহফুজ তাড়া দিলেন। চলুন, আগে চাচিআম্মার কাছে: সাহিদেদের আম্মার কাছে যাই। তারপর এ দিকটা আপনি সামলান। আমি যাই নাইমদের বাড়ি।

সাহিদেদের আম্মা আতিককে দেখেই হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠে বললেন, আতিক রে, সব শেষ হয়ে গেলো আমার। সব দোষ তোর। নিশ্চয়ই তুই আমার সাহিদেদের খোঁজা-খবর রাখতিস না। তুই যদি খোঁজ-খবর রাখতিস তাহলে আমার সাহিদেদের, এই দশা কখনোই হতো না। আতিক, আমি ঠিক আছি। আতিক। আফসানার খবর নে বাপ আমার। একটা তো শেষ! আরেকটারে বাঁচা। মরতে দিস্ না। মরতে দিস্ না। একটার খোঁজ-খবরতো নিস্নিরে বাপ।

এবার অন্যটার নে। এ যে তুই মেয়েটির ব্যাপারে আমাকে উন্মাদিনী বানিয়েছিলি? সাহিদকে কতো বার বলেছি, কাজটা সেরে ফেল, কতোদিন আর মেয়েটি তোর

অপেক্ষায় থাকবে। যা যা তাড়াতাড়ি যা, আমি ভালো আছি, আমি ভালো আছি।
হায় পোড়া কপাল আমার। আল্লারে আল্লা তুই আমারে রক্ষা কর। আফসানারে
রক্ষা কর।

আতিক রাস্তায় নামতেই সুপারী বাগান, আমবাগান, বাঁশবাগানের নির্জনতাকে
জড়িয়ে ধরলো। ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো। একেবারে গলা ছেড়ে কাঁদতে
লাগলো। এদিকে বন্ধু হারাবার বেদনা। অন্যদিকে নিজের হাতে গড়া খালাতো
বোনটির জন্য হাহাকার। সবমিলিয়ে আতিক এখন জবাই করা কবুতর। একান্ত
অপরাধী এক অসহায় মানুষ।

হ্যাঁ, আতিক অপরাধী; অবশ্যই অপরাধী। তা না হলে কেনো সে বিগত কয়েক
বছর ধরে সাহিদের প্রশংসা করে-করে আফসানাকে পাগল বানিয়ে দিয়েছে।
প্রথম দিকে আফসানা তো পাগল হয়নি। কিন্তু আতিক-উর-রশীদ যখনই বলেছে,
সাহিদ আমাদের এলাকার গর্ব, আদর্শের প্রতি ওর সমর্থনই আন্দোলনকে
কতোটা এগিয়ে দিচ্ছে, টের পাচ্চিস? এখন আবদুর রহমান সাহিদ নামের
ঐ হালবিহীন নৌকাটির একটি মজবুত হালের দরকার। আমার একান্ত ইচ্ছে-
তুই, হ্যাঁ, একমাত্র তুই হবি ওই হালবিহীন নৌকাটির মজবুত হাল। আদর্শিক-
চেতনা-প্রজ্জ্বল আফসানা তারপর থেকে আর কোনোদিন কিছু বলেনি। কেবল
আতিকের কাছ থেকে সাহিদের খোঁজ-খবর নিয়েছে বারবার-বহুবার।

আতিক আফসানাদের বাড়ি পৌঁছেই শুনলো, আফসানার হুঁশ ফিরেছে।
আফসানা আফসানা বলতে-বলতে বাড়ির উঠানে পা দিতেই দেখলো, বোরকা
পরে দাঁড়িয়ে আছে আফসানা। একা।

আন্তে আন্তে আফসানার কাছে এগিয়ে গেলো আতিক। বলে বসলো : আমি তোঁর
দায়িত্ব নেবো। ভাবিস না আফসানা। আমার অপরাধের বোঝা আমিই মাথা
পেতে নিলাম।

হুঁ-হুঁ করে কেঁদে উঠলো আফসানা। কান্নাজড়িত কণ্ঠে শুধু জিজ্ঞেস করলো, ওর
মৃত্যু কি দুষমনদের হাতে?

নারে আফসানা না, গোপনে প্রেম করে বিয়ে করেছিলো, বনিবনা হয়নি, আবদুর
রহমান সাহিদ আত্মহত্যা করেছে।

কি বলছো তুমি ভাইয়া? সাহিদ ভাইয়া গোপনে প্রেম করে বিয়ে করেছিলো?
আত্মহত্যা করেছে? আফসানা আঞ্জুমের আর সাহিদের বাড়িতে যাওয়া হলো
না। আতিকের সামনেই বোরকা খোলার ইচ্ছেটাকে দমন করে ঢুকে পড়লো বড়
ঘরের দক্ষিণ দিকের পড়ার ঘরটায়।

এক অহংকারী শাহজাদীর কথা

মূল : নিগহাত পারভিত

তুর্কিস্তানের এক বাদশাহ। অত্যন্ত দয়ালু, অত্যন্ত খোদাভীরু।

তাঁর দুটি সন্তান। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। খুররম আর কুনদীল। কুনদীল খুবই সুন্দরী। সুন্দরী বলেই তার যতো গর্ব। একেবারে মাটিতে পা পড়ে না। শাহজাদা খুররম বারবার শাহজাদীকে বুঝায়:

অহংকার করিসনে বোন। অহংকারীকে আল্লাহ বিলকূল পছন্দ করেন না।

কার কথা কে শোনে? শাহজাদী শাহজাদাকে একদম পাস্তা দেয় না। বুঝতে চায় না ভাইয়ার উপদেশ।

শাহজাদীর আর একটি বদ অভ্যাস গরিবদেরকে একদম সহ্য করতে পারে না। শাহজাদীর ধারণা, গরিবরা ইতর বলে চিরকাল ঘণারই উপযুক্ত।

সারা রাজ্যের প্রজারা শাহজাদার জন্য পাগল। কিন্তু শাহজাদীর নামও শুনতে পারে না।

একবার শাহজাদী দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং ঐ কঠিন রোগের প্রতিক্রিয়ায় তার চমৎকার দুটি চোখের চারপাশ কালো কালো দাগে ভরে যায়। শুধু তাই নয়। শাহজাদীর দুখে আলতা মেশানো গায়ের রঙও কয়লার মতো কালো হয়ে যেতে থাকে। বাদশাহ ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। রাজ্যময় ঘোষণা দেন: যে সেরে দিতে পারবে শাহজাদীর রোগ, তাকে দেয়া হবে বহু মূল্যবান উপটোকন। বাদশাহকে ভালোবাসে বলে চেষ্টার বিন্দুমাত্র ত্রুটি করে না রাজ্যের কেউ-ই। কিন্তু কাজ হয় না কিছুই। শাহজাদীর রোগ বাড়তেই থাকে।

ঐ রাজ্যের ছোট একটি শহরে বাস করে এক কাঠুরিয়া। যারপর নাই গরিব। সেও ভাবে: বড় দুর্দিন যায় খোদাভীরু বাদশাহ এখন। আল্লাহর ওপর ভরসা করে আমারও কিছু একটা করা উচিত।

রূপের অহংকারে যে শাহজাদীর মাটিতে পা পড়েনি, জটিল রোগে পড়ে সেই শাহজাদীই এতোদিনে তার ভাইয়ার কথা বুঝে গিয়েছে।

সত্যি সত্যিই কোনো মানুষের অহংকার করা উচিত নয়। অহংকারীর উঁচু মাথা নীচু হতে বাধ্য। অহংকার পতনের মূল।

বেরিয়ে পড়ে কাঠুরিয়া। সঙ্গে কিছু খাবার। পথে এক বুজুর্গ মানুষের সাথে তার দেখা। তিনি কাঠুরিয়ার কাছে কিছু খেতে চেয়ে বলেন, বড্ড ক্ষুধা পেয়েছে, তোমারই অংশ থেকে দাওনা ভাই খানিকটা। এসো, এক সাথেই বসি তাহলে। কাঠুরিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে, বুজুর্গকে সাথে নিয়ে, ভাগাভাগি করে খাবার খেয়ে নেয়।

ভাগাভাগি করে খাওয়া শেষ হলে, বুজুর্গ মানুষটি কাঠুরিয়ার বেরিয়ে পড়ার কারণ জানতে পেরে দোয়া করেন। আর বলেন, আল্লাহ তোমার জন্য সাহায্য পাঠিয়েছে। এই নাও ওষুধ আর ওষুধের অনুপান, ঠিকঠাক মতো শাহজাদীকে গিয়ে খাইয়ে দাও, বিলকূল সুস্থ হয়ে যাবে।

কাঠুরিয়া ওষুধ এবং অনুপান নিয়ে প্রাসাদে যায়। শাহজাদীকে ওষুধ এবং অনুপান খাইয়ে দেয়। আল্লাহর কী রহমত। খাইয়ে দেয়া মাত্রই শাহজাদী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে। মুছে যায় চোখের চারপাশের কালো কালো দাগ, ফিরে আসে তার গায়ের দুখে আলতা মেশানো টকটকে উজ্জ্বল রঙ।

বাদশাহ কাঠুরিয়াকে অনেক অনেক মূল্যবান উপটোকন প্রদান করলেন এবং প্রাসাদে থাকতে চায় না বলে সসম্মানে বিদায় জানালেন।

এই ঘটনা শাহজাদীর জীবনে পরিবর্তন এনে দেয়। সে বলে,

আমার ধারণা ছিলো একেবারেই ভুল। আসলে গরিবরাই সবচেয়ে যোগ্য। আর সত্যি সত্যিই, প্রকৃত গরিব হচ্ছে সে-ই যার কাছে নেই ঈমানের সম্পদ, ঈমানের দৌলত।

দাদীর উপদেশ

মূল : নাসের মাহমুদ আচালপুর

বাচ্চু কা ‘আচ্ছা সাথী’ অর্থাৎ শিশুদের উত্তম সঙ্গী নামের একটি উর্দু পত্রিকা থেকে ‘দাদী কী নসীহত’ শীর্ষক এই গল্পটি সংগ্রহ করা হয়েছে এবং যথাসম্ভব দ্রুত অনুবাদ করা হয়েছে। অনুবাদের সময় প্রতিটি শব্দকে অনুবাদ না করে, কোথাও-কোথাও ভাব ব্যঞ্জনার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

‘আচ্ছা সাথী’ ইউ. পি., সারকারা, বিজ্ঞানের থেকে প্রকাশিত এবং ‘সিরাজ উদ্দীন নদভী’ সম্পাদিত। পত্রিকাটির একটি পরিচিতিমূলক বক্তব্য সত্যিই দৃষ্টিনন্দন- সন্দেহ নেই।

‘আচ্ছা সাথী’-র ১ম পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে: ‘শিশুদের চরিত্র ও, আচার-আচরণ প্রশিক্ষণের এক উত্তম মুখপত্র’। শিশুদের উপযোগী এই উর্দু পত্রিকাটি সুন্দর, সত্যিই সুন্দর।

গরমের ছুটি হয়ে গেল। হামিদ এবং জাভিদ এখন একেবারে মুক্ত। গোটা ছুটিটাতেই এবার ওরা দারুণ মজা করতে চায়। একটা প্রোগ্রাম সৃষ্টিও তৈরী করে নিলো। ইচ্ছে- আগেভাগেই দর্শনীয় এবং ঐতিহাসিক জায়গাগুলো দেখে নেবার। সেই হিসেবে প্রথমেই সবচেয়ে কাছে পাহাড়ি জঙ্গল এলাকা ভ্রমণের সিদ্ধান্ত করলো তারা। প্রস্তুতিও নিলো এবং শেষ অবধি অনুমতি নেবার জন্যে দাদীর কাছে উপস্থিত হলো।

হামিদ এবং জাভিদ অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ক হবার কারণে দাদী অনুমতি দিতে একটু ইতস্তত করলেন। কিন্তু, শেষমেশ অনুমতি দিলেনও। যাত্রা করার সময় হামিদ-জাভিদকে দাদী উপদেশ দিয়ে বললেন,

‘বাছারা দেখো, গভীর পাহাড়ি জঙ্গলে কিন্তু হিংস্র সিংহ, বিষাক্ত সাপ-বিছু থাকেই। খুব গভীর ভেতরে যাবে না তাই। জানো তো জংলী জন্তুরা মানুষদেরকে চিরে-ফেঁড়ে খেয়ে ফেলে।

হ্যাঁ, কোন হিংস্র জানোয়ার যদি হামলা করেই বসে, তাহলে সাহসের সাথে মোকাবেলা করে নিজেকে রক্ষার সব রকমের চেষ্টা এবং কৌশল অবলম্বন করবে।

হামিদ এবং জাভিদ খুব মনোযোগের সাথে দাদীর উপদেশ শুনলো। তারপর যার-পর-নাই আনন্দে তারা যাত্রা শুরু করলো। আনন্দে তাদের পা যেনো মাটিতে নেই। কতো তাড়াতাড়ি গন্তব্যে পৌঁছতে পারে- এই তাদের একমাত্র চিন্তা।

পাহাড়ি অঞ্চলের জঙ্গলটায় পৌঁছে তাদের আর খুশির সীমা রইলো না। দু’জনে দুপুর পর্যন্ত খুব ঘোরাফেরা করলো। এক সময় হামিদ বললো, ভাইয়া, চলো না ঐ বড় পাহাড়টার দিকে, কী সুন্দর বন, গাছপালা, কি চমৎকার বুনো ফুল। শাল-সেগুনের গাছ। চলো না খুব মজা হবে, খুব মজা করে ঘোরা যাবে।

বড় পাহাড়টার দিকে যাবার রাস্তাটা ওদের জানা ছিলো না। কেবল আন্দাজে আন্দাজে সামনে এগুতে লাগলো। যেতে যেতে সন্ধ্যা হয়ে এলো। কিন্তু বড় পাহাড়টায় পৌঁছানোর রাস্তাটা তো তারা পেলো না। হামিদ ভয়ে একেবারে ঘাবড়ে গিয়ে বললো, সম্ভবত আমরা রাস্তা ভুল করেছি, এখন কি হবে? দু’জনই ঐ পাহাড়ি জঙ্গল থেকে বেরোনোর চেষ্টা করতে লাগলো। হামিদ আরো একটু সামনে এগিয়ে যেতেই বিশাল কেশরওয়ালা একটা সিংহ দেখতে পেলো। সিংহটা আস্তে আস্তে আসছে। দু’জনই ভয়ে ঘাবড়ে গেলো। কিন্তু জাভেদের মনে পড়লো দাদীর উপদেশ। সে চট করে একটা গাছে চড়তে চড়তে হামিদকে বললো, হামিদ এই তাড়াতাড়ি গাছে উঠে পড়ো, তাড়াতাড়ি গাছে উঠে পড়ো, তাড়াতাড়ি। বলেই দ্রুত গাছে চড়ার পর পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখলো- হামিদের পাশাই নাই।

হঠাৎ সে নীচের দিকে তাকালো এবং চিৎকার করে উঠলো। কেননা হামিদ চোখ বন্ধ করে, ঠায় দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিলো তখন। আর হিংস্র সিংহটা হামিদের দিকেই এগিয়ে আসছিলো। জাভিদ মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছিলো যাতে হামিদ তাড়াতাড়ি গাছে চড়ে। কিন্তু কিছুতেই সে শেষ পর্যন্ত গাছে উঠতে পারলো না।

এদিকে সিংহটা পায়ে-পায়ে হামিদের দিকেই এগিয়ে আসছে। সিংহটা হামিদের একেবারে কাছেই পৌঁছে গেছে। হামলা করবে করবে এমন সময় প্রচণ্ড একটা

গুলির শব্দ শোনা গেলো এবং সঙ্গে সঙ্গে সিংহটাও দূর গিয়ে গড়িয়ে পড়লো। হামিদ হতবাক হয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখলো, বন্দুক-কাঁধে এক শিকারী তারই দিকে এগিয়ে আসছে।

হামিদের কিছুটা সন্নিহিত ফিরে এলে জাভিদ জিজ্ঞেস করলো, কি, তুমি যে গাছে চড়লে না? অথচ তুমিতো চড়তে জানো। যদি ওই শিকারী সময়মত উপস্থিত না হতো, তাহলে তোমার অবস্থাটা কি হতো বলো তো?

হামিদ জবাব দিলো, সিংহটা দেখেই আমি বুঝতে পারলাম-এই ভয়ঙ্কর জন্তুর হাত থেকে রেহাই নেই। খামাখা চেষ্টা করে আর লাভ নেই। বাঁচার কোনো উপায় নেই। চোখ বন্ধ করে অপেক্ষা করতে থাকলাম- কখন সিংহটা আমাকে ফেঁড়ে-চিরে খেয়ে ফেলে। যদিও এমন অবস্থা হতে পারে দাদী আগেই বলেছিলেন।

হ্যাঁ, দাদী আমাতো এ রকমই বলেছিলেন। কিন্তু তিনি তো এটাও বলেছিলেন যে, বাঁচার জন্যে হিম্মত এবং কৌশল অবলম্বন করতে হবে-জাভিদ বাঁঝালো কণ্ঠে বললো।

হামিদ খুবই লজ্জিত হলো এবং ওয়াদা করলো ভবিষ্যতে যতো বড় মুসিবতই আসুক না কেনো সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করবে এবং করবেই।

অচেনা অশ্বারোহী

মূল : জাকের থানভী

শত বছর পূর্বের কথা। পশ্চিমের ছোট্ট এক গ্রাম। আহমদ নামের একটি ছেলের বাস সেই গ্রামে। গ্রামটি এমন একটি পথের পাশে, যে পথ দিয়ে ব্যবসায়ীদের যাতায়াত চলে নিত্যদিন। আহমদের পিতা সরাইখানায় চাকুরী করে, যেখানে ঐ ব্যবসায়ীরা কখনও এসে অবস্থান নেয়। আর ব্যবসায়ীদের আগমন হলেই আহমদের আবার ব্যস্ততা ও উপার্জন দুই-ই বেড়ে যায়। সাধারণত দুতিন দিন বাদে কোন ব্যবসায়ী কাফেলা আসে। রাতে অবস্থান করে সকালে আবার রওয়ানা হয়। কখনও এমন হয় যে অনেকদিন পর্যন্ত কোন কাফেলা আসে না। আহমদের আবার অস্থিরতা তখন বেড়ে যায়। আবার মাঝে মাঝে এমনই ঘন ঘন আসে যে, আহমদের পিতার একটানা কয়েকদিন পর্যন্ত ঘরেও ফেরা হয় না। অবশ্য আহমদের পরিবার এই অনিয়মে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

কখনও আহমদ গ্রামের ঐ পথে ঘোরাফেরা করে কাফেলার যাতায়াত দেখে। ঘোড়া ও মোষের গাড়ি অথবা দীর্ঘ উটের সারি দেখে সে খুবই খুশি হয়ে ওঠে। এগুলো তার ভারি প্রিয়। যখন আবার সে অশ্বারোহী সরকারী সৈন্যদের অতিক্রম করতে দেখে তখন ভাবে, যদি সে তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যেতো, তাহলে এদের মতো বিদ্যুৎ গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে সুদূরে হারিয়ে যেতো। কিন্তু সৈন্যদল এক সময় দিগন্তে বিলীন হয়ে গেলে সে শুধু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

একদিন আহমদ যথারীতি কাফেলার অপেক্ষা করছিলো। হঠাৎ তার দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হয় দূরে, যেখানে এক অশ্বারোহী উড়ন্ত ধূলি পিছনে ফেলে এদিকেই ছুটে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অশ্বারোহী আহমদের ঠিক সামনে এসে থামে এবং সালাম দেয়। সালামের উত্তর দিয়ে আহমদ তাঁর মুখোমুখি হয়। অশ্বারোহী প্রশ্ন করে তাকে,

– কি নাম তোমার?

- আহমদ । আপনি কোথেকে আসছেন? কোথায় যাচ্ছেন?

আহমদের প্রশ্ন শুনে অশ্বারোহী ঘোড়া থেকে নেমে জবাব দিলো,

- আমার গভর্নরের একটি জরুরি বার্তা নিয়ে দামেস্কে যাচ্ছি । খুব শীঘ্রই সেখানে পৌছতে হবে, তা তুমি কি করো?

- জী না, তেমন কিছু করি না ।

- আচ্ছা, তুমি ঘোড় সওয়ারীও করো না? অশ্বারোহীর প্রশ্ন ।

- না । আমার আকা অত্যন্ত গরিব লোক । ঘোড়া কিনে দেবার সামর্থ্য তার কোথায়-যদিও ঘোড়ায় চড়ার ইচ্ছা আমার প্রবল এবং পুরনো । কিন্তু ইচ্ছে তো আর সব নয়, পূরণ করার সাধ্য নেই যে !

আহমদের কণ্ঠ কেমন বিষণ্ণ ।

- কোনো চিন্তা করো না । দামেস্কে থেকে ফিরতি পথে তোমার জন্য ঘোড়া নিয়ে আসবো, কেমন !

- সত্যি ! আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় আহমদ ।

- হ্যাঁ, হ্যাঁ সত্যি । অশ্বারোহী জবাব দেয় । এবার আমাকে দ্রুত সরাইখানার পথটা দেখিয়ে দাওতো । আর হ্যাঁ শোন, ঠিক আজ থেকে বিশ দিন পর তুমি এখানেই আসবে । আসবে কিন্তু ।-এ কথা বলেই অশ্বারোহী আহমদের দেখানো পথ ধরে চলতে শুরু করে ।

সন্ধ্যায় আহমদের আকা যখন ঘরে ফিরল, তাকে খুব আনন্দিত মনে হলো । আহমদের মা জিজ্ঞেস করে,

- বিশেষ কিছু পেয়েছে নাকি, এতো খুশি খুশি লাগছে যে?

আহমদের আকা হেসে জবাব দিলেন,

- আজ সরাইখানায় এক অশ্বারোহী জোয়ান এসেছিলো, দামেস্কে যাবে বলে জানিয়েছে, আমার খেদমতে খুশি হয়ে আমাকে সে দশ দশটি স্বর্ণমুদ্রা বখশিশ দিয়েছে ।

- দশটি স্বর্ণ মুদ্রা ! আহমদের মা'র কণ্ঠে একই সাথে অবিশ্বাস ও বিস্ময় ।

- হ্যাঁ গো, দশটি স্বর্ণ মুদ্রা । এবার একটু জোর দিয়েই বলল আহমদের আকা ।

- অনেকদিন পর্যন্ত নতুন কাপড় পরি না । প্রায়গুলোই পুরনো হয়ে ছিঁড়ে গেছে । প্রথমেই কিন্তু কাপড় বানাতে হবে । আহমদের মা প্রস্তাব দিলো ।

- হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। আমরা তো অনেকদিন ভালো খাবারও খাই না। আহমদের আকা বললো।

কিছুক্ষণ পর সেখানে আহমদ উপস্থিত হলে আকা তাকে জিজ্ঞেস করলেন,

- আহমদ, কোথায় ছিলে এতোক্ষণ?

- ঐ তো ঐ রাস্তায় গিয়েছিলাম কাফেলা এসেছে কিনা দেখতে।

- কিন্তু কোনো কাফেলাতো আজ আসেনি। আহমদের আকা বললো।

- ঠিক বলেছেন আব্বাজান, কিন্তু একজন অশ্বারোহী অবশ্য এসেছিলেন। তিনি আমাকে একটি ঘোড়া এনে দেবেন বলে ওয়াদা করে গেছেন।

- অশ্বারোহী কে?

- আহমদের আকা জিজ্ঞেস করলেন।

- নামতো জানা হয়নি, তবে তিনি গভর্নরের বার্তা নিয়ে দামেস্ক যাচ্ছেন। অবশেষে আহমদ ঘটনাটি বিস্তারিত বললো।

- হ্যাঁ এই সেই অশ্বারোহী যে আমাকে দশ দশটি স্বর্ণমুদ্রা বখশিশ দিয়েছে। আহমদের আকা বললো।

তিনি খুব ভালো মানুষ।

- হ্যাঁ, আহমদ। সব মুসলমানই ভালো হয়ে থাকে। দেখবে ফেরার পথে সে সত্যিই তোমার জন্য ঘোড়া নিয়ে আসবে। কারণ মুসলমান ওয়াদা করলে তা অবশ্যই পূরণ করে।

- আব্বাজান, তাকে আমার খুব ভালো লেগেছে এবং আমি তাকে কখনও ভুলবো না। তিনি যদি আর নাও আসেন তবুও আমি মনে রাখবো। আহমদ বললো।

- তুমি নিশ্চিত থাক বেটা, সে আসবেই। দৃঢ়তার সাথে বলল আহমদের পিতা। সেদিনের পর থেকে প্রতিদিন আহমদ বড় রাস্তার পাশে গিয়ে বসে অশ্বারোহী যুবকের জন্য অপেক্ষা করতো। ঠিক বিশ দিন পরেই ঐ অশ্বারোহী আহমদের সাথে সেই নির্ধারিত স্থানেই দেখা করলো।

- আসসালামু আলাইকুম, আহমদ। এই হ'ল আমার দোস্ত জাকি। জাকি, এই হ'ল আহমদ, যার জন্য ঘোড়া নিয়ে এসেছি।

জাকি ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়ার লাগাম আহমদের হাতে দিয়ে বলল,

- এবার এটা নাও দেখি। সামলাও। তুমি যদি একে যত্ন করো তাহলে দেখো, তোমাকেও সে যত্ন করবে।

আহমদ ঘোড়ার লাগাম শক্ত করে ধরলো।

- জাকি, তুমি আমার ঘোড়ায় এসো। অশ্বারোহীর অনুরোধে জাকি তার সাথেই বসলো।

অশ্বারোহী এবার আহমদের দিকে ফিরলো,

- চলি ভাই, আমার খুব জরুরি কাজ আছে। শিগগিরই গভর্নরের সাথে দেখা হবে। যাবার করতে অনুমতি দাও। বেঁচে থাকলে, আল্লাহ চাহেন তো আবার দেখা হবে।

আহমদ খুবই দুঃখিত হ'ল একথা শুনে, ঠিক যতোটা খুশি হয়েছিলো ঘোড়াটি পেয়ে। অশ্বারোহী বিদায় জানাতে আহমদের দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর বৃষ্টি ঝরতে লাগলো। তাকে কাঁদতে দেখে অশ্বারোহী সাদ্ধনার সুরে বলল,

- পুরুষ মানুষ কাঁদে না। তোমাকে একদিন জেনারেল হতে হবে আহমদ। একথা বলেই অশ্বারোহী ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলো এবং অতি শিগগির দৃষ্টির আড়ালে মিলিয়ে গেলো। যেখানে আকাশ মাটিতে মিশেছে সেই পর্যন্ত আর দেখা হলো না। আহমদের ঝাপসা হয়ে এলো যেনো দু'চোখ।

আহমদ ঘোড়া নিয়ে বাড়ি এলো। আব্বা-আম্মাকে অশ্বারোহীর সাথে সাক্ষাতের ঘটনা বললো। তাঁরা খুব খুশি হলেন। বললেন,

- এখন থেকে কিন্তু এর প্রতি যত্ন নেবে।

প্রতিদিন খুব সকালে ঘোড়াটি নিয়ে আহমদ বেরিয়ে পড়ে। ঘোড়াটি ছুটিয়ে অনেক দূর চলে যায়, ঠিক যেমনটা কিছুদিন আগেও সে শুধু ভাবতো। তারপর এক সময় ক্লান্তিতে ঘোড়া নিজে থেকে থেমে গেলে, আহমদ কোনো গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়, ঘোড়াটাকে ঘাস খেতে ছেড়ে দেয়। ধীরে ধীরে সে এভাবে ক্রমাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তীর নিক্ষেপ ও অশ্বারোহণের যাবতীয় কৌশল আয়ত্ত্ব করে। যার কারণে গ্রামের লোকেরা আহমদকে খুব সমীহ করতে শুরু করে।

এটা সেই যুগের ঘটনা যখন খ্রিস্টানরা পবিত্র বায়তুল মুকাদ্দাস দখল করার জন্য সীমান্তে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছিলো। এ খবর পেয়ে মুসলিম সামরিক বাহিনী তাদের দমন করার জন্য আহমদদের গ্রামের রাজা দিয়ে যাচ্ছিলো। খ্রিস্টানদের আচরণে আহমদ অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে সামরিক বাহিনীতে যোগ দিলো।

রণাঙ্গনে আহমদের শৌর্য বীর্য ও বীরত্ব তাকে এমন স্থানে পৌছে দিলো যে শত্রুরাও তার প্রশংসা করতে লাগলো। সে যখনই কোনো একদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তো, সে দিকের শত্রু ব্যুহ ভেঙে তখনছ করে দিতো। শত শত দ্বীনের দুশমনকে খতম করতো নিমিষেই।

বীরত্ব শৌর্য-বীর্যের ফলে পুরো সেনাবাহিনী আহমদের নাম পর্যন্ত অত্যন্ত সম্মানের সাথে উচ্চারণ করতো।

যুদ্ধের দশম দিনে মুসলমানেরা প্রচণ্ড আক্রমণের মুখোমুখি হলো। সেনাপতি ইউসুফ শাদীদ আহত হলেন। এ খবর আহমদের কানে পৌছা মাত্র বিদ্যুৎ গতিতে সে সেদিকে ছুটলো। আহমদ দেখতে পেল, মাটিতে পড়ে আছেন সেনাপতি এবং তার চারপাশে ক'জন মুসলমান মুজাহিদ পেরেশান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেনাপতির তখন অস্তিম অবস্থা।

আহমদ দ্রুত সেনাপতির মাথা নিজের কোলের ওপর সম্বলে রাখলো। মাথার পাগড়ি, যেটা তাঁর মুখমণ্ডলের বেশির ভাগ স্থান দখল করেছিলো, আলতোভাবে খুলে ফেললো। সেনাপতির চোখ প্রায় বন্ধ ছিলো। তবুও আহমদকে চিনতে তার দেরি হলো না। আহমদও বিস্ময়ে দেখতে লাগলো সেই অশ্বারোহীকে যে শৈশবে তাকে একটি ঘোড়া উপহার দিয়েছিলো।

সেনাপতির চোঁট নড়ে উঠল হঠাৎ। সকলে অধীর। কিছু বলবেন তিনি। বেশ কিছু সময় নিয়ে সেনাপতি ধীরে ধীরে শুধু এটুকু বলতে পারলেন,

– আমি নিশ্চিত, আমার ডাক এসেছে। তোমরা এখানে যারা আছো, মনোযোগ দিয়ে শোন-আমার পরে তোমরা আহমদের নেতৃত্ব মেনে নেবে, তার নির্দেশে চলবে।

আহমদ আকস্মিক এই মহান দায়িত্বের কথা শুনে চমকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো এবং দৃঢ় কণ্ঠে বলতে লাগলো,

– না, মহামান্য সেনাপতি- আমি সামান্য একজন সৈনিক মাত্র আমি এর উপযুক্ত নই।

– আহমদ ঝুঁকে পড়ে সেনাপতিকে আবারও একথা বলতে গেলো, কিন্তু কণ্ঠ দিয়ে সে কথা আর প্রকাশ পেলো না। ততোক্ষণে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন সেনাপতি। শৈশবের সেই অচেনা অশ্বারোহী।

যুদ্ধ-বিজয়ের পরে সেনাবাহিনী যখন দামেস্কে পৌছল তখন সেখানকার খলিফা আহমদের বীরত্ব ও শৌর্য-বীর্য সম্পর্কে অবগত হলেন এবং আনন্দিত হয়ে আহমদকে মুসলিম জাহানের সেনাপতি নিযুক্ত করলেন।

বেদীন

মূল : আদিল কাওকার

দীনু চাচা আমাকে অতিরিক্ত ভালোবাসতেন। মনে করতেন নিজের সন্তানদেরই একজন। বাজারে নিয়ে যেতেন কাঁধে চড়িয়ে, ভালো আর দামী জিনিসপত্রও কিনে দিতেন। এ ব্যাপারে আত্মা নিষেধ করলে বলতেন, ‘ওতো আমার মা মণি, সোনা মা আমার।’

এখনও আমার ভালোভাবে মনে আছে, দীনু চাচার জন্য আমাদের মহল্লার সব ছেলে মেয়েরাই অস্থিরভাবে অপেক্ষা করতো। কেননা প্রায় প্রতিদিনই চাচা তাদের প্রত্যেককে চার আনা করে পয়সা দিতেন। সন্ধ্যা পাঁচটা বাজার সাথে সাথেই মহল্লার ছেলেমেয়েদের হৈ চৈ পড়ে যেতো। আইসক্রীমওয়ালা কোথা থেকে ঝাট করে এসে পড়তো। এদিকে চাচা তো পয়সা দিচ্ছেন, ওদিকে আইসক্রীমওয়ালার কাছেও ভিড় বাড়ছে।

অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের তুলনায় চাচা আমাকে একটু বেশীই প্লেহ করতেন। কিছুটা এ জন্যেও যে, আমাদের পরিবারের সাথে চাচার জানাশোনা একটু বেশি রকমই ছিলো।

এসব কথা অবশ্য অনেকদিন আগের। দেশ থেকে আসার পর লন্ডনের জাঁকজমকের মধ্যে এমনভাবে হারিয়ে গেলাম যে, দীনু চাচার কথা আর মনেই রইলো না। তখন আর এমন কোনো নৈকট্যও ছিলো না যে মনে পড়বে।

শৈশবেই ফুফু আত্মা আমাকে তাঁর ছেলের জন্য চেয়ে নিয়েছিলেন। আমার বয়স যখন মাত্র দশ বছর তখনই তাঁর সাথে আমাকে লন্ডন যেতে হয়েছিলো এবং

সেখানেই আমাদের বিয়ে হয়েছিলো। এক যুগ পর দেশে ফিরলাম। চাচার কথা তখন আর মনে নেই। হঠাৎ তাঁকে একদিন বাজারে দেখলাম। শতছিন্ন জাক্সা-জোকা, উকু-খুকু চুল, হাতপাতা ভিক্ষুক এক। এমন করুণ অবস্থায় তাকে দেখে তো আমি থ। ভাবলাম, অন্য কেউ হবে হয়তো, কোনো আজ্ঞবী। কিন্তু না, এ তো সেই দীনু চাচাই।

আমার দৃষ্টি পনের বছর আগের সেই চাচাকে ঝুঁজে ফিরতে লাগলো। যিনি ছিলেন সবারই পরম শ্রদ্ধেয়। জমিদারী ঠাট আর রমরমা চলনের সে চাচা। সেই চাচার মধ্যে আর আজকের চাচার মধ্যে কত না যোজন যোজন ফারাক।

মাথায় সারাটা দিন ঐ চিন্তাই ঘুরপাক খেল। বারবার ভাবতে লাগলাম শেষ পর্যন্ত দীনু চাচার একি করুণ পরিণতি। হাত পাতা ভিক্ষুকের মতো এতোটা খারাপ অবস্থাইবা তার কেনো হলো। অন্যের দুঃখ মোচনের জন্য একদিন যে অকাতরে দান করতো আজকে সে নিজেই কেনো পথে পথে হাত পেতে ফিরছে। ভাবতে ভাবতে কলজেটা টোচির হয়ে যেতে লাগলো। আম্মাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি শুধু এটুকুই বললেন যে, লোকটার ব্যবসা-বাণিজ্য যা ছিলো শেষ হয়ে গেছে, সংসারও উজাড়; এখন কোনো এক ভিক্ষুক বন্ধুর সাথে বস্তুতেই থাকে।

এমনিতেই চাচার অবস্থা দেখে অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। এ মর্যাস্তিক ঘটনা আম্মাকে আরো বেশি উত্তেজিত করে দিলো। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলাম, ওখানে গিয়েই আসল ঘটনাটা জেনে নিতে হবে। সুতরাং একদিন আম্মাকে নিয়ে বস্তুতে গেলাম। চাচার ঝুপড়ি ঝুঁজে পেতে আমাদের খুব একটা বেগ পেতে হলো না। পীরো নামী এক ভিক্ষুকের সাথেই তিনি থাকেন।

চাচা বেশ কিছুক্ষণ ধরে আম্মাকে দেখছিলেন। কিন্তু চিনে উঠতে পারছিলেন না। সম্ভবত, দুশ্চিন্তার ধুলোবালি তার দু'চোখে ধাঁধা এনে দিয়েছে অথবা মিটমিট করে জ্বলা স্মৃতির প্রদীপ তার দুরন্ত ঝড়ের আঘাতে নিভে গেছে।

আমি সাহস করে মুখ খুললাম, 'চাচা! আমি তোমার সেই মামণি যাকে তুমি কাঁধে চড়িয়ে বেড়াতে বেরুতে, বিস্কুট কিনে দিতে, টফি কিনে দিতে, মনে নেই?' মুহূর্তের মধ্যেই চাচার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বাহু দুটো সম্প্রসারিত করে বলে উঠলেন, 'আমার সেই মণি, সোনার মণি মা আমার!' সহনশীলতার সমস্ত বাঁধন যেনো তার ছিঁড়ে গেলো। চাচা হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগলেন। আমিও ঘটনার আকস্মিকতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর মনটা যখন একটু হালকা হলো তখন প্রশ্ন করলাম, 'চাচা শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা কিভাবে হলো?'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন তিনি, ‘নিজের পতনের ইতিহাসটা কোথা থেকে কিভাবে যে শুরু করবো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। আমার জন্ম অমুসলিম পরিবারে। পিতা-মাতা ছিলেন গরিব। একটু বড় হতেই তারা আমাকে এক মুসলমান ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দেন। এনায়েত হাজী অশেষ পুণ্যবান ও খোদাভীরু মানুষ। খুব বড় ব্যবসায়ী হয়েও তিনি ছিলেন নিরহংকার ও উদার চিত্ত। একটি মাত্র মেয়ে তাঁর। চেহারায়ে শুধু নয় বরং চরিত্রেও সে ছিলো অনুপম। আমি যে অন্য সম্প্রদায়ের লোক, তাঁর একজন সাধারণ চাকর- এ কথা হাজী সাহেব মনে নিতেন না। এই সময় আমার মা বাপ এক মর্মান্তিক বিপর্যয়ের শিকার হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। হাজী সাহেবের শ্রদ্ধা মমতা আমার প্রতি আরো বেড়ে গেলো, বাড়লো সহানুভূতিও। ব্যবসা বাণিজ্য ও সংসার দেখাশোনার আমি তাঁর একটি হাতে পরিণত হয়ে গেলাম।

ঐ সময় স্বাধীনতা আন্দোলন চরম আকার ধারণ করেছিলো, দেশ দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল। আমার অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ভারতে পাড়ি জমালো। কিন্তু হাজী সাহেবের আন্তরিকতা ও সহানুভূতি আমার পা দুটি যেন শেকড় বানিয়ে দিয়েছিলো যা মাটিকে একেবারে গভীরভাবে আঁকড়ে ধরলো। তাঁর চরিত্র আর আচার ব্যবহার আমাকে এতোদূর প্রভাবিত করলো যে, তাঁকে ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠলো না। দীনু চাচা কথা বলতে বলতে একটু থামলেন, যেন পুরনো দিনের ঘটনাগুলোকে একটু নাড়াচাড়া করে নিলেন। তারপর হিসাব মিলিয়ে শুরু করলেন, ‘মামণি, সোনা মা আমার আমি হাজী সাহেবের সাথে কাটিয়েছি মূল্যবান দশটি বছর। কিন্তু একটি কথা আজো আমার বুঝে আসে না যে, তিনি এতোভাবে আমাকে পুরস্কৃত করার পরও কেনো যে ইসলাম গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করেননি। হ্যাঁ, কখনো কখনো কল্যাণ ও মঙ্গলময় কাজ করার জন্যে উপদেশ দিতেন বৈ কি। তবে তিনি কেবল নিজেকে উপস্থাপন করার মধ্যে দিয়ে ইসলামের সামগ্রিক মাদুর্য ফুটিয়ে তুলতেন। আমি তার জীবন থেকে এমন এমন পাঠ নিতে লাগলাম যে নিজের অজান্তেই কখন যেনো ইসলামকে গ্রহণ করে বসলাম। আমি যখন তাকে সত্যিকারের একজন আত্মসমর্পণকারী ও বিনয়ী ন্যায় নামাজ এবং কুরআন অধ্যয়ন করতে দেখতাম তখন আমার সমস্ত মন প্রাণ যেনো চিৎকার করে বলে উঠতো, ‘আহ, কতোনা সুন্দর এই জীবন-পদ্ধতি অথচ মানুষ কী গভীর ভুলের মধ্যে নিমজ্জমান; কেবল দুনিয়া নিয়েই মাতামাতি করছে-হাজার আফসোস...

নিজের সাথে হাজী সাহেবের মহানুভবতা আর সহৃদয়তার কথা যখনই তুলনা করতাম তখনই ভাবতাম, এ জীবনব্যবস্থা কত না বিস্ময়কর। কোনো বিভেদ নেই ধনী-দরিদ্রে, নেই কোনো শ্রেণি সংঘাত। কী জানি এক অজানা আকর্ষণ, একটি

অশরীরী চাঞ্চল্য এইভাবেই আমাকে ইসলামী জীবনব্যবস্থার দিকে টানতে শুরু করলো। তারপর এমন একটি শুভ দিন এলো যেদিন আমি পরিপূর্ণ প্রত্যয়ের সাথে উচ্চারণ করলাম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

চাচা প্রশংসিত নিঃশ্বাস ছেড়ে দিলেন আর হাঁটুর উপর মাথা আলতোভাবে দোলাতে লাগলেন। তার অক্ষুট কথাগুলো ঠোঁটের ওপর তরঙ্গায়িত হতে লাগলো, অজান্তেই তাঁর চোখের নদী বেয়ে নামতে লাগলো টলমল অশ্রুধারা। ব্যথার বহিঃপ্রকাশ একটুখানি সামলে নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন। ‘আজকে যখন সেই সুমধুর সময়ের কথা মনে পড়ে যায় কলজে চৌচির হয়ে যেতে চায়। যখন আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম হাজী সাহেব অত্যন্ত খুশি হলেন। এতোদূর খুশি হলেন যে, আত্মীয়-স্বজনদের দাওয়াত করে খাওয়া-দাওয়ার এক বিরাট এক বিরাট আয়োজন করে বসলেন। তিনি নিজেই আমার নাম ঠিক করলেন ‘দ্বীনদার’। এর কিছুদিন পর তার মেয়ে আখতারীর সাথে আমার বিয়ে দিয়ে আর অনুগ্রহ করলেন। তাঁর ঘর সংসারের সাথে আমার সম্পর্ক গভীরতর হলো। ঐ সময় আমি নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি বলে মনে করতাম। আমার কখনো কোন দুর্ঘটনা ঘটবে এই ধরনের কোনো দৃষ্টিভঙ্গিই তখন ছিলো না আদৌ। কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল অন্য রকম।

আমার বিয়ে হবার ঠিক দু’বছর পর আমার সবচেয়ে বড় হিতাকাঙ্ক্ষী সেই মহানুভব হাজী সাহেব ইন্তেকাল করলেন; আর আমার দু’চোখে নেমে এলো ঘনঘোর অন্ধকার। যদিও এখন আমি তার সমস্ত সম্পত্তির মালিক হয়ে বসলাম কিন্তু তাঁর নৈকট্য আমাকে যে আন্তরিক ও মানসিক প্রশান্তি দিত সেই নৈকট্য চির দিনের জন্য হারিয়ে ফেললাম। কিন্তু দুঃখ যতো সাংঘাতিকই হোক না কেনো তা এক সময় যা হওয়ার হয়ে যায়, ধীরে ধীরে তার প্রচণ্ডতা স্তিমিত হয়ে আসে।

আমি এবং আখতারী পরস্পরের প্রতি খুবই আসক্ত ছিলাম। আমি ইসলামী জীবনব্যবস্থার একজন নিষ্ঠাবান অনুসারী ছিলাম বলে আমার প্রতি আখতারীর অনুরক্তি একটু বেশীই ছিলো। মূলত: এ কারণেই তার আনন্দ যেন উপচে পড়তো। আমার আরাম আয়েশের প্রতি আখতারীর ছিলো সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি। সেবা-যত্নের কোনো ত্রুটি করতো না। সন্ধ্যায় যখন ঘরে ফিরতাম তখন এক টুকরো মিষ্টি হাসির বিনিময়ে সে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতো। বড় অন্তরঙ্গ পরিবেশে সে আমার সারা দিনের কার্যক্রম শুনতো। খাওয়া-দাওয়ার পর দীর্ঘ রাত পর্যন্ত চলতো সংগোপন আলাপন। সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নবী জীবন সম্পর্কে বৈচিত্র্য সব কথা শোনাতো। সাহাবাদের সম্পর্কে নানা ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতো এবং ইসলামী জীবনব্যবস্থার ঐ সব শাখা উপশাখার উপর আলোকপাত করতো যে সব সম্পর্কে

আমি আদৌ কিছু জানতাম না। আমরা দুজনই নিয়মিত নামাজ পড়তাম আর কুরআন তেলাওয়াত করতাম। বস্তুত আমরা রচনা করেছিলাম এক সুখের নীড়।

মামণি, খোদা আমাকে সব কিছুই দিয়েছিলেন কিন্তু চার চারটি বছর অতিক্রান্ত হবার পরও আমরা সন্তান-সন্ততির মতো পরম নেয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকলাম। কখনও কখনও আমার ধৈর্যচ্যুতি এতোদূর পর্যন্ত ঘটতো যে, মাঝে মাঝে নাস্তিকদের মতো কথাবার্তা বলে ফেলতাম। একেতো আমি ছিলাম নও মুসলিম তদুপরি এতোদূর মানসিক ভারসাম্য আমার তখনও অর্জিত হয়নি যা একজন জন্মগত মুসলমানের জন্য স্বাভাবিক। তবুও আখতারী আমাকে অনুপ্রাণিত করতো। আমি যখন অস্থির হয়ে পড়তাম তখন সে বলতো, আল্লার রহমত থেকে নিরাশ হতে নেই, তাঁর দরবার তো আলোকমালায় সুসজ্জিত, যেখানে কোনো অন্ধকার নেই।

মহল্লার অন্যান্য মেয়েরা তাকে পরামর্শ দিত যে, অমুক পীর সাহেবের কাছ থেকে তাবিজ আনো, অমুক বুজর্গানে দ্বীনের কাছ থেকে পানি পড়া আনো, দোয়া আনো। কিন্তু তার জবাব ছিলো এতোটুকুই, আমি আমার খোদার কাছে চাইবো। যদি আমাকে তিনি নিঃসন্তানই রাখতে চান তবে আমি তাঁর ইচ্ছার উপরেই উৎসর্গ করতে রাজী আছি। খোদার সে বান্দী তার নিঃশ্বাস পর্যন্ত ছিলো অত্যন্ত ধৈর্যশীলা ও প্রশংসাপরায়ণ।

দিন যেতে লাগলো, আমি সন্তান সম্পর্কে একেবারেই নিরাশ হয়ে যেতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত আখতারী তার দূর সম্পর্কের এক বোনের দশ বছর বয়সের এক মেয়েকে পালিতা কন্যা হিসেবে গ্রহণ করলো। সেই মেয়ে নাজমা যখন ঘরে এলো তখন যেনো পল্লব পুষ্পহীন বন-বনাঙ্কে নব বসন্তের আগমন ঘটলো। এখন তো আমার নাজমাকে নিয়েই সময় কাটে, অন্য কিছু করার মতো অবকাশ কোথায়? আর আখতারীর অবস্থা সে তো দেখবার মতো বটে। তার চলায় বলায় কেমন নতুন এক সম্মোহন, চোখে মুখে খুশির আমেজ সব সময় লেগেই আছে। আমি ঘরে ফিরলে আমার ও নাজমার জন্য এটা ওটা নিয়ে সে হাজির হবেই। উন্মাতাল মন যেনো তার শক্তির স্বাদ খুঁজে পেয়েছে। নীড় হারা এক পাখি যেনো আবার তার নীড় খুঁজে পেয়েছে।

এখন আমি ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে আরো একটু নজর দিলাম, তা আরো কিছু সম্প্রসারিত করার জন্যে তেলের কোম্পানী ফেঁদে বসলাম। বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করলাম এর শাখা প্রশাখা। উত্তম সরবরাহেরও ব্যবস্থা করলাম। সোনামণি, আমি এখনও দৃঢ়তার সাথে এ কথা বিশ্বাস করি যে, ইসলাম গ্রহণ করার কারণেই অমন ভাগ্যবান হতে পেরেছিলাম। আমি আল্লাহ ও রাসুলের

নাম নিয়ে যে কাজেই হাত দিতাম সাফল্য ও স্বার্থকতায় তা ভরে উঠতো। যতোদিন অমুসলিম ছিলাম ততোদিন মানসিক শান্তি ও আধ্যাত্মিক প্রশান্তিও কখনো এমনটা অনুভব করিনি, যা আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর করতে সক্ষম হয়েছি। অন্তরে যদি কোনো শূন্যতা থেকে থাকে তাতো কেবল সন্তান ছিলো না বলেই। নাজমাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে অনুভূতির এই সূক্ষ্মতম যন্ত্রণা ভুলে যেতে চেয়েছিলাম।

নাজমা যখন প্রাপ্ত বয়স্কা হলো ধুমধাম করেই তার বিয়ে দিয়ে দিলাম। সেই তো আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রস্থল। নাজমা তার স্বামীর সাথে চলে গেলো অনেক দূরে। আমাদের ঘরে আবার সেই শূন্যতা। আখতারী সারাদিন খাটের উপর পড়ে থাকতো। যখন প্রতিবেশীদের ছেলে-মেয়ে আসতো কেবল তখনই তাকে স্বতঃস্ফূর্ত মনে হতো। নয়তো সারাদিন তার মুখাবয়ব জুড়ে টুকরো টুকরো মেঘ যেনো ভেসে বেড়াতো। আমি উডু উডু আর অশান্ত মন নিয়ে ফ্যাক্টরীতে যেতাম। কেবল অত্যাবশ্যকীয় কাজগুলো করেই ঘরে ফিরতাম। বাদ বাকি সবকিছু পড়ে থাকতো চাকর বাকরদের ওপর।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে অস্থিরতা এবং চাঞ্চল্যও বাড়তে লাগলো। কিন্তু নৌকা যখন গহীন গাঙে ডুবে যায় তখন তীরের আশা দূরাশা নয় কি? এ দিকে হৃদয় যেনো সান্ত্বনা খুঁজতে গিয়ে বলতে লাগলো- যে সব কোমলমতি ছেলে-মেয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে আমাদের ঘরে আসে, হাসি আর গানে লুটিয়ে পড়ে; যদি আমরা ওদেরকে আপন করে নেই তাহলে ফুটনুখুখ ঐ সব ফুলকলিরাই আমাদের অন্তরের প্রশান্তি ও এতমিনানের কারণ হতে পারে। মানবতার দিক থেকে ওরাতো আমাদেরই একান্ত আপনজন, আত্মার আত্মীয়। নাই বা হলো ওরা রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ কোনো পরমাত্মীয়। আমরা ধীরে ধীরে ওদেরকে কাছে টানতে লাগলাম। আখতারী আশে পাশের বাড়িতে মাঝে মধ্যে আসা যাওয়া শুরু করলো। সময় সময় কোনো কোনো ছেলে মেয়ের কাপড় চোপড় বানিয়ে দিতো, সোয়েটার বুন দিতো। আমি প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঘরে ফিরলে মহল্লার ছেলে মেয়েরা এসে ভীড় জমাতে। কেউ কাঁধে চড়তো। কেউ পেছন থেকে কোমর জড়িয়ে ঝুলে থাকতো। দু'জনকে বাজার থেকে ঘুরিয়ে আনলাম তো চারজন বায়না ধরলো। চারদিকে সে কী জনপ্রিয়তা তোমার দীনু চাচার।

প্রথম প্রথম নাজমার চিঠিপত্র নিয়মিতই আসতো। কিন্তু এক সময় তা বন্ধ হয়ে গেলো। আমি ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকায় ওর ওখানে যাবার মতো সময় বের করতে পারতাম না। এদিকে ঐ সব বাচ্চা-কাচ্চাদের রেখে একটি দিনও বাইরে থাকতে মন চাইতো না। বাইরের কোনো পৃথিবী কল্পনা করতে পারতাম না, সহ্যও হতো না।

এই সময় হঠাৎ একদিন নাজমার চিঠি পেলাম। দুই হাজার টাকা যে করে হোক পাঠাতে হবে। তড়িঘড়ি করে পাঠালাম। ক্রমাগত এই রকম একটা ধারা চালু হয়ে গেলো। প্রতি দুই এক মাস অন্তর তাকিদ আসতে লাগলো। না করলাম না। কেনোই বা করবো। আমাদের তো আর কোনো উত্তরাধিকারী নেই। একটা আন্তরিক টান নাজমার জন্য সব সময়ই অবশিষ্ট ছিলো। কিন্তু যখনই সে যেতে লিখতো তখনই কোনো না কোনো একটা বাহানায় ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতাম। ইতিমধ্যে আবার ও দশ হাজার টাকা চেয়ে পাঠালো। আমি লিখলাম, নিজে এসে নিয়ে যাও। এই ভেবে যে, হয়তো সে নিজেই এসে যাবে কিন্তু নাজমা জবাবে এমন চিঠি লিখলো যা আমার কলজেটাকে টুকরো টুকরো করে দিলো। এ কথা কখনো ভাবতেও পারিনি যে, তার আর তার স্বামীর লক্ষ্য ছিলো আমাদের ধন-সম্পদ। মূলত: আমাদের জন্যে তাদের কোনো ভালোবাসাই ছিলো না। অথচ তাদেরকে আমরা হৃদয়ের টুকরো ভাবতাম। হঠাৎ যেন সমস্ত অস্তিত্ব চিৎকার করে বলে উঠলো, রক্তের সম্পর্ক ছাড়া আর সব সম্পর্ক মিথ্যা। আজ যদি আমাদের নিজেদের কোনো ছেলে-মেয়ে থাকতো তাহলে নিশ্চয় তারা আমাদের দুঃখ বেদনা হৃদয় দিয়ে বুঝতো। তবুও নাজমাদেরকে টাকা পাঠালাম। কিন্তু এই ব্যাপারটা আমার মন-মানসিকতার ওপর দারুণভাবে প্রভাব ফেললো; আমার সমস্ত অন্তর মেকী আত্মীয়তার ঘৃণায় ভরে উঠলো। এখন মহল্লার ছেলেমেয়েদেরকেও অবহেলা করতে শুরু করলাম। ব্যাপারটা চিন্তা চেতনায় এতোদূর প্রভাব ফেললো যে, শরীরও ভেঙ্গে পড়তে লাগলো, মেজাজ হয়ে গেলো খিটখিটে। এমন কি আখতারীর কথাও বিষ বিষ লাগা শুরু হলো। ভালোর জন্যেও কোনো কথা বললে সহ্য হতো না।

সন্তান-সন্ততির কামনা, এ যে কতোটা বিদঘুটে। আল্লাহ তাঁলা এ কেমন একটা উন্মাদনা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যার জন্যে পিতামাতা সব সময়ই উদগ্রীব থাকেন অথচ জানা নেই সন্তান সৎ হবে কি অসৎ হবে। ঐ নেয়ামত থেকে বঞ্চিত মানুষ কি যন্ত্রণাদাক্ষ জীবন যাপন করে আমরাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। এই সময় যখন নিজেদের দিকে তাকাতাম তখন মন-প্রাণ আকুল কান্নায় ভেঙে পড়তো। পরিব্যাগ্ত এই ব্যবসা কতো কতো সম্পদ, তবুও হৃদয় রুগ্ন- উপশম নেই। কোনো মাহফিলই আমাকে তৃপ্ত করতে পারতো না। কেননা আমার হাতের মুঠোয় যে কোনো কচি হাত খুঁজে পেতাম না। হায়! মৃত্যুর পর আমার কোনো বংশধর থাকবে না, আমার নাম নেওয়ার মতোও কেউ থাকবে না- মাথার শিরা উপশিরা ছিঁড়ে যাবার মতো এ সব ভাবনা অসহ্য, অসহ্য!

আমি আখতারীকে চিকিৎসা করালাম কিন্তু সবই নিষ্ফল। দ্বিতীয় বিয়ের কথা বললাম তো কয়েক মাস পর্যন্ত ঝগড়া-ঝাটি লেগেই থাকলো। বস্তুত: আমি

এতোদূর আবেগ প্রবণ হয়ে পড়েছিলাম যে, আখতারীকে পর্যন্ত মারপিঠ করা শুরু করলাম। অথচ এমনও সময় ছিলো, তার এতোটুকু কষ্ট দেখলেই পেরেশান হয়ে পড়তাম। আর আজ সে চোখের বালি। আমার এই হঠাৎ পরিবর্তনে চেনা জানা লোকেরাও অবাক হয়ে গেল! কিন্তু দুরারোগ্য এ রোগের ওষুধ তো কেউ দিতে পারলো না।’

দীনা চাচা কাশী চাপতে গিয়ে ফুলে ফুলে উঠতে লাগলেন। আমি দরদভরা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতে লাগলাম। কিছুটা সামলিয়ে নিয়ে আবার তিনি শুরু করলেন, ‘মামণি, সেদিন আমি ভুল করেছিলাম, সেই কথাই সমস্ত অন্তর আজ আমার চিৎকার করে বলছে। আমার চোখে পড়েছিলো মূর্ততার আবরণ, বুদ্ধিকে অতিক্রম করেছিলো আবেগ। আমার উচিত ছিলো না আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ থাকা। কিন্তু কি এক দুর্ভাগ্যের কারণে এই রকমটা হয়ে গেলো। হায়! আমি আল্লাহর অন্তিত্বকে পর্যন্ত অস্বীকার করে বসলাম; আল্লাহর কুদরত নিয়েও কত রকম উল্টা-পাল্টা কথা বলা শুরু করলাম।

মহব্বত আর ভালোবাসা দিয়েই আখতারী আমাকে সব কিছু, বোঝাতে চেষ্টা করতো। কিন্তু কোনো ফল হলো না। বরং আমি আরো উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। আখতারীকে মারধর করাটা প্রতিদিনের কর্মসূচিতে পরিণত হলো।

ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে খেয়াল থাকলো না। তাও লাটে উঠলো। সার সংক্ষেপে এই যে, আমি আল্লার না শুকুরী শুরু করেছিলাম, সেই জন্যে তার পক্ষ থেকে এলো শ্রেফতারী পরওয়ানা। কর্মচারীরা তলা শূন্য করে সরে পড়তে লাগলো। মূলত: তিন মাসের মধ্যেই সব ‘ফিনিস’। যখন আর উপায় থাকল না তখন জ্বালানি কাঠের ছোট্ট একটা ব্যবসা শুরু করলাম। কিন্তু অবস্থার কোনো উন্নতি হলো না। আমি আল্লার অভিশাপে ভালো মতো আবৃত্তি হলাম।

একদিন আখতারী ফজরের নামাজ শেষ করে খাটের উপর বসে কুরআন তেলাওয়াত করছিল। আওয়াজ ছিল কিছুটা উচ্চতর। ক্ষেপে গিয়ে বললাম, ‘আন্তে পড়ো, না হয় অন্য ঘরে যাও। সে আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করলো, ‘আপনিও উঠছেন না কেনো? ওজু করে নামাজ পড়ুন না।’

ইদানিং আমার তো তার কথা সহ্যই হচ্ছিলো না-লাঠিপেটা শুরু করলাম। তারপর রাগে ফেটে পড়তে পড়তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। প্রায় বারটা বাজে বাজে এ রকম সময় এক ব্যক্তি দোকানে এসে বললো, ঐ ওখানটায় কাঠ জমা করা হয়েছে, চলুন, দেখবেন, পছন্দ হলে ভেতরে আনা যাবে। আমি লোকটির পেছনে পেছনে চললাম। যখন রেল ক্রসিং এর কাছে পৌঁছলাম তখন উল্টো দিক থেকে একটা ট্রাক এসে আমাকে প্রচণ্ড এক ধাক্কা মেরে চলে গেলো। উরুর হাড় একেবারেই ভেঙ্গে গেলো, আমি আমার কর্মফল হাতেনাতেই পেলাম।

তিন মাস পর্যন্ত হাসপাতালে থাকতে হলো। ব্যবসা বাণিজ্য যাও ছোট খাট ছিলো তাও পটল তুললো। চিকিৎসার জন্য পুঁজিও গেলো। দুই মাস পর্যন্ত হাওলাত করে করে টানা হেঁচড়ায় সংসার চললো। শেষ পর্যন্ত হাওলাত দেয়াও সবাই বন্ধ করলো। তারপর এমন দুরবস্থায় নিপতিত হলাম যে, অগত্যা নাজমার কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। অবস্থা যখন ভালো ছিলো ওদের ওখানেই তখন কিছু, জমি খরিদ করেছিলাম। জমিটা নাজমাদের হেফাজতেই ছিলো। ভাবলাম, ওটা বিক্রি করেই ছোট খাট কিছু একটা শুরু করবো। যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছি ঠিক এমন সময় আখতারীর টাইফয়েড হলো আর চিরদিনের জন্যে ও অভিমান করে চলে গেল। একলা কেবল আমি থেকে গেলাম দুঃখ ভোগ করার জন্য। নাজমার কাছে শেষ অবধি পৌঁছতে হলো। জমির কথা বললাম। প্রথমে তো টালবাহানা শুরু করলো, তারপর সাফ সাফ বলে দিলো, সে জমি নেই, বিক্রি হয়ে গেছে অনেক আগেই।

আমি উদভ্রান্ত হয়ে গেলাম। দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বাঁচার জন্যে নেশা করা শুরু করলাম। সব সময়ই নেশায় বুদ্ধ হয়ে থাকতাম। কিন্তু নেশার জন্যেও তো টাকার প্রয়োজন। কাজ কর্ম করারও শক্তি নেই। শেষ অবধি ‘পীরোর’ কাছে চলে এলাম। সারাদিন ভিখ মাঙি। দুবেলা রুটি দেয় পীরো। জীবন তো এই ভাবেই কাটছে।’

আমি তাঁকে বুঝাবার উদ্দেশ্য নিয়েই বললাম, ‘চাচা, আপনি কেনো তওবা করছেন না। আল্লার সামনেই মাথা নতো করুন; উদ্ধার করার মালিক তো তিনিই। পরম আশ্রয়ও তিনিই।’ চাচা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ‘মা মণি, কোন মুখ নিয়ে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াবো। আমার মন তো ডেকে ডেকে এই কথাই বলে যে, আমি এই শান্তিরই সত্যিকারের উপযুক্ত। আমার মতো বেদ্বীনের জন্যে, অকৃতজ্ঞের জন্যে এই রকম হওয়াই দরকার ছিলো।’

আমরা দুই মা মেয়ে তার এই পরিণতির জন্যে দুঃখ করতে করতে বাসায় ফিরলাম। বাসায় ফিরে আমাদের বললাম, ‘আম্মা, চাচাকে এখানে নিয়ে আসলে কেমন হয়? তার খরচ আমি লন্ডন থেকে নিয়মিত পাঠাবো।’

আম্মা অসহায়ের মতো বলে উঠলেন, ‘মা, তাকে তো আমরা কিছুই দিতে পারি না? তোমার আক্কা তো কতোবার তাকে এখানে এসে থাকতে বলেছেন, কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা, কিছুতেই থাকবেন না এখানে।’ আমি কথা হারিয়ে ফেললাম। ভাবলাম, আল্লাহ রহমানুর রাহীম তাঁকে হয়তো দুনিয়াতেই শান্তি দিতে চেয়ে থাকবেন।

এক পেয়ালা অশ্রু

মূল : নযর যাইদী

নিজের খুপরির লোহার তৈরি দরজার গরাদ ধরে সে পিপুল গাছের আকাশ ছোঁয়া ডালে কিচির মিচির গান গেয়ে বেড়ানো পাখিগুলোর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো। এইমাত্র কয়েক দিন হলো সে খুপরির বাসিন্দা হয়েছে। আজ অষ্টম দিন। কিন্তু এই অল্প দিনের মধ্যেই সে জেলখানার আশপাশের গাছগুলোতে বসবাসকারী ঐ পাখিগুলো সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনে ফেলেছে।

পূবের আকাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে না উঠতেই পাখিগুলোর কলধ্বনি চতুর্দিক মুখর করে তোলে। এসব এলোপাতাড়ি গানের মর্মার্থ বোঝা না গেলেও কিচিরমিচির আর হৈ চৈ-এর আড়ালে লুকিয়ে থাকা এক ধরনের আনন্দ খুবই মজার। কিন্তু সবচেয়ে মজার লাগে সমস্ত বাধা-বন্ধনের গণ্ডি পেরিয়ে পাখিগুলোর যত্রতত্র ওড়াওড়ি। গাছগাছালির এসব বাসিন্দারা যার যার ইচ্ছে মত কখনো ডেকে ওঠে, কখনো পাখা ঝাপটায়।

যখন থেকে সে বন্দী জীবন শুরু করেছে তখন থেকেই তার অন্তরে স্বাধীনতার মর্যাদা ও মূল্য হাজার গুন বেড়ে গেছে। তার কাছে মুক্ত আকাশে উড়ন্ত পাখিগুলোকে এক আলোকিত পৃথিবীর অতুলনীয় সৃষ্টি বলে মনে হয়েছে। পাখিগুলো সূর্য ওঠার সাথে সাথেই খাদ্যের সন্ধানে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। গাছের ডালে ডালে রয়ে যায় শুধু বাসা আর ডিম। ঐ সময় তাকেও কঠোর পরিশ্রম করানোর জন্যে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সন্ধ্যায় যখন সে ফিরে আসে তখন পাখিদের ঐ আনন্দ-গীতি শুনবার মতো কিছুটা সময় তার মিলে যায়। সূর্যের কিরণ নান হয়ে এলেই গাছের ওপর পাখিরা উড়ে আসতে শুরু করে আর তাকেও খুপরিতে

আটকানো হয়। এ সময়ই সে হয়ে পড়ে ঐ গায়ক প্রতিবেশীদের আনন্দগীতির একমাত্র উপভোগকারী।

নিয়মমাফিক আজও সে লোহার দরজার গরাদ ধরে তার নিষ্পাপ প্রতিবেশীদের দুর্বোধ্য গানের ভেতর মশগুল। এমন সময় জেলের জমাদার লম্বা লম্বা পা ফেলে তার খুপরির কাছে এলো এবং একটি সংবাদপত্র দেখিয়ে বললো, 'দোস্ত, তুমিতো দেখছি রাতারাতি নামী-দামী ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে গেলে। তোমাকে নিয়েই বিরাট খবর আজকের পত্রিকায়, পড়বে?'

সে চমকে উঠে জমাদারের দিকে তাকালো এবং নির্লিপ্তভাবে পত্রিকাটি নেবার জন্যে হাত বাড়ালো। জমাদার গরাদের ফাঁক দিয়ে পত্রিকাটি ঢোকাতে গিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলো 'ছুরি, চাকু ব্যবহার করা ততোটা দোষের নয় যতোটা দোষের হচ্ছে পরের মেয়ে ছেলের গায়ে হাত তোলা, তাও আবার সেই সব মেয়ে যাদের সাথে রয়েছে অন্য কারো ভালোবাসার সম্পর্ক। এ ধরনের কাজ জঘন্যতম পশতু ছাড়া আর কিছুই নয়। ছি... ছি... ছি...'

হঠাৎ সে জমাদারের হাত থেকে পত্রিকাটি ছিনিয়ে নিলো এবং কোনো কথা-বার্তা ছাড়াই পড়তে শুরু করে দিলো। পত্রিকাটির স্টাফ রিপোর্টার অপরাধ সংঘটিত হবার পর থেকে শাস্তি প্রদান সমস্ত ঘটনারই ছবিসহ বর্ণনা দিয়েছে। আধা কলম পড়েই তার মাথায় আগুন ধরে গেলো। সে পত্রিকাটি দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে পায়ের তলায় পিষে ফেললো।

সে তার খুপরির এবড়ো থেবড়ো ফরাশে গুয়ে ভাবছে অতীতের কথা। চেষ্টা করছে ফেলে আসা ঘটনাগুলোকে একেবারে ভুলে যেতে এবং বর্তমান জীবনটাকেই জীবনের সংক্ষিপ্ত সারাংশ ভেবে নিতে। কিন্তু সে ব্যর্থ হচ্ছে। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভাবনার কুৎসিত চিত্রগুলো মাথায় প্রবেশ করছে আর ক্রমাগত চিন্তার অন্ধকার নদীতে হাবুডুব খাচ্ছে। খুপরির লোহার দরজা এমন সময় আস্তে আস্তে ফাঁক হয়ে গেলো এবং আলখেল্লা পরা দীর্ঘ আকৃতির এক ব্যক্তি পরিপূর্ণ গান্ধীর্ষ নিয়ে তার কাছে এসে দাঁড়ালো। আগন্তকের দিকে চমকে তাকালো সে। তার কিছু বলার আগে আগন্তক নিঃসংকোচে জিজ্ঞেস করলো খুব অস্থির মনে হচ্ছে তোমাকে। এ সময় এতো কি ভাবছো?

'তোমার ধারণায় এটা এমন একটা জায়গা যেখানে কেবল আনন্দ ফূর্তিতেই সময় কেটে যায়। তাই না? তোমার এখানে আসার আসল উদ্দেশ্য কি সেটা বলো। কে তুমি? কারাগারের লোক বলে তো মনে হচ্ছে না।' তীক্ষ্ণ আর ঝাঁঝালোভাবে কথাগুলো বললো সে।

‘তোমার ধারণাই ঠিক, আমি জেলখানার কোনো লোক নই। যাকগে এসব কথা। কে আমি? কেনো এসেছি? এসব প্রশ্নের উত্তরে আমার কথা হচ্ছে- আসলে আমি তোমার সাথে কিছুক্ষণ আলাপ করতে চাই। তোমার মন মগজে আচ্ছন্ন দৃষ্টির বোঝা কিছুটা হালকা করতে চাই।’

খুবই আন্তরিকতার সাথে কথাগুলো বলে আলখেল্লার ভেতর থেকে হাত বের করে একটা বেচংগা পাখরের বাটি আগন্তুক ফরাশের ওপর রাখলো এবং হাত পা ছড়িয়ে নিজেই কয়েদীর পাশে বসে গেল। কয়েদী আর আগন্তুকের নীরবতার মধ্যে আরো কিছুটা সময় কেটে গেল। আগন্তুক নীরবতা ভেঙ্গে দৃঢ়ভাবে বলে উঠলো, ‘ঠিক আছে, কিন্তু বলো দেখি এই সরকারী মেহমানখানায় তুমি কেন? তাহলে ঐ ঘটনাটা আসলেই বুঝি সত্য, যা আজকের পরিষ্কার ছাপা হয়েছে?’

‘ধুন্তোরি ছাই, আগাগোড়া সবটাই বানোয়াট। ঐ মিথ্যার বাজের একটি কানাকড়িও খাঁটি নয়। ঘটনাটিকে লবণ মরিচ মাখিয়ে ছাপানো হয়েছে। শত্রুদের তৈরি করা কল্প-গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়।’

‘মনে হচ্ছে, তুমি যেনো নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করতে চাচ্ছে, তুমি যে অপরাধী তা অস্বীকার করার প্রয়াস পাচ্ছে এবং বলতে চাচ্ছে তোমাকে অন্যায়ভাবে জেলে ঢোকানো হয়েছে, তাই না?’

বন্দী এ কথায় মাথা দোলালো এবং বললো- ‘হ্যাঁ, আমি হচ্ছি এমন এক মজলুম যার ভালো কাজগুলোকে অন্যায় এবং অপকর্ম হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে আর জেলখানায় বন্দী করা হয়েছে।’

আগন্তুক বললো এটা কি কখনো হয়? ভালো কাজের সংজ্ঞাতো এটাই যে, ভালো কাজ সব সময়ই ভালো। আসলে আমি ঘটনাটি হুবহু শুনতে চাই।’

‘কি প্রয়োজন? আমার হৃদয়ের হাহাকার শুনে মজা লুটতে চাও বুঝি?’

‘না, একেবারেই না। কোনো রকমের ফায়দা লুটবার ইচ্ছা আমার একদম নেই। আসলে নিজের দুঃখের কাহিনী শোনাতে অন্তরের বোঝা কিছুটা হালকা হয়।’

‘আশ্চর্য কথা! সত্যি, সত্যি, তোমার পরিচয়টা কি বলোতো?’

‘আমি যে কেউ একজন হই না কেনো তুমি তোমার কাহিনী শোনাও না! হতে পারে এর দ্বারা কোন উপকার হবে। আমি খুব আগ্রহ প্রকাশ করছি ঐ মেয়েটির কথা দিয়েই কাহিনী শুরু করবে বলে। যাকে হত্যার দায়ে তোমার পায়ে বেড়ী লাগানো হয়েছে।’

বন্দী স্বপ্নাচ্ছন্নভাবে শুরু করলো, এক বিধবার এক মেয়ে। মেয়েটি অসাধারণ সুন্দরী- এটাই তার বড় অপরাধ। এই অপরাধের কারণে মেয়েটি ঐ এলাকার

সবচেয়ে ধনী ও প্রভাবশালী এক জালেমের দুষমনে পরিণত হয়ে গেলো। লোকটি মেয়েটিকে রক্ষিতা বানিয়ে তার জঘন্য প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যে উঠে পড়ে লাগলো। কিন্তু দৃঢ় চরিত্রের অধিকারিণী সুন্দরী মেয়েটি নিজের সতীত্বের গৌরব বিসর্জন দিতে অস্বীকার করে বসলো। মানবতার দুষমন ঐ পশুটি সব রকমের শয়তানী করেও যখন কামিয়াব হতে পারলো না তখন মেয়েটিকে শুধু নয় মেয়েটির মাকেও হত্যা করে ফেললো। হৃদয়বিদারক এ ঘটনা বলতে বলতে বন্দীর গলা ধরে এলো।

‘কিন্তু এ ঘটনায় তো তোমার উল্লেখ নেই।’ আগন্তুক বললো।

‘আছে, আছে, না থাকলে যে ব্যাপারটা অপূর্ণ থেকে যাবে। সে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বললো, ‘কিন্তু আমি চাচ্ছি, তোমার পরিচয়টা আগে দাও। আসলে তুমি কে? আমার তো মনে হচ্ছে এ পৃথিবীর মানুষ নও তুমি। অন্য কোনো গ্রহের হবে হয়তো। না হলে, খুপরির লোহার তৈরি দরজার তালা, যা খুবই মজবুত, চাবি ছাড়া খুললে কি করে?’

আগন্তুক এ ধরনের কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলো এবং বন্দীর কাঁধে হাত রেখে কাছাকাছি এসে গোপনীয়তা রক্ষাকারীর মতো বললো, তুমি ঠিক ধরেছো। আসলে আমি সাধারণ কোনো লোক নই। কিন্তু আমাকে ভয় করারও কিছু নেই। অন্তত: তোমার বন্ধু না হলেও শত্রুত নই-ই।’

আগন্তুকের হাত বন্দীর কাছে বরফের চাইয়ের মতো মনে হলো। ভয় তার শরীরে শীতের কাঁপনের মতো ছড়িয়ে গেলো। সে তার জায়গা থেকে এক পা দুই পা পিছিয়ে যেতে যেতে বললো ‘কিন্তু তুমি, তুমি কে?’

‘আমার সম্পর্কে তুমি সন্দেহমুক্ত নাও হতে পারে। বলতে পারো। আমি এ গ্রহের লোক, সে গ্রহের লোক। কিন্তু সত্যিই আমি তোমার দুষমন নই।’ বন্দীর আস্থা অর্জনের জন্য আগন্তুক টেনে টেনে কথাগুলো বললো।

বন্দী হঠাৎ খুপরির কোণার দিকে চলে গেলো। ভয়ে সে কাঁপতে কাঁপতে বললো- ‘কিন্তু, কিন্তু আমি শুধু তখনই আলাপ করবো যখন তুমি তোমার পরিচয় এবং আমার কাছে আসার প্রয়োজনটা খোলাখুলিভাবে বলবে।’

– আগন্তুক আত্মমর্যাদার সাথে বললো ‘হ্যাঁ, অবশ্য অবশ্যই বলবো।’ দেখো, আবার আমার আসল পরিচয়টা পেয়ে ঘাবড়ে যেও না যেনো। সত্যিই আত্মবিশ্বাসী হতে চেষ্টা করো এ ব্যাপারে যে- হ্যাঁ, এই আমি তোমার অকল্যাণকামী নই।’

বন্দী নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বললো ‘না না ভীত হতে যাবো কেনো? ভীত হতে যাবো কেনো?’

‘আল্লাহ আমাকে এই দুনিয়ায় ঐ সমস্ত লোকের চোখের অশ্রু জোগাড় করার জন্য পাঠিয়েছেন, যারা নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, অসহায়। একথা বলেই হাত লম্বা করে পাথরের ঐ বেঢ়ংগা পাত্রটি আগন্তুক উঠিয়ে নিলো। যেটি সে আলখেল্লা থেকে বের করে ফরাশের ওপর রেখে দিয়েছিলো। তারপর পাত্রটি বন্দীর দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বললো- ‘দেখো, কি পরিমাণ তপ্ত অশ্রু জমা হয়ে আছে এতে?’

বন্দী বিস্ফারিত চোখে পাথরের পাত্রটির দিকে তাকাতে লাগলো। পাত্রটি কানায় কানায় ভরা প্রায়। আর মাত্র কয়েকটি ফোটার প্রয়োজন- বোঝা যাচ্ছিলো। সে হতভম্বের মত বলে উঠলো ‘তুমি চোখের পানি জোগাড় করছো? মজলুম মানুষের চোখের পানি। কিন্তু তুমি এ চোখের পানি নিয়ে কি করবে?’

‘যখন এই পেয়ালাটা সম্পূর্ণ ভরে যাবে, ঠিক তখনই পান করবো পুরো পেয়ালা।’ আগন্তুক অত্যন্ত তৃপ্তির সাথে কথাগুলো বললো, যেন কোন গুভ সংবাদ শুনাচ্ছে সে।

‘পান করবে? অর্থাৎ কিনা... অর্থাৎ কিনা এই সবটুকু চোখের পানি তুমি পান করবে? কিন্তু কেনো, কেন?’

খুপরি কোণার দিকে বন্দী আরো গুটিসুটি মেরে যেতে লাগলো। ভয়ে ধরধর কাঁপতে লাগলো সে। চোখের পানিতে পাত্র পূর্ণ করে পান করার বিষয়টা তার কাছে জীবন্ত মানুষের তাজা রক্ত পান করার মত মনে হলো।

‘এই জন্যে যে, আল্লাহ তা’আলা আমাকে এ ধরনের নির্দেশই দিয়েছেন। আর যখন পূর্ণ পাত্র চোখের পানি আমি পান করবো তখন ঐ শক্তিই আমার সারা শরীরে ছড়িয়ে যাবে, যে শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো গোটা বস্তিটা। অর্থাৎ গোটা বস্তির সমস্ত কর্তৃত্ব, ক্ষমতা আমার হাতেই এসে যাবে।’

‘পূর্ণপাত্র অশ্রু পান করার পর সমস্ত শক্তিই তোমার শরীরে ভর করবে? বস্তির সবটুকু নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তোমার হাতের মুঠোয় এসে যাবে?’

কয়েদী নিজেকে সামলিয়ে নিতে নিতে প্রশ্ন করলো। সে “তোমার” কথাটির উপরই বেশী জোর দিলো। আগন্তুক খুব জোরে হেসে উঠলো। যেমন সে কোনো মজার গল্প শুনছে। তারপর আবার একটু রহস্যময় হাসির রেশ টেনে বললো- ‘তুমি আসলে সহজ সরল। আজ যার খাদ্য হচ্ছে মজলুম এবং অসহায়দের তপ্ত তাজা অশ্রু তার কাছ থেকে কেমন করে কল্যাণ আশা করছো? বোকামী আর কাকে বলে? শোনো, এই সব অশ্রু পান করে আমি বস্তি পরিচালনা করবো এমন নয় বরং নিশ্চিহ্ন করে ফেলবো। এর সৌন্দর্য এবং সমৃদ্ধি তছনছ করে তবে ছাড়বো।’

‘কেনো? কেনো? বন্দী সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলো।’

এ জন্য যে, পেয়ালাটা চোখের পানিতে ভরে যাবার অর্থ হচ্ছে এই বস্তির লোকেরা সত্য এবং ন্যায়ের পথ ত্যাগ করেছে, জুলুম এবং অত্যাচারকে নির্ধ্বংস কবুল করে নিয়েছে, এ ছাড়া তাদের জীবনে অন্য কোনো লক্ষ্যই যেনো নেই। অতএব বেঁচে থাকার অর্থই হচ্ছে বিশ্ব মানবতাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।।’

‘কিন্তু তোমার এই ধারণা কি করে হলো যে, এই বস্তি থেকে সত্য, ন্যায় ও সততা পুরোপুরি খতম হয়ে গেছে?’ বন্দী সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিবাদ করলো। সে উত্তেজিতভাবে আগন্তকের দিকে এগিয়ে একেবারে মুখামুখি দাঁড়ালো। বস্তিটির ধ্বংসের কথা শুনে এক অজানা আশঙ্কায় সে যেনো বিদ্যুৎপৃষ্ট ব্যক্তির মতো চমকে উঠলো।

‘এই জন্যে যে, আমি অলিগলি ঘুরে ঘুরে অসহায় মজলুমের এতোখানি চোখের পানি জোগাড় করেছি। তুমি কি জান, এই পেয়ালায় কার কার অশ্রু জমা আছে? এতে ঐসব মা’দেরও অশ্রু জমা আছে যারা নিজেদের সন্তানের দ্বারাই অত্যাচারিত হয়েছে। ঐসব মেহনতি মানুষেরও অশ্রু আছে যারা বিরাট বিরাট প্রাসাদ তৈরি করেছে, অনূর্বর জমিনকে ফুলের বাগানে পরিণত করেছে কিন্তু সন্তানদের মুখে আনন্দের এতোটুকু হাসি দেখতে পারেনি। ঐ সব প্ররোচিত ভক্ত অনুরক্তদেরও অশ্রু আছে যারা মাজহাবী নেতাদের খপ্পরে পড়ে জান্নাতের আশায় দোষখের কিনারায় পৌঁছে গেছে। ঐসব বিধবাদের এবং এতিমদেরও অশ্রু আছে যারা আশ্রয় পাওয়ার পরিবর্তে কেবল অত্যাচার ও অবিচারই পেয়ে এসেছে। ঐ সব দুর্বল অসহায়দেরও অশ্রু আছে যারা চোর, ডাকাত ও জালিয়াতদের হাতে শেষ হয়ে গেছে। ঐসব নিষ্পাপ নারীদের অশ্রু আছে যারা মিথ্যা প্রেমের কুহকে পড়ে দাস ক্রেতাদের হাতে বিক্রি হয়ে গেছে। এতে সুদখোরদের এবং অন্যায় বিচারকারীদের হাতে ধ্বংস হয়ে যাওয়া অসহায়দেরও অশ্রু আছে। আর এই অশ্রু এতোটা পরিমাণ জমা হয়ে গেছে যে, এতো বড় পেয়ালাটা ভরভর প্রায়! খুব সতর্কতার সাথে মজলুমদের চোখ থেকে বেয়ে পড়া শ্রোতধারা থেকে কেবল একটি একটি ফোটা অশ্রু জমা করেছি তাই এই অবস্থা। এখন তুমিই বলো, এই রকম ভাগ্যাহত লোকদের সংখ্যা তাহলে কতো। আর বস্তি ধ্বংস করার উপযুক্ত হয়েছে কি না?’ এই পর্যন্ত বলে আগন্তক কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বন্দীর দিকে তাকালো এবং কিছুটা অর্থপূর্ণভাবে বললো- ‘তোমার ঘটনাটিও কিন্তু ঐ রকম মনে হয়। আর আমাকেও পাঠানো হয়েছে এ বিষয়টা দেখবার জন্যেই। সম্ভবত: তোমার চোখ দিয়ে মজলুমের অশ্রুই ঝরে পড়ছে। নাও, এখন তোমার কাহিনীটা শোনাও তো দেখি বাছা আমার সম্পর্কে যতোটুকু জেনেছো অতোটুকু যথেষ্ট। বন্দী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আগন্তকের দিকে তাকাচ্ছিলো। কিছুক্ষণ এভাবেই

কেটে গেল। তারপর বন্দী নিজেকে সামলিয়ে স্বপ্লাচ্ছনের মতো বলে উঠলো 'হ্যাঁ, আমার কাহিনী। আমার কাহিনীও খুন ঝরা, যা এ পেয়ালার সমস্ত অশ্রুই লাল লাল করে ফেলবে। যে পর্যন্ত শুনেছো তার পরের ঘটনা এই রকম-যখন ঐ বিধবা এবং বিধবার সুন্দরী মেয়েটির দুরবস্থার কথা আমি জানতে পারলাম তখন সমাজের একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে তাদের দু'জনকে রক্ষা করতে এবং সহায়তা দান করতে প্রতিজ্ঞা করলাম। সংবাদপত্রের মাধ্যমে সরকারি কর্তৃপক্ষের নিকট তাদের ফরিয়াদ তুলে ধরলাম। কিন্তু শেষ অবধি আমার চেষ্টা সাধনা কোনো কাজেই এলো না। শক্তি এবং সম্পদের নেশায় মত্ত ঐসব জানোয়াররা অসহায় নারীদের সাহায্য করার পরিবর্তে আমাকে ডেকে পাঠালো এবং হুমকি দিতে লাগলো এই বলে যে, ঐ বিষয়ে যদি আর একটি কথাও বলা হয় তাহলে ফল ভালো হবে না। তবুও আর, আমার একটা ভরসা ছিলো, যখন আইন আদালত আছে তখন আমার চেষ্টার ব্যর্থ হবে না নিশ্চয়ই। এ কারণে আমি হাল ছাড়লাম না। চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলাম। কিন্তু কোন কাজই হলো না। বরং মেয়েটিকে হত্যা করা হলো, সেই সাথে তার মাকেও রেহাই দেয়া হলো না। তাদের ঘর-বাড়িও জ্বালিয়ে দেয়া হলো। আর কি কাণ্ড, এই সমস্ত কাজের জন্য আমাকেই দায়ী করা হলো। আমি প্রতিবাদ করলাম। ন্যায়বিচারের দোহাই দিলাম। পুলিশ এবং আদালতের অত্যাচার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কেউই আমার কথায় কর্ণপাত করলো না। অন্ধ বধির আইন শেষ পর্যন্ত আমাকেই অভিযুক্ত করে ছাড়লো এবং যাবজ্জীবন দণ্ডদেশের মাধ্যমে এই ডাকাত বদমায়েশ শাস্তি করার জায়গায় পাঠিয়ে দিলো।'

'তাহলে দেখছি ছবছ মিলে যাচ্ছে। আগন্তুক তৃপ্তির এক লম্বা শ্বাস ফেলে বললো- 'যাক, আমার সফর আর দীর্ঘ করা লাগবে না। তোমার এই বেদনার অশ্রু আমার এই পেয়ালার অশ্রুর উচ্চতাকে পূর্ণ করে দেবে। আর সে সময়ও খুব দূরে নয় যখন আমার এ পিপাসা সম্পূর্ণ মিটে যাবে।'

'অর্থাৎ খুব তাড়াতাড়িই তুমি এই বস্তি ধ্বংস করে দেয়ার মতো ক্ষমতা অর্জন করে বসবে?' বন্দী ভীত-সজ্জ হতে প্রশ্ন করলো। তার চোখ দুটি ছলছল করছিলো। বন্দী আগন্তুকের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো, 'তোমার বাসনা কখনো পূর্ণ হবে না। জেলখানার এই অকথ্য নির্যাতনের ভেতরে পড়ে যে শিক্ষাটা আমি লাভ করেছি তা হচ্ছে- ধৈর্য অশ্রু সংবরণের অপূর্ব ক্ষমতা। আমি তো এই শপথই নিয়ে ফেলেছি-জালেমদের অত্যাচারে কখনো আর চোখের পানি ফেলবো না। বরং সুযোগের অপেক্ষায় থাকবো; সুযোগ আসলে প্রতিশোধ নেবই। আর সেই প্রতিশোধের আগুনই আমি বুকের ভেতর লালন করে যাচ্ছি'।

‘তাহলে আগুন বুকের ভেতরই জমা করে যাচ্ছে? আছে। আগন্তুক পাশবিক উল্লাসে হি হি করে উঠলো এবং বললো- ‘আসলে কঠিন মুসিবতের মধ্যে পড়া অধিকাংশ লোকেরা এ ধরনের চিন্তার বোকামীরই শিকার হয়। শক্তি অর্জন করতে উদ্যোগী হয় না আদৌ। কেবল ভেতরে ভেতরে ফুসতে থাকে। তারা ভুলে যায়- এই দুনিয়ার যাবতীয় সমস্যা সমাধানের জন্যে, কঠিন মুসিবত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে পরাক্রমশালীর শক্তির প্রয়োজন আছে। প্রতিশোধের যতো আশাই পোষণ করো না কেনো শক্তি অর্জন করতে না পারলে সবই বৃথা। তাই যতো বড় স্বপ্নই দেখো না কেনো, মনে রেখো, পুতুল কখনও ইচ্ছাপ্রবৃত্তির মূর্তি হতে পারে না। সম্ভবত: তুমি জানো না, তোমার বৃদ্ধা মাও তোমার মত আশা করেছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই পেয়ালায় তার অশ্রুও জমা হয়েছে। সে এখন কি অবস্থায় জীবনযাপন করছে জানো? দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে। অধিকাংশ সময় লোকে তাকে ভিক্ষা না দিয়ে দেয় গালি, আর দেয় গলা ধাক্কা।

‘আমার মা! এই বলে বন্দী এমনভাবে চিৎকার করে উঠলো যেনো তাকে অন্ধকার কুয়ার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। সে তার উদগত অশ্রু চোখের পাতা দিয়ে চেপে রাখার আশ্রয় চেষ্টা করে যাচ্ছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা কপোল ছাপিয়ে একটি রূপালী ধারার মতো দুকূলপ্লাবী হয়ে গেলো।

নিয়ম মতো পাখির হৃদয়গ্রাহী সুর ছড়িয়ে যাচ্ছিল। সোবেহ সাদেকের দু’ধারী রশ্মি বন্দীর কারাকক্ষের ভিতরে এসে উঁকি মারছিল। বন্দী চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলো শতছিন্ন পুরনো কম্বলের উপর শুয়ে আছে সে। বন্দী ধড়মড় করে উঠে বসলো এবং ঐ আগন্তুককে খুঁজতে লাগলো- যে কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত তার সাথে আলাপ করছিলো। সে দ্রুত বুঝতে পারলো- এতোকক্ষণ যা কিছু দেখছিলো তা সবই ছিলো স্বপ্ন আর যা কিছু শুনছিলো তাও স্বপ্নের ভিতরেই।

গল্প দাদুর আসৰ

গল্প দাদুর আসর

মতিউর রহমান মল্লিক



প্রসঙ্গ কথা

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের সঞ্চালনায় এনটিভিতে শিশুদের নিয়ে ‘গল্প দাদুর আসর’ নামে একটি অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হতো। এই অনুষ্ঠানটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। শিশুদের নৈতিক মানস তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেই চলেছে। কবি আজ দুনিয়াতে নেই। প্রজন্মের তরুণ শিক্তকিশোর দাদুদের উদ্দেশ্যে তিনি গল্পে গল্পে যে উত্তম নসিহা করে গেছেন তা পাণ্ডুলিপি আকারে এখানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এখানে ৪টি পর্বের বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ছান পেয়েছে। পাণ্ডুলিপিটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন মোমিন উদ্দীন খালেদ।

গল্প দাদুর আসর

পর্ব-১

নিজেকে গড়ি

মল্লিক : আসসালামু আলাইকুম ।

শিশুরা : ওয়ালাইকুম আসসালাম ।

মল্লিক : তোমরা সবাই কেমন আছো?

শিশুরা : আলহামদুলিল্লাহি আলা কুল্লি হাল ।

শিশুরা : দাদু আপনি কেমন আছেন?

মল্লিক : আমিও খুব ভালো আছি । আলহামদুলিল্লাহি আলা কুল্লি হাল । তো এই যে দাদুটা ভালো আছো নিশ্চয়ই । তুমি কেমন আছো দাদু । কথা বলো । কথা বলবে না সে । সেও ভালো আছে । আচ্ছা , তো আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেই বিষয়কে কেন্দ্র করে একটা ছড়া প্রথমে পাঠ করা হবে । দেখি এই ছড়া শুনে তোমরা বলতে পার কিনা যে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়স্তুটা কি? মেজ দাদুতো হাফেজ , আগেই তোমাদেরকে বলা হয়েছে । সে কবিতাও লেখে ছড়াও লেখে । আজকে শুরুতেই তার নিজের লেখা একটা ছড়া শুনবো ।

আব্দুল্লাহ : দাদু আমার ছড়ার শিরোনাম হচ্ছে “প্রজাপতির পাওনা”

মল্লিক : “প্রজাপতির পাওনা”

আব্দুল্লাহ : একটু লম্বাতো আমি প্রথম দিকের কয়েকটা লাইন পড়ি ।

মল্লিক : হ্যাঁ , পড় ।

আব্দুল্লাহ : এই পৃথিবীর বন বনানী দূর আকাশের নীল ,
তোমায় ডেকে বলছে খুলে দাও হৃদয়ের খিল ।
সবাই তোমার চাইতে জ্ঞানী এই বিনয়ের বোধ
জাগিয়ে তোলো জ্ঞানটা বাড়াও করছে অনুরোধ ।
তোমার কাছে পশু-পাখি , মানুষ কিংবা গাছ
সবার আছে পাওনা অনেক মহান কারুকাজ ।

মতিউর রহমান মল্লিক রচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৫৯

মল্লিক : দেখেছো এই ছড়াটার মধ্য দিয়ে আমরা কি শিখলাম। মানুষের শিক্ষক শুধু মানুষ নয়। সমস্ত সৃষ্টি জগতের ভেতরেও শেখার অনেক কিছু আছে। তো, আমরা এই সৃষ্টি জগতের কার কাছ থেকে কি শিখতে পারি সে ব্যাপারে আমাদের দুই দাদুর কাছ থেকে একটা কবিতা শুনবো। আচ্ছা, সানি দাদু আর খ্রিস দাদু তোমরা কবিতাটা বলোতো।

শিশুরা : আমাদের কবিতার শিরোনাম হচ্ছে “সবার আমি ছাত্র” কবিতাটি লিখেছেন— সুনির্মল বসু

আকাশ আমায় শিক্ষা দিলো উদার হতে ভাইরে

কর্মী হবার মন্ত্র আমি বায়ুর কাছে পাইরে।

পাহাড় শিখায় তাহার সমান হই যেন ভাই মৌন মহান

খোলা মাঠের উপদেশে দিল খোলা হই তাইরে।

সূর্য আমায় মন্ত্রণা দেয় আপন তেজে জ্বলতে।

চাঁদ শেখালো হাসতে মোরে মনের কথা বলতে।

মল্লিক : দেখেছো সূর্যের কাছ থেকে কি শিখতে হবে আমাদের। নিজের তেজে জ্বলতে হবে। আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু কি মেজো দাদু।

আব্দুল্লাহ : দাদু যদুর মনে হচ্ছে নিজেকে গড়া এটাই হচ্ছে আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু।

মল্লিক : নিজেকে গড়া। পৃথিবীকে গড়তে হলে সবার আগে নিজেকে গড়। সবার আগে নিজেকে গড়তে হবে। আমি এখানে একটা কথা পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চাই। যারা এই পৃথিবীতে বড় হয়েছেন, যারা এই পৃথিবীতে মহান হয়েছেন তারা প্রত্যেকেই নিজেরা চেষ্টা করেছেন। তারা প্রত্যেকেই নিজেরা উদ্যোগ নিয়েছেন। যে যা হতে চেয়েছেন হবার জন্যে চেষ্টা করেছেন। আমি এখন একটা গল্প বলবো। লোকমান হেকিমের গল্প। তোমরা শুনলে অবাক হয়ে যাবে যে তিনি দাস ছিলেন। একটা বাড়িতে কেনা গোলাম ছিলেন। দাস মানে কি? কেনা গোলাম। দাস মানে কি?

শিশুরা : কেনা গোলাম।

মল্লিক : কেনা গোলাম। তিনি ছিলেন কেনা গোলাম। যাদেরকে কেনা হতো তাদেরকে কোন পয়সা কড়ি কিছুই দেয়া হতো না। তিনি যে বাড়ির

কেনা গোলাম ছিলেন সেই বাড়ীর মনিব, সেই বাড়ীর মালিক টের পেয়েছিলেন যে, তার চাকর খুব বুদ্ধিমান, তার চাকরটা খুব মেধাবী এবং তার চাকরটা খুব জ্ঞানের প্রতি আগ্রহী। সেই জন্যে মনিব তাকে স্নেহ করতো, ভালোবাসতো। দেখে, কত বড় জ্ঞানী ছিলেন লোকমান হেকিম যে তার জ্ঞান দেখে মনিব মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং তাকে মুগ্ধ করে দিয়েছিল। তাহলে গল্পটা শোনা যাক।

শিশুরা : জি, দাদু।

মল্লিক : লোকমান হেকিমের মনিবের ভালো কিছু গুণও ছিলো, খারাপ কিছু গুণও ছিলো। মনিব করলো কি জুয়া খেলতে গেল। জুয়া খেলতে গিয়ে যার সাথে জুয়া খেলতে বসেছে মনিবের বন্ধু সে আবার খুব চালাক। সে বলেছে কি দেখে শর্ত করতে হবে, অঙ্গীকার করতে হবে। তুমি যদি হেরে যাও হয় এই নদীটার সব পানি খেয়ে ফেলবে, আর না হয় যদি নদীর পানি খেতে না পারো; তাহলে তোমার যত টাকা-পয়সা আছে, জমি-জমা আছে, ধন-দৌলত আছে, ছেলে-মেয়ে যা আছে সব আমাদের দিয়ে দিতে হবে। মনিব পাকা খেলোয়াড় ছিলো, পাকা জুয়াড়ী ছিলো। সে ভেবে ছিল কিনা আমি তো হারবো না সে উল্টে তার কাছ থেকে অঙ্গীকার নামা নিল যে, আমি যদি হেরে যাই তাহলে তো আমি সব দিয়ে দেবো। তুমি হেরে গেলেও কিন্তু এই কাজটা করতে হবে। ঐ নদীর পানি সব খেতে হবে, না হলে তোমার টাকা-পয়সা, ধনদৌলত যা আছে ছেলে-মেয়ে পর্যন্ত সব আমাদের দিয়ে দিতে হবে। দেখেছো, কত বড় বোকার মত একটা শর্ত। ভাগ্যক্রমে কি হলো, ঐ যে লোকমান হেকিমের মনিব, লোকমান হেকিমের মালিক সে হেরে গেল।

শিশুরা : হেরে গেল?

মল্লিক : হ্যাঁ, হেরে গেল। হেরে যাওয়ার পরে তার বন্ধু বলল, তোমার এই নদীর সব পানি খেতে হবে। নয়তো যা কিছু আছে সব দিয়ে দিতে হবে। আমি দেবী করতে পারবো না। এখন সমস্যায় পড়ে গেল লোকমান হেকিমের মনিব। সে বলল কি, একটু চালাকি করলো, বলল যে আমাদের একটু সময় দাও, আমি তাড়াতাড়ি বাড়িতে গিয়ে আবার আসছি। আসলে মনিবের তখন লোকমান হেকিমের কথা মনে পড়েছে। গুর সাথে আলাপ করলে হয়তো এই বড় ধরনের একটা বিপদ থেকে বাঁচা যাবে। দৌড়িয়ে চলে গেল লোকমান হেকিমের কাছে। লোকমান হেকিমকে গিয়ে বলে, এই তাড়াতাড়ি

শোন, বারোটাতো বাজে। এই এই কর্ম করে এসেছি। তাড়াতাড়ি বুদ্ধি দাও। লোকমান হেকিম বুদ্ধি দিয়ে দিল। বলল যে আমি যে বুদ্ধি দিলাম, এই বুদ্ধি মত আপনার বন্ধুর সাথে কথা বলেন।

শিশুরা : দাদু কি বুদ্ধি দিল?

মল্লিক : হ্যাঁ, সেই কথাটাইতো বলার জন্য আমি চেষ্টা করছি। তো মনিব এসে তার বন্ধুকে বলল, ঐ যে, লোকমান হেকিম পরামর্শ দিয়েছিল। কি পরামর্শ দিয়েছিল? এখন জানতে পারবে। লোকমান হেকিম পরামর্শ দিয়েছিল যে, আপনার বন্ধুকে গিয়ে বলবেন, ঠিক আছে আমি এই নদীর সব পানি খেয়ে ফেলবো এটা আমি তোমার সাথে চুক্তি করেছিলাম। কিন্তু আমি যখন নদীর পানি খাওয়া শুরু করবো তখনতো অন্য নদীর পানি আসবে। আমিতো অন্য নদীর পানি খেতে রাজি না! সুতরাং আমি শুধু এই নদীটির পানিই খাবো। তুমি এক কাজ করো, তুমি একটা বাঁধ দিয়ে দাও। না হলেতো আমার অন্য নদীর পানি খেতে হবে। এখন সে কি করলো দেখলো যে তার যে সম্পত্তি পাবে সেই সম্পত্তি কয়েকগুন বিক্রি করলেও? নদী বাঁধা যাবে না। তখন সে মনে করলো দরকার নাই আমার এই টাকা-পয়সার। নদী বাঁধতে গিয়েই তো আমার টাকাও শেষ হয়ে যাবে। তখন সে বলে, আচ্ছা ঠিক আছে, আমার নদী বাঁধারও দরকার নেই আর তোমারও টাকা-পয়সা দেওয়ার দরকার নেই। জমি-জমা দেওয়ারও দরকার নেই। ধন-সম্পদ দেয়ার দরকার নেই। ছেলে-মেয়ে দেয়ারও দরকার নেই। বরং আরও ভালো মানুষ সেজে বললো যে, আমরা বন্ধু-বান্ধবতো! নিজেদের মাঝে গুণগোল করে কি লাভ?

চালাক যারা হয় বুঝাছো, ধূর্ত যারা হয়, অসৎ যারা হয়, তারা শেষ পর্যন্ত এই কর্মটাই করে। আচ্ছা জ্ঞান সম্পর্কে আমাদের কথা বলা দরকার। কারণ হলো তুমি যদি নিজেকে নিজে গড়তে চাও; তাহলে জ্ঞান ছাড়া তুমি নিজেকে নিজে গড়তে পারবে না। জ্ঞান ছাড়া নিজেকে নিজে গড়া যায় না।

আলী (রা.) কি বলেছেন জানো? আলী (রা.) বলেছেন যে, একটা মূর্খ লোকের স্বদেশ নেই। তাহলে কি একটা মূর্খ লোকের বাড়িঘর নেই। একটা মূর্খ লোকের গ্রাম নেই। একটা মূর্খ লোকের বসবাসের জায়গা নেই। আর একটা জ্ঞানী লোকের কোন বিদেশ নেই। এই কথাটার উপরেই একটা গল্প বলবো।

ইবনে বতুতার গল্প। ইবনে বতুতার নাম শুনেছো কে কে? তুমি শুনেছ ইবনে বতুতার নাম। তুমি শুনেছ ইবনে বতুতার নাম। তুমি শুনেছ ইবনে বতুতার নাম। আচ্ছা, তোমরা কেউ একজন বলোতো। ইবনে বতুতা কেন বিখ্যাত ছিলেন?

যয়নব : দাদু, আমি বলি। দাদু তিনি একজন পরিব্রাজক ছিলেন।

মল্লিক : পরিব্রাজক ছিলেন। ওরে মারে মা! বিরাট একটা শব্দ পরিব্রাজক। উচ্চারণ করতেই তো দাঁত ভেঙ্গে যাওয়ার কথা। পরিব্রাজক মানে কি?

শিশুরা : ভ্রমণকারী।

মল্লিক : ভ্রমণকারী। আচ্ছা তোমরাও তো দেখি পণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে। তাহলে পৃথিবীময় তিনি ভ্রমণ করে বেড়াতে। কিন্তু তার সবচেয়ে বড় পরিচয় হচ্ছে তিনি অসাধারণ একজন জ্ঞানীলোক ছিলেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানীদের তিনি একজন ছিলেন। তিনি দেশ ঘুরে ঘুরে দেখতেন। জ্ঞান অর্জন করার জন্য তিনি দেশ ঘুরতেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি মালদ্বীপে চলে গেলেন।

মালদ্বীপ কিন্তু খুব সুন্দর একটা দেশ। মালদ্বীপে আসার পরে মালদ্বীপের রাজা বললো, আপনি খুব জ্ঞানী লোক, আপনি খুব পণ্ডিত লোক, আপনি আমাদের দেশে এসেছেন। এটা আমাদের সৌভাগ্য। কিন্তু আমাদের দেশের মন্ত্রী হতে হবে আপনাকে। আমরা অনুরোধ করছি আমাদের দেশের মন্ত্রী হোন। এ যে বলেছিলাম না যে জ্ঞানীলোকের কোন বিদেশ নাই। কোথায় ইবনে বতুতার বাড়ির সে মালদ্বীপে এসে মালদ্বীপের মন্ত্রী হয়ে যাচ্ছে। মন্ত্রী ঠিকই সে হয়ে গেল। আরেকটা মজার খবর আছে।

শিশুরা : সেটা কি দাদু?

মল্লিক : মজার খবরটা হলো মালদ্বীপকে আসলেই তিনি ভালোবেসে ফেলেছিলেন এবং একসময় তিনি ভাবলেন যে, এখানে শৃঙ্গর বাড়ি বানিয়ে ফেলি। সেজন্য ইবনে বতুতা কি করলেন? ইবনে বতুতা মালদ্বীপে বিয়ে করে ফেললেন। তাহলে দেখো জ্ঞানী হলে কত সুবিধে। বিদেশ হয়ে যায় শৃঙ্গর বাড়ি। কখনও কখনও বিদেশ নিজের বাড়িও হয়ে যায়। আর যে লোকটা মূর্খ সে তার নিজের বাড়িতেও টিকে থাকতে পারে না। বাড়ির আশে-পাশের লোকেরা তার উপর অত্যাচার করে একদিন পিটিয়ে তাড়িয়ে দেয়। জ্ঞানীলোক হলে তাকে পেটাতে

পারতো না। সে জন্য আমাদের জ্ঞানী হওয়া দরকার, আর কি হওয়া দরকার?

শিষ্যরা : জ্ঞানী হওয়া দরকার।

মল্লিক : শুধু জ্ঞানী হওয়া দরকার না দাদু। আল্লাহর রাসূল (সা.) পৃথিবীর মানুষের ভালোর জন্যে, পৃথিবীর মানুষের কল্যাণের জন্যে, সব পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি চমৎকার একটা কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, যারা জ্ঞানী লোক তোমরা তাদের সাথে ওঠা-বসা করবে। যারা জ্ঞানীলোক তাদের সাথে কি করবে?

শিষ্যরা : ওঠা-বসা করবে।

মল্লিক : ওঠা বসা করবে। ওঠা-বসা মানে কি? উঠলাম আর বসলাম।

শিষ্যরা : না দাদু, তাদের সাথে চলতে বলেছেন।

মল্লিক : তাদের সাথে চলতে বলেছেন, আর কি? ওঠা-বসা মানে কি?

শিষ্যরা : তাদের গুণগুলো নিজেদের আয়ত্ত করতে বলেছেন।

মল্লিক : হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব সুন্দর বলেছো। তাদের গুণগুলো আয়ত্ত করতে বলেছেন। আসল কথা হলো জ্ঞানী লোকদের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। এই জন্যেই আল্লাহর রাসূল (সা.) কি বলেছেন? যারা জ্ঞানী তাদের সাথে ওঠা-বসা কর। তার মানে যারা জ্ঞানী তাদের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলো। আমি রাসূলের একটি চমৎকার উপমার কথা বলেছি।

শিষ্যরা : জ্বি, দাদু।

মল্লিক : বলেছিলাম যে, জ্ঞানের সঙ্গে আল্লাহর রাসূল (সা.) বৃষ্টির তুলনা করেছেন। বৃষ্টির তুলনা করেছেন। বৃষ্টি পড়লে কি হয়? বৃষ্টি পড়লে জমিন উর্বরা শক্তি অর্জন করে। সোজা কথায় বৃষ্টি না পড়লে ফসল হয় না। জ্ঞান হচ্ছে তেমনি। তুমি যদি জ্ঞান অর্জন কর, তাহলে তোমার ভিতরে সৃষ্টি হবে সব মানবতা বাদী গুণাবলী। মানুষ হিসেবে যে গুণগুলো অর্জন করা দরকার সেই গুণগুলো অর্জিত হবে, তুমি যদি জ্ঞান অর্জন করো। তুমি যদি জ্ঞান অর্জন কর, তাহলে মানুষের প্রতি তোমার শ্রদ্ধাবোধ হবে। তুমি যদি জ্ঞান অর্জন কর, তাহলে গাছ-গাছালি প্রতিটি সৃষ্টির প্রতি তোমার দায়িত্ববোধ জন্মিত হবে। আর যদি জ্ঞান অর্জন না করো, তাহলে সুন্দর মানুষ হতে পারবে না। বড় মানুষ হতে পারবে না। মহান মানুষ হতে পারবে না।

দেশের কাজে লাগবে না। পরিবারের কাজে লাগবে না। আত্মীয়-
স্বজনের কাজে লাগবে না। গোটা দুনিয়ার কোন কাজেই লাগবে
না; যদি জ্ঞান অর্জন না করো। তো দেখো এই জ্ঞান অর্জন করার
জন্যে শেখ সাদী কত কষ্ট করেছেন। এইবার আমি শেখ সাদীর গল্প
করবো। আরও একটা কথা বলবো, শেখ সাদীর গল্প করার সঙ্গে
সঙ্গে। সেটা হচ্ছে ঐ যে অনেকে বলে থাকে না? আমাকে আক্সা
আম্মা লেখা পড়া করাননি। এই কথাটা হলো ভুল কথা। তোমার কি
চেষ্টা ছিল? শেখ সাদী ছোট বেলায় তার আক্সাকে হারিয়েছিলেন।
কাকে হারিয়েছিলেন?

শিশুরা : তার আক্সাকে হারিয়েছিলেন।

মল্লিক : আক্সাকে হারিয়েছিলেন ছোটবেলায়। তার আম্মার অবস্থাও ভালো
ছিলো না। তার আম্মা তিনবেলা খাবারও জোগাতে পারতেন না
এত গরিব ছিলেন। কিন্তু আম্মারও ইচ্ছা ছিলো ছেলেটাকে মানুষ
করা। আর শেখ সাদীর অনেকগুলো গুণ ছিল। অত্যন্ত সুন্দর চেহারা
ছিলো। অত্যন্ত চমৎকার স্বভাব ছিলো। কারো সাথে বগড়া করতেন
না। কারো সাথে মারামারি করতেন না। কারোর বদনাম করে
বেড়াতেন না। আমরা করি না? অমুকে আমার পিছনে একটু হাত
দিয়েছে। অমুকে আমাকে অমুক কথাটা বলেছে।

সারাক্ষণ নালিশ করতে থাকো। শেখ সাদী অত্যন্ত ভদ্র ছিলেন
ছোটবেলা থেকেই। তার মা তাকে খুব পছন্দ করতেন। শুধু তাই না
শেখ সাদী তাদের এলাকার সবার কাছেই প্রিয় ছিলেন। প্রিয় ছিলেন
তার চেহারার জন্যে, প্রিয় ছিলেন তার পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনের
জন্যে। মুরব্বি ছোট-বড় সবার সাথেই তিনি খুব চমৎকার ব্যবহার
করতেন। অন্যদিকে মেধাবী মানুষ ছিলেন তিনি। খুব ভালো
রেজাল্ট করতেন তিনি। এত অভাবী ছিলেন যে, শেখ সাদী
পড়ছেন; পড়তে পড়তে দেখা গেলো যে, ল্যাম্পের তেল ফুরিয়ে
গেছে। তখনতো আর এরকম ইলেক্ট্রিসিটি ছিলো না। ল্যাম্পের
তেল ফুরিয়ে গেছে খোঁজ খবর নিয়ে দেখলেন যে, বাড়িতে এক
কাতরা পরিমাণ তেলও নাই।

একটু তেলও নাই। কিন্তু পড়ার ব্যাপারে শেখ সাদী এত মনোযোগী
ছিলেন যে তিনি দেখলেন পাশের বাড়ির রান্না ঘরের জানালা দিয়ে
আলো ঠিকরে পড়ছে। তিনি খুব আনন্দিত হলেন। যাক আজকে
আর পড়াটা তাহলে নষ্ট হলো না। কিন্তু লাজুকও ছিলেন, ভদ্রও

ছিলেন। কেউ যদি দেখে ফেলে এই জন্য অন্ধকারে গিয়ে রান্না ঘরের জানালা দিয়ে ঠিকরে পড়া আলোতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি পড়ছেন। মনোযোগ দিয়ে তিনি লেখাপড়া করতেন। তার মনেই নেই যে, তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছেন। সন্ধ্যার পরে পড়া শুরু করেছেন রাত গড়িয়ে গেছে। তারপরে তারা রান্না শুরু করেছে রান্না ঘরে রান্না হচ্ছে। তারপরে এ রান্না করতে গরম পানি ফেলে দিতে হয় না?

শিস্তরা : জ্বি, দাদু।

মল্লিক : যে রান্না করছে, সে করেছে কি? জানালা দিয়ে গরম পানি ছুঁড়ে মেরেছে। শেখ সাদীতো পড়ছে তার অন্য কোন দিকেই খেয়াল নেই। গরম পানি একেবারে শেখ সাদীর গায়ে গিয়ে পড়েছে। প্রচণ্ড গরম পানি চিৎকার করে সেখানে ছটফট শুরু করলেন। বাড়ির লোকজন সব দৌড়ে এলো। এসে দেখলো যে, তাদের সবচেয়ে আদরের ছেলেটি, তাদের সবচেয়ে আপন ছেলেটি, তাদের পাড়ার গৌরব যে ছেলেটি হবে একদিন। গ্রামের লোকেরা বুঝতে পেরে ছিলো, এলাকার লোকেরা বুঝতে পেরেছিলো যে শেখ সাদী একদিন বড় হবে। এত চমৎকার চেহারার একটি ছেলে গরম পানিতে পুড়ে গেছে। ফোঁকা পড়ে গেছে। তার পরে আর কি করা। শেখ সাদীকে একটু পরে শান্ত হলে জিজ্ঞেস করছে। কি ব্যাপার, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছো? তখন শেখ সাদী বলেন যে, আমার না পড়তে খুব ইচ্ছে করে। সেই জন্য আমি এখানে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছিলাম। এইখানে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছিলে কেন? বাড়িতে কেন ছিলে না? সেই দিন থেকে ঐ বাড়ির মালিক বলল, শেখ সাদী যতদিন পড়াশোনা করবে, তার যত তেল লাগবে সব তেল আমি দেবো। দেখেছো আসলে এখানে যেটা বোঝার জিনিস সেটা হচ্ছে শেখ সাদীকে কি তার আত্মা জোর করেছিলেন যে, যাও ওখানে আলো আছে পড়ে এসো। শেখ সাদীকে কখনও বলতে হতো না যে তুমি পড়তে বস। শেখ সাদীকে কখনও বলতে হতো না যে, তুমি এখন কেন দুষ্টামি করছো। এখন দুষ্টামি করো না। ছোটবেলা থেকেই তিনি খুব ভদ্র ছিলেন। জানো? শেখ সাদী আটটি ভাষা জানতেন। কয়টা ভাষা জানতেন?

শিস্তরা : ৮টি ভাষা জানতেন।

মল্লিক : ৮টি ভাষা জানতেন। এমনকি সংস্কৃত ভাষাও শিখেছিলেন। কেন? মজার একটা ঘটনা আছে। সেই ঘটনা আরেক দিন হবে। আমি

এখন যে কথাটা তোমাদের বলতে চাইছি। সেই কথাটি হলো যে, তুমি যদি জ্ঞানী হও, তাহলে সব দায়িত্ব তুমি পালন করতে পারবে। তোমার ওপরে আল্লাহরও দায়িত্ব আছে। অবাক লাগছে না। আল্লাহরও দায়িত্ব আছে।

তারপরে তোমার ওপর আক্বা-আম্মার দায়িত্ব আছে। ভাইবোনের দায়িত্ব আছে। পাড়া-প্রতিবেশীর দায়িত্ব আছে। গরিব দুঃখির দায়িত্ব আছে। আক্বা-আম্মার দায়িত্ব তোমার ওপর কি? আক্বা-আম্মার দায়িত্ব হচ্ছে যে, আক্বা-আম্মাকে তুমি কষ্ট দেবে না। এটা রাসূল (সা.) বলে দিয়েছিলেন। আর আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব কি? আল্লাহ তোমাকে যা যা করতে বলেছেন, তাই তুমি করবে। বিশেষ করে আল্লাহর সাথে কাউকে তুমি শরীক করবে না। যেমন আমরা বলে থাকি না আল্লাহই আমাদেরকে খেতে দেন?

এখন একজনে বললো কিভাবে আল্লাহ খেতে দেন। রান্না করে দিলেন তো আম্মা। বাজার করে দিলেন তো আক্বা। তো আল্লাহ খেতে দেন কি ভাবে? কত বড় বোকা, তুমি যদি তাকে জিজ্ঞেস করতে, আক্বা যে চালটা বাজার থেকে কিনে নিয়ে এসেছেন, এই চালটা কোথায় ছিলো? ধান খেতে, ধান কোথায় ছিলো? বীজ গোলায় ছিলো। বীজ গোলা কোথায় ছিলো? বাড়িতে ছিলো। এইভাবে একটার পর একটা যদি প্রশ্ন করো। তাহলে শেষ পর্যন্ত যেখানে গিয়ে তুমি দাঁড়াবে; সেটি হলো আল্লাহ বৃষ্টি দিয়েছেন বলেই ধান হয়েছে। আল্লাহ বন্যা দেননি বলেই ধান হয়েছে। আল্লাহ বৃষ্টি দিয়েছেন বলেই লাল শাক হয়েছে। আল্লাহ বৃষ্টি দিয়েছেন বলেই কদু হয়েছে। এই তুমি কি তরকারী খেতে পছন্দ কর?

সানি : দাদু আমি লাউ তরকারী খেতে পছন্দ করি।

মল্লিক : লাউ তরকারী খেতে পছন্দ করে আমার এই দাদুটা। আল্লাহর রাসূল (সা.) ও লাউ খেতে খুব পছন্দ করতেন। লাউ খেলে একটা উপকার হয়। লাউ খেলে বসন্ত রোগ কমে যায়। বসন্ত রোগের প্রতিষেধক হলো লাউ। বসন্ত রোগ হলে লাউ খেতে হয়। যাই হোক, আমরা এখন একটি জরুরি কথা বলবো, সেই জরুরি কথাটি হচ্ছে যে, যারা জ্ঞান অর্জন করেছে তারা পৃথিবীর যাবতীয় দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে। আর যারা লেখা-পড়া শেখে না তারা দায়িত্ব পালন করতে পারে না। এখন আমরা একটা গান শুনবো। আমাদের দাদু, আম্মার গান গাইবে; পৃথিবীকে গড়তে হলে সবার আগে নিজকে গড়। এই

অর্থবহ একটি গান আমাদের আন্নার দাদুর কাছে শুনবো। সবাই খুব খেয়াল করে শোন।

আন্নার : পৃথিবীকে গড়তে হলে সবার আগে নিজকে গড়। পাড়ায় পাড়ায় ফুলকুঁড়ি। এসো সবাই দেশ গড়ি। দেশ গড়াতো সহজ নয় মিলেমিশে কাজ কর। পৃথিবীকে গড়তে হলে সবার আগে নিজকে গড়।

মল্লিক : গানটা কেমন লাগলো?

শিশুরা : দাদু খুব সুন্দর।

মল্লিক : আমরা আজকে শুরুতেই বলেছিলাম যে, আমাদের একটি দাদু আছে, জয়নুল আবেদীন দাদু। তিনি আমাদের এই আসরের জন্যে চমৎকার একটি ছড়া পাঠিয়েছেন। সেই ছড়াটা আমাদের মেজ দাদু পড়বে এবং তার সাথে সাথে কিন্তু আমিও পড়বো।

শিশুরা : ছড়ার নাম “নিজকে গড়” লিখেছেন জয়নুল আবেদীন আজাদ।

আব্দুল্লাহ : পড় এবং পড় সবাই জানার জন্যে পড় জেনে শুনে নবীর পথে নিজেকে তবে গড়।

মল্লিক : জেনে শুনে নবীর পথে নিজেকে তবে গড়

আব্দুল্লাহ : গড়তে হলে মানতে হবে জানার বিষয়গুলো

মল্লিক : গড়তে হলে মানতে হবে জানার বিষয়গুলো।

আব্দুল্লাহ : কথায় কাজে মিল যদি হয় গড়ার কাজটা হলো।

মল্লিক : কথায় কাজে মিল যদি হয় গড়ার কাজটা হলো।

আব্দুল্লাহ : খোদার বিধান সবার তরে সব মানুষের জন্য।

মল্লিক : খোদার বিধান সবার তরে সব মানুষের জন্য।

আব্দুল্লাহ : ভালো সবার করতে হবে তবেই হবে ধন্য।

মল্লিক : ভালো সবার করতে হবে তবেই হবে ধন্য।

আচ্ছা, খুব চমৎকার ছড়া আমরা শুনলাম।

আজকে আমরা গল্পের আসর শেষ করি, আব্দুল্লাহ হাফেজ।

গল্প দাদুর আসর

পর্ব-২

ঈদুল ফিতর

মল্লিক : আসসালামু আলাইকুম ।

শিশুরা : ওয়ালাইকুম আসসালাম ।

মল্লিক : ওয়া রাহমাতুল্লাহি ।

শিশুরা : ওয়া রাহমাতুল্লাহি ।

মল্লিক : ওয়া বারাকাতুহ্ ।

শিশুরা : ওয়া বারাকাতুহ্ ।

মল্লিক : দাদু ভাইয়েরা আজকে সবাই কেমন আছো?

শিশুরা : আলহামদুলিল্লাহি আলা কুল্লি হাল । দাদু আপনি কেমন আছেন?

মল্লিক : আমিও খুব ভালো আছি । তো দাদু ভাইয়েরা আজকে আমাদের এই আসরটা খুব মজার আসর । কেন বলতো? আজকের আসরে আমরা ঈদুল ফিতর নিয়ে কথা বলবো ।

শিশুরা : দাদু, যদি চাঁদ ওঠে তাহলে কিন্তু কাল ঈদ ।

মল্লিক : হ্যাঁ । আজকে যদি চাঁদ ওঠে তাহলে কাল ঈদ । কি মজার তাই না;

শিশুরা : জ্বি, দাদু ।

মল্লিক : এখনি কেউ কেউ হয়তো ফিরনির স্বপ্ন দেখছে, কেউ আবার বিরিয়ানির স্বপ্ন দেখছে । যার যেটা ভালো লাগে, সে সেইটা স্বপ্ন দেখছে । আসলে আমাদের জীবনে এটা একটা পরম আনন্দের

সময়। আমরা খুব তাড়াতাড়ি সেই আনন্দের সময়ের সঙ্গে পরিচিত হবো। তো আজকে আমরা শুরুতেই আমাদের লাভগ্যের কাছ থেকে একটা ঈদের গান শুনবো।

লাবণ্য : দাদু, শুরু করবো?

মল্লিক : হ্যাঁ, হ্যাঁ অবশ্যই।

লাবণ্য : গান:-

সুখের মিনার হৃদয় জুড়ে
ঈদের খুশি আসলো রে ॥
আকাশ কোনে রূপালি চাঁদ
মুচকি হাসি হাসলো রে।
ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক
সবার সুখে ভাসলো রে ॥ এ

মল্লিক : দেখেছো, ঈদের খুশিতে আমাদের লাবণ্য একেবারে ডগোমগো।
আচ্ছা, তো আমরা একটু জেনে নেই প্রথমেই, ঈদুল ফিতরের অর্থ কি?

শিওরা : জ্বি, দাদু।

মল্লিক : তাই না? ঈদুল ফিতরের অর্থ কি আমরা একটু জেনে নিতে পারি না?

শিওরা : জ্বি, দাদু।

মল্লিক : আচ্ছা, এই যে, এখানে মোটা দাদু বসে আছে। স্বাস্থ্যবান দাদু,
আচ্ছা তুমি বলতো ঈদ মানে কি?

খ্রিঃ : খুশি।

মল্লিক : খুশি! আচ্ছা, মেজো দাদু ঈদের কি আর কোন মানে আছে? ঠিকঠাক
মত বলবে।

আব্দুল্লাহ : আনন্দ।

মল্লিক : আনন্দ। কিন্তু আরেকটা চমৎকার অর্থ আছে। আরেকটা চমৎকার
অর্থ আছে ঈদের সেটা হলো ফিরে আসা। এই জন্যে এটা বারবার
ফিরে আসা খুশির দিন। আচ্ছা, ফিতর মানে কি? কে বলতে পারবে?

সানি : দাদু, আমি বলতে পারবো?

মল্লিক : তুমি ঠিক বলতে পারবে তো।

সানি : জ্বি, দাদু।

- মল্লিক : পরে আবার যেন তোমার ভুল না হয়, যদি ভুল না হয় তাহলে বল ।
ফিতর মানে কি বল ।
- সানি : রোজা ভঙ্গ করা ।
- মল্লিক : রোজা ভঙ্গ করা । রোজা ভাঙা । আসলে সে ঠিকই বলেছে । ফিতর মানে হলো রোজা ভাঙা । এই যে, অনেকদিন পর্যন্ত রোজা রাখলাম তাই না?
- শিস্তরা : জ্বি, দাদু ।
- মল্লিক : কালকে যদি ঈদ হয়ে যায় তাহলে এ বছর ঈদ কয়টা হবে?
- শিস্তরা : দুইটা (সম্বরে)
- মল্লিক : আমার প্রশ্নটাই তো ছিলো ভুল ।
- শিস্তরা : জ্বি, দাদু ।
- মল্লিক : আজকে যদি চাঁদ দেখা যায়, তাহলে এ বছরে রোজার সংখ্যা কয়টা হবে?
- শিস্তরা : দাদু, উনত্রিশটা ।
- মল্লিক : উনত্রিশটা । আগামীকাল যদি ঈদ হয় তাহলে এবার রোজা হবে উনত্রিশটা ।
- শিস্তরা : (সম্বরে) উনত্রিশটা ।
- মল্লিক : আসলে এই যে, আমাদের এই ঈদের অনেক তাৎপর্য আছে । অনেক বড় বড় লেখক বলেছেন, এই ঈদটা হলো কোরানের বার্ষিকী পালনের ঈদ । নতুন নতুন লাগছে না?
- শিস্তরা : জ্বি, দাদু ।
- মল্লিক : মোটেই নতুন না । কারণ আমরা জানি যে, এই রমজান মাসেই কুরআন নাখিল হয়েছে । রমজান মাসে কোরান নাখিল হয়নি?
- শিস্তরা : জ্বি, দাদু ।
- মল্লিক : তো আমরা তো অনেকেই জন্মবার্ষিকী পালন করি । আমাদের কলেজের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করি । এরকম কত দিবস আমরা পালন করি না?
- শিস্তরা : জ্বি, দাদু ।
- মল্লিক : পালন করি একটা স্মরণীয় ঘটনাকে কেন্দ্র করে । যেহেতু এই রমজান মাসে কোরান নাখিল হয়েছে, সেই জন্যে এই ঈদের উৎসবটা

রমজানের। উৎসব নয়; এটা কোরান নাযিলের বার্ষিকীও বটে। কিন্তু আমরা সবসময় যেটা মনে করেছি, সেটা হলো যেহেতু এটা রমজান মাসের শেষে ঈদ, সেই জন্যেই এটা রমজানের ঈদ। তো ঈদুল ফিতর কেন বলা হয়? এই রমজানের শেষে আমরা ফেতর দেই বা ফিতরা দেই। গ্রামের ভাষায় কি বলে? ফেতরা। অত সুন্দর করে বলতে পারে না। অনেকেই এই জন্য বলে কি ফেতরা। হ্যাঁ, ফেতর দেয়। আচ্ছা শোন, এইখানে একটা কথা আছে। যেমন, এই যে আমাদের দাদু হাফেজ না? সেই বলতে পারবে। একটা সূরায় আছে না মিন ছিজ্জিল।

আব্দুল্লাহ : জি, দাদু।

মল্লিক : কোন সূরা সেটা?

আব্দুল্লাহ : সেটা সূরা ফিল।

মল্লিক : সূরা ফিল। সূরায়ে ফিলে। এই সূরার মধ্যে ১টা শব্দ আছে ছিজ্জিল। “ছিজ্জিল” আসলে ফারসি শব্দ। ফারসি শব্দ থেকে এই শব্দটা এসেছে আরবিতে। ফারসি শব্দে এই শব্দটা উচ্চারণ হয় সাংগেগীল।

শিশুরা : সাংগেগীল।

মল্লিক : ছিজ্জিল মানে কি বলতে পারো?

শিশুরা : জি দাদু। পাথরের টুকরা।

মল্লিক : ছিজ্জিল মানে পাথরের টুকরা।

শিশুরা : নুড়ি পাথর।

মল্লিক : নুড়ি পাথর। পাথরের টুকরা যে পাথরগুলো বহন করেছিলো, কোন পাখি?

শিশুরা : আবাবিল পাখি।

মল্লিক : আবাবিল পাখি মুখে এনে... তারপরে অহংকারী এক রাজা ছিলো... সেই অহংকারী রাজার নাম কি?

শিশুরা : আবরাহা।

মল্লিক : আবরাহা। সেই আবরাহার বাহিনীকে একেবারে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। এই আবাবিল পাখি এই পাথরের টুকরোগুলো নিয়ে এই আবরাহা বাহিনীর উপর যখন ফেলল। তখন সব ধ্বংস হয়ে গেল। তো এই যে ছিজ্জিল এই ছিজ্জিল কি? ফারসিতে সাংগেগীল। দেখো এই শব্দটা আরবিতে এসেছে। আরবিতে আসার পরে এটাকে তো ফারসি উচ্চারণ রাখা হয়নি। আব্দুল্লাহ রাবুল আলামিন ফারসি

উচ্চারণটাকে মিলিয়ে নিয়েছেন আরবিতে। আরবিতে যেভাবে সুবিধা উচ্চারণ করা যায় সেভাবে গ্রহণ করেছেন। সে জন্যে যেসব আরবি ফারসি শব্দ আমাদের বাংলা ভাষায় আসে সেই সব শব্দগুলোকে আমাদের বাংলা ভাষার মতো করেই সহজে উচ্চারণ যাতে করা যায়, সেই ভাবে উচ্চারণ করলেই হয়ে যায়। এটা মনে রাখবে সব সময়। আচ্ছা, তো আমরা এই ঈদুল ফিতরে ফেতরা দেই বলেই এই ঈদটাকে আমরা ঈদুল ফিতর বলি।

মল্লিক : দেখো, ইসলামের একটা মহান শিক্ষা হচ্ছে; তুমি আনন্দ করবে, সবাইকে নিয়ে করবে। তুমি উৎসব করবে, সবাইকে নিয়ে করবে। আল্লাহ রাক্বুল আলামীন এবং তার রাসূল (সা.) কি চমৎকার নিয়ম দিয়ে দিয়েছেন। আমরা যেন একা একাই ঈদ না করি। সবাইকে নিয়ে যেন ঈদ করতে পারি; সেই জন্যে আমরা এই রমজানের ঈদে ফেতরা দেই। প্রত্যেকের ফেতরা দিতে হয়। চাই তার উপরে যাকাত ফরজ হোক বা না হোক। অনেকের উপরে যাকাত ফরজ হয়। ঐ যে জাকাতের একটা নিয়ম আছে। শতকরা আড়াই টাকা দিতে হয়। তারপরে স্বর্ণ থেকে যাকাত দিতে হয়, ফসল থেকে যাকাত দিয়ে হয়। এখন অনেকে যদি তোমরা মনে করে বস, যাকাত দেওয়াই তো আমার ওপরে ফরজ হয়নি, এখন ফেতরা দেবো কেন? আসলে যাকাত ফরজ হওয়াটা শর্ত নয়। প্রত্যেকেরই ফেতরা দিতে হবে। তোমার ফেতরা দিতে হবে, তোমার ফেতরা দিতে হবে, এই দাদুটার ফেতরা দিতে হবে, সবার ফেতরা দিতে হবে। আমার মোটা দাদুটা ভেবেছে যে, মোটা বলে তার বেশী ফেতরা দিতে হবে, তা না কিন্তু; সবাই যে ফেতরাটা দেবে সেটাই সে দেবে। এখন মনে রাখতে হবে আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, কেউ যদি ঈদের নামাজের পরে ফেতরা দেয় তাহলে সেটা ফেতরা হবে না।

মল্লিক : সেটা দান হয়ে যাবে। সাধারণ একটা দান হবে। খুব ভালো করে মনে রাখবে, তোমাদের ফেতরা কারা দেবে? তোমাদের যারা আব্বা আন্না আছেন, যারা মুরক্বি আছেন, তোমাদের ফেতরা তারা দেবেন। দাস-দাসীর ফেতরা, চাকর-বাকরদের ফেতরাও মহাজনরা দিয়ে দেবেন। মালিকরা দিয়ে দেবেন। কিন্তু ফেতরা দিতে হবে। সবাইর ফেতরা দিতে হবে। তো আমি যে কথাটা বলেছিলাম এই ফেতরা যদি তুমি ঈদের নামাজের পরে দাও। এই ফেতরা দেওয়া একটা জরুরি কাজ, ওয়াজিব। ফেতরা দেওয়া ওয়াজিব। এখন তুমি এই ফেতরাটা দিলে

না। ঈদের পরে দিয়ে দিলে। নামাজের পরে দিয়ে দিলে। নামাজ হয়ে গেল আর ফেতরা ফেতরা থাকলো না, সাধারণ একটা দান হয়ে গেলো। এখন ফেতরা তুমি কখন থেকে দেবে? কোন কোন মাজহাবে যেমন আমাদের হানাফি মাজহাবে বলা হয়েছে যে, সকাল বেলায়। সকালবেলা থেকে ফেতরা দিতে হবে। কিন্তু অন্যান্য মাজহাবে বলা হয়েছে যখন রোজাটা শেষ হয়ে গেল তখন থেকে, তার মানে তুমি চাঁদ দেখলে ঈদ হবে আগামী দিন। তুমি জেনে ফেললে যে আগামী দিন ঈদ হবে। যখনি তুমি জেনে ফেললে, আগের দিন রোজাটা তোমার শেষ হয়ে গেল। রোজা শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার ফেতরা দিতে হবে। এই ফেতরা কেন দিতে হবে? এই ফেতরা না দিলে গরিবরা তো আনন্দ করতে পারবে না। এই জন্য বড় বড় আলেম যারা। যারা ইসলামকে গভীরভাবে ভালোবাসেন তারা করেন কি রমজান শেষ হয়ে যাওয়ার কয়েক দিন আগে থেকেই ফেতরা দেওয়া শুরু করেন। আগেভাগে দিলে গরিবরা এ ফেতরা নিয়ে তারপরে জামা কিনবে, খাদ্য কিনবে। কি সুন্দর নিয়ম। তোমাদের বাড়িতে সাতজন লোক। সাতজন লোকের ফেতরা একত্রিত করলে দেখা যাবে যে, একটা ফ্যামিলির আনন্দঘন ঈদ কেটে গেলো। এখন এই ঈদের একটা ইতিহাস শুরু করি?

শিউরা : জ্বি, দাদু।

মল্লিক : রাসূলে করীম (সা.) মদীনায় হিজরত করে এলেন। কোথায় হিজরত করে এলেন?

শিউরা : (সম্বরে) মদীনায়।

মল্লিক : মদীনায় হিজরত করে এলেন। মদীনায় হিজরত করে এসে দেখলেন যে, মদীনার লোকেরা দুটো আনন্দের দিন বছরে পালন করে। ২টা উৎসব ২ দিন তারা পালন করে। রাসূলে করীম (সা.) দেখলেন, তারপরে মুসলমানদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, তোমাদের জন্যে অত্যন্ত আনন্দঘন দুইটি ঈদ আছে। এই হলো সেই আনন্দঘন ঈদ। ঈদুল আযহার আমরা আলোচনা করেছিলাম না?

শিউরা : জ্বি, দাদু।

মল্লিক : সেই ঈদটা হলো ইবাহীম (আ:) এর স্মারক। ইবাহীম (আ:) যে ত্যাগ করেছিলেন, সেই ত্যাগ কুরবানীর বার্ষিকী পালন। সেখানে আমরা ঈদুল আযহা সম্পর্কে কথা বলেছিলাম। আজকে হলো ঈদুল ফিতর।

শিশুরা : আচ্ছা দাদু ঈদুল ফিতর তো খুবই আনন্দঘন দিন।

মল্লিক : ঈদুল ফিতর আর ঈদুল আযহার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। আল্লাহ্ আকবার, আল্লাহ্ আকবার, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আল্লাহ্ আকবার, আল্লাহ্ আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। এইগুলো আমরা ঈদের দিনে পড়ি না?

শিশুরা : জ্বি দাদু।

মল্লিক : ঈদের দিন আমরা পড়ি। এখন ঈদুল ফিতরে জোরে জোরে পড়তে হবে না। আন্তে আন্তে পড়তে হবে। আর ঈদুল আযহায় এটা জোরে জোরে পড়তে হবে।

শিশুরা : জোরে জোরে পড়তে হবে।

মল্লিক : ঈদের আরও সুন্দর কিছু নিয়ম আছে। রাসূলে করীম (সা.) ঈদের দিন এক পথ দিয়ে ঈদের মাঠে যেতেন, আরেক পথ দিয়ে আসতেন কেন? নতুন নতুন লোকের সঙ্গে দেখা হওয়ার জন্য। তারপরে, এই পাড়া দিয়ে গেলাম এই পাড়ার লোকদের সাথে দেখা হয়ে গেল, এক সঙ্গে ঈদের মাঠে গেলাম। আবার ফেরার সময় আরেক পাড়ার ভিতর দিয়ে গেলাম। তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মজা হলো না? যাওয়ার সময় যাদের সঙ্গে দেখা হলো আসার সময়ও তারা। তখন কি মজা লাগে নাকি? এই জন্যে দেখো রাসূল (সা.) কত সুন্দর নিয়ম দিয়েছেন। এখন আমরা শুনবো যে ঈদের দিনে আনন্দ করার জন্য আমাদের কি কি করার দরকার আছে। আমাদের মেজো দাদুকে আমি লিখে আনতে বলেছিলাম। সে চটপট যেটা লিখে এনেছে; সেটাই পড়ে শোনাবো।

শিশুরা : জ্বি, দাদু।

মল্লিক : আর যদি সে মুখস্থ বলতে পারে তো ভালো।

শিশুরা : দাদু, প্রথমে ঈদের জন্যে তার যেটুকু সামর্থ্য আছে এটুকু দিয়েই ঈদের সাজ পোশাকের ব্যবস্থা করতে হবে।

মল্লিক : হ্যাঁ, ঈদের দিনে ভালো কাপড় পড়তে হবে। খুব ভালো একটা পরামর্শ দিয়েছে আমাদের মেজ দাদু। আর যারা ইসলামের বিশেষজ্ঞ তারাও এটা পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে। তোমার ঘরে অনেকগুলো নতুন জামা আছে। এখন ঈদ উপলক্ষ্যে আবার তুমি জামা কিনলে। তোমাকে দেখতে হবে যে, বেহুদা খরচ হয়ে গেল কিনা। এদিকে তোমার সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের

দাদু, মেজ দাদু সে ঈদের দিনের করণীয় সম্পর্কে একটা পয়েন্ট বলেছে। তুমি দ্বিতীয় পয়েন্ট থেকে শুরু কর আবার।

সানি : দ্বিতীয়টা হচ্ছে খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতে হবে।

মল্লিক : হ্যাঁ, খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতে হবে। এটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যারা সকালে ঈদের দিন উঠতে পারবে না। তারা কিন্তু সুস্থভাবে ঈদের মাঠে যেতে পারবে না। এই ফাঁকে একটা কথা বলে নেই, আল্লাহর রাসূল (সো) বলেছেন,

“আছছুবাহাতু তাম্মাউন রেজকা” অর্থাৎ সকালে যারা ঘুমায় তাদের রিজিক কমে যায়। তুমি রাত জেগে জেগে পড়েছো, রাত জেগে জেগে জরুরি কাজ করেছে। তারপরে তুমি সকালে ঘুমাতে পারো। কিন্তু রাতেও তুমি ভূতের মত ঘুমিয়েছো, হাতির মত ঘুমিয়েছো, সেই নাক ডাকলে ইয়া বিরাট শব্দ। আবার সকাল বেলায়ও তুমি ঘুমাবে, এটা হবে না। সে জন্য আল্লাহর রাসূল বলে দিয়েছেন, “আছছুবাহাতু তাম্মাউ রেজকা”। সকালে যারা ঘুমায় তাদের রিজিক কমে যায়। তার মানে তারা বহু ধরনের বিষয় আশয় থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। তাদের শরীর খারাপ হয়। সকালে বিনা কারণে যারা ঘুমায় তাদের শরীর খারাপ হয়ে যায়।

তাদের হার্ট দুর্বল হয়ে যায়। তাদের খাওয়া-দাওয়ার অরুচি থাকে। নানান ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। সেই ব্যাখ্যা করার সময় নাই। ঈদের দিন কিন্তু খবরদার সকালে ঘুমাবে না। তৃতীয়?

সানি : তিন নান্নার হচ্ছে মিসওয়াক করা, দাঁত ব্রাশ করা।

মল্লিক : হ্যাঁ, আমরা দাদুরা সবাই দাঁত ব্রাশ করবো। আমি বলেছিলাম না যে, আল্লাহর রাসূল (সো) প্রত্যেক নামাজের আগে দাঁত মাজতেন আবার ঘর থেকে বাইরে গেলে একটু ঘুরে আসলে আবার দাঁত মাজতেন। এই জন্য আমার দাদুরা! দাঁততো সবাই মাজে কিন্তু ঈদের দিনে ভালো করে মাজতে হবে হ্যাঁ।

সানি : চতুর্থটা হচ্ছে ফজরের নামাজের পর ঈদের জন্য গোসল করা।

মল্লিক : আমার মনে হয় তোমার ১৪/১৫ টা পয়েন্ট আছে, তুমি বলেই ফেল ব্যাখ্যা আজ আর দেবো না। দাদুরা তোমরা খুব খেয়াল করে শোন।

সানি : প্রথম হচ্ছে সামর্থ্য অনুযায়ী সাজ পোশাকের ব্যবস্থা করা। তারপর হচ্ছে খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠা। দাঁত পরিষ্কার করা। ফজরের নামাজের পর ঈদের নামাজের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

মল্লিক : এটা মনে হয় চার নাম্বার ।

সানি : চার নাম্বার, তারপর সুগন্ধী ব্যবহার করা ।

মল্লিক : পাঁচ নাম্বার কি?

সানি : পাঁচ নাম্বারে পরিষ্কার জামা কাপড় পরিধান করা ।

মল্লিক : হ্যাঁ, ছয় নাম্বার?

সানি : ঈদের নামাজে যাওয়ার আগেই সাদাকাতুল ফিতর পরিশোধ করা ।

মল্লিক : হ্যাঁ, ঈদের নামাজের আগে ফেতরা পরিশোধ করা । হ্যাঁ, তারপরে?
এটা হলো সাত নাম্বার গেল ।

সানি : তারপরে ঈদগাহে যাওয়ার আগেই মিষ্টি কিছু খাওয়া ।

মল্লিক : মিষ্টি কিছু খাওয়া । এইখানে একটা মজার কথা আছে । রাসূলে কারীম (সা.) খেজুর খেতেন । কয়েকটা খেজুর খেয়ে ঈদের মাঠে যেতেন ।

লাবণ্য : ঈদুল আযহার দিন কিন্তু ঈদগাহ থেকে ফেরার পর খাওয়া ।

মল্লিক : হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছ । ঈদুল আযহার সাথে ঈদুল ফিতরের এই খানে একটু পার্থক্য আছে । আল্লাহর রাসূল (সা.) ঈদুল আযহার নামাজ পড়ে কুরবানী করে সেই কুরবানীর গোশত তিনি খেতেন । এটা তাঁর নিয়ম ছিলো । তারপর বল ।

সানি : ঈদের দিন ঈদগাহে যাওয়ার সময় তাকবীর দেওয়া । আল্লাহ্ আকবার, আল্লাহ্ আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আল্লাহ্ আকবার আল্লাহ্ আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ ।

সানি : তারপর আরো আছে দাদু ।

মল্লিক : হ্যাঁ, বলে ফেল না ।

শিশুরা : যেমন, খুব দ্রুত যাওয়া, পায়ে হেঁটে যাওয়া, যে পথ দিয়ে যাওয়া অন্য পথ দিয়ে ফিরে আসা ।

মল্লিক : মানে একপথ দিয়ে যাবে, আরেক পথ দিয়ে ফিরে আসবে । তারপর?

সানি : সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করা, কোলাকুলি করা, খোঁজ-খবর নেওয়া । ঈদের দিন সবার বাড়িতে যাওয়া ।

মল্লিক : হ্যাঁ, ঈদের দিন আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নেওয়া, আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে যাওয়া। যে আত্মীয়ের সাথে তোমার মনোমালিন্য হয়েছে তার বাড়িতে পারলে আগে যাবে কেমন? তাহলে আমরা ঈদের দিনের করণীয় সম্পর্কে কিছু কথা শুনলাম। আচ্ছা দাদুরা এ গল্পটা তোমাদের কি মনে আছে? যে, আল্লাহর রাসূল (সা.) ঈদের দিনে একটা বাচ্চাকে দেখলেন কাঁদছে। আল্লাহর রাসূল (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ঈদের দিনে তুমি কাঁদছ কেন? তখন সে বলছে আমাকে কে আদর করবে ঈদের দিনে। আমার আক্বা জেহাদে গিয়েছিলেন; সেখানে শহীদ হয়ে গেছেন। আমার আন্নাও মরে গেছেন। এখন আমাকে কে আদর করবে, কে আমাকে যত্ন করবে: এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটা গান আছে। এইটা তুমি কি জানো দাদু?

সানি : জ্বি, দাদু।

মল্লিক : আচ্ছা, তুমি গাও।

সানি : দলবেঁধে সব করছে খেলা

গাইছে হেসে হেসে

বাড়ির পথে হাঁটেন রাসূল

ঈদের নামাজ শেষে ॥

দেখেন সবাই আনন্দে উচ্চল

শুধু একটি ছেলে পথের ধারে চোখ দুটি ছলছল

থমকে দাঁড়ান দয়ার নবী, অস্তুরে পান ব্যথা

প্রশ্ন করেন কাঁদছো কেন পথের কিনার ঘেঁষে।

যুদ্ধে আমার আক্বু শহীদ আন্নাও নেই বেঁচে

কেমন করে আনবো হাসি দুঃখ নদী সৈঁচে

কেউতো আমায় আদর করে দেয়নি আতর মেখে

আমার সাথে কেউ খেলে না লাল জামা নেই দেখে।

থমকে দাঁড়ান দয়ার নবী, অস্তুরে পান ব্যথা।

কল্পনাতে নিজের জীবন ছবি ওঠে ভেসে।

ছোট্ট বুকে কষ্ট আহা কি যে

ভাবতে গিয়ে নবীর চোখও অশ্রুতে যায় ভিজ়ে

আজকে থেকে আক্বু আমি, আয়েশা তোমার মা।

রইলো না আর সেই ছেলেটির দুঃখ অবশেষে।

মল্লিক : দাদু ভাইয়েরা । গানটা কিন্তু শুধু গান না । এটা কিন্তু একটা অবিকল হাদীস । হাদীসটাকে সামনে রেখেই এই গানটা আমার দাদু গেয়েছে । এখন বুঝলে তো । আমরা রাসূলের অনুসারী কিন্তু ঈদের দিনে আমরা রাসূল (সা.) এর যথার্থ অনুসারী থাকি কিনা সেটা আমাদের ভাবতে হবে । সেই কারণে আমাদের ঈদের দিনে একটা অন্যতম বড় সূন্যাত হচ্ছে, অন্যতম বড় করণীয় হচ্ছে, রাসূল (সা.) এর এই আদর্শকে মনে রেখে ঈদ অনুষ্ঠান করা । আমরা যেন গরিব দুখিদের কথা ঈদের দিনে ভুলে না যাই । এখন একটা হাদীসের গল্প শুনাবো । কিসের গল্প শুনাবো?

শিশুরা : হাদীসের গল্প ।

মল্লিক : হাদীসের গল্প শুনাবো । ঈদের দিন একটা উঁচু জায়গায় ফেরেস্তারা দাঁড়িয়ে তারপর বলতে থাকলেন, আজকে শুনাহ মাহের দিন । আজকে শুনাহ মাহ করে দেওয়া হবে । আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করে দেবেন । যাও ! যে আল্লাহ রাক্বুল আলামীন পরম দয়ালু তার দিকে যাও । তার মানে ঈদের মাঠের দিকে যাও । ফেরেস্তাদের এই কথা শুধু মানুষ আর জিনেরা শুনতে পারে না । আর সবাই কার ঘোষণা শুনতে পারে?

শিশুরা : ফেরেস্তার ঘোষণা ।

মল্লিক : ফেরেস্তার ঘোষণা । তারপরে লোকেরা ঈদের মাঠে চলে গেল । তখন আল্লাহ রাক্বুল আলামীন এ ঈদের মাঠের ফেরেস্তাদেরকে ডেকে ডেকে বলতে থাকলেন । অর্থ্যাৎ যারা ঘোষণা দিয়েছিল সেই ফেরেস্তাদেরকে ডেকে ডেকে বলতে থাকলেন, পারিশ্রমিক দেওয়ার ব্যাপারে তোমাদের মতামত কি? ফেরেস্তাদের কাছে জিজ্ঞেস করেন, হে ফেরেস্তাগণ! শ্রমিকের পারিশ্রমিকের ব্যাপারে তোমাদের কোন কথা থাকলে বল । তখন ফেরেস্তারা বলে, হে রাক্বুল আলামীন পারিশ্রমিক শ্রমিককে যথাযথভাবে আপনি দিয়ে দিন । তারপর আল্লাহ রাক্বুল আলামীন বলবেন, আমি তোমাদের নামাজে খুশি হয়েছি, আমি তোমাদের রোজায় খুশি হয়েছি । হে আমার মুমিন বান্দারা, তোমাদের নামায এবং রোজা আমার সন্তুষ্টিতে পরিণত হয়েছে । আমার ক্ষমায় পরিণত হয়েছে । আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম । তোমরা নিষ্পাপ, ঘরে ফিরে যাও ।

মল্লিক : দেখেছো! আল্লাহ রাক্বুল আলামীন মানুষকে মাফ করে দেয়ার জন্য রোজা দিয়েছেন। আবার ঈদের দিনেও তিনি মানুষকে মাফ করে দিয়েছেন। এই জন্যে ঈদের দিন রাত্রে আল্লাহর দরবারে অনেক বড় বড় ঈমানদার ব্যক্তির গুনাহ মাক্ফের জন্য দোয়া করে। একটি কথা আমি ভুলে গেছি, আমরা ঈদে ফেতরা দেবো কেন? ফেতরা দেই কেন আমরা। আসলে আমাদের রোজায় ছোট-খাটো ত্রুটি থাকতে পারে না? কোন রোজা একটু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই ঈদুল ফিতরে ফেতরা দিলে রোজার দুর্দশাগুলো আল্লাহ রাক্বুল আলামীন মাফ করে দেন। পরিশুদ্ধ হয়ে যায় রোজাগুলো। দাদু ভাইয়েরা আমরা একটা কথা আজকে বলতে চাই সেটা হলো, এইতো ঈদ চলে এলো, আমরা ঈদের দিনে কোলাকুলি করবো নাকি?

শিশুরা : জ্বি, দাদু।

মল্লিক : ঈদের দিনে আমরা কোলাকুলি করবো। আমরা যে গল্পের আসর শুরু করেছিলাম। সে গল্পের আমাদের আজকে শেষ অনুষ্ঠান। সেই জন্যে আমরা আল্লাহর কাছে এই দোয়া করবো যে, হে রাক্বুল আলামীন তুমি আমাদেরকে রমজানের সওয়াব দান করো। তুমি আমাদের জনগণকে রমজানের সওয়াব দান কর এবং আমাদের সবার সওয়াবের মাধ্যমে আমাদের দেশকে শান্তি এবং সমৃদ্ধিতে ভরে দাও। আমরা আমাদের আজকের গল্পের শেষে আমাদের প্রিয়তম কবি, আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সেই বিখ্যাত গানটি গাইবো। ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ। এই সুরে নজরুল ইসলামের আরও একটি গান আছে। সেটা হলো-

শুকনো পাতার নূপুর পায়ে

নাচিছে ঘূর্ণিবায

জল তরঙ্গের বিলম্বিল বিলম্বিল

ঢেউ তুলে সে যায়।

নাকি? এটা না এটা না।

ওরে হুলোরে তুই রাত বিরাতে ঢুকিসনে হেঁসেল।

মল্লিক : দাদু ভাইয়েরা চলো এবার গানটি সমবেতকণ্ঠে গাই

ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে

এলো খুশির ঈদ।।

তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন

আসমানী তাগিদ ।। ঐ
তোর সোনা দানা বালা খানা
সব রাহে লিল্লাহ
দে যাকাত মুর্দা মুসলিমের আজ
ভাঙ্গাইতে নিদ ।। ঐ

তুই পড়বি ঈদের নামাজরে মন
সেই সে ঈদগাহে ।
যে ময়দানে সব গাজী মুসলিম
হয়েছে শহীদ ।। ঐ
আজ ভুলে গিয়ে দোস্ত দুশমন
হাত মিলাও হাতে ।
তোর প্রেম দিয়ে কর বিশ্বনিখিল
ইসলামে মুরীদ ।। ঐ

গল্প দাদুর আসর

পর্ব- ৩

ইসলামী শিক্ষার প্রসার

মল্লিক : আসসালামু আলাইকুম ।

শিশুরা : ওয়া আলাইকুম আসসালাম ।

মল্লিক : দাদু ভাইয়েরা তোমরা সবাই ভালো আছো তো?

শিশুরা : আলহামদুলিল্লাহি আলা কুল্লি হাল । দাদু আপনি কেমন আছেন?

মল্লিক : আমিও খুব ভালো আছি । আলহামদুলিল্লাহি আলা কুল্লি হাল । দেখেছো লাভণ্য আর দোনা এক সঙ্গে বলেছে, আমি কেমন আছি । মজার জিজ্ঞেস না এটা? মজার একটা প্রশ্ন । আচ্ছা, তো আমরা সেদিন আলোচনা করেছিলাম হাদীস সম্পর্কে, হাদীস কী, হাদীস কেন আমাদের মানতে হবে । আজকে আমরা হাদীসের ওপরে গল্প করবো । কী করবো?

শিশুরা : গল্প করবো ।

মল্লিক : গল্প করবো ।

শিশুরা : আচ্ছা দাদু, হাদীস কাদের জন্য?

মল্লিক : সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছ, দাদু তুমি কি যেদিন কোরআনের গল্প করা হয়েছিল সেদিন ছিলে?

শিশুরা : জ্বী, দাদু ।

মল্লিক : কুরআন কাদের জন্য?

শিশুরা : দাদু, আপনিই বলে দিন ।

মল্লিক : মনে নেই, মনে আছে, তোমরা বলতে চাচ্ছ না । তো যাদের জন্য কুরআন, তাদের জন্যই হাদীস । যে উদ্দেশ্যে কুরআন সেই উদ্দেশ্যেই হাদীস । কুরআন কেন? কুরআন এই জন্যেই যে, কুরআন না জানলে সত্যকে জানা যাবে না, সত্য পথে চলা যাবে না, সত্য পথে চলা যাবে না । কুরআনকে না জানলে মানুষের কল্যাণের জন্যে যা যা করার দরকার সেই কাজগুলো করার ব্যাপারে আমরা অনুপ্রেরণা পাবে না ।

শিশুরা : আচ্ছা দাদু, আমরা হাদীস পাঠ কিভাবে করবো?

মল্লিক : আমি ঐ দাদুর জবাবটা দিয়ে নিই। ঐ দাদু জিজ্ঞেস করেছিল হাদীস কাদের জন্য। মানুষ যেনো ভালো পথে চলতে পারে সৎপথে চলতে পারে, তার জন্যই কুরআন এবং হাদীস হলো পথ নির্দেশিকা, গাইড লাইন যাকে বলে তাই না? তো হাদীস এসেছে মানুষের জন্য, কুরআন এসেছে মানুষের জন্যে। মানুষ যেন আল্লাহর সর্বোত্তম খলিফায় পরিণত হতে পারে। তার মানে সবচেয়ে ভালো যাতে হতে পারো তার জন্যেই কুরআন, তার জন্যই হাদীস, বুঝতে পেরেছো?

শিশুরা : জ্বী, দাদু।

মল্লিক : এখন দাদু সানি, দাদু তুমি কি জিজ্ঞেস করেছিলে?

শিশুরা : আচ্ছা দাদু, আমরা হাদীস কিভাবে পাঠ করতে পারি?

মল্লিক : হাদীস কিভাবে পাঠ করতে পারি, একটা মজার প্রশ্ন। হাদীস পাঠ করার ব্যাপারে তোমরা যারা ছোট আছো, তোমরা যারা আরবি পড়তে পারো তারা আরবি পড়বে। তার মানে ঐ যে আমরা একদিন আলোচনা করেছিলাম বোখারী সম্পর্কে, মুসলিম সম্পর্কে, আগে সেগুলো সংগ্রহ করতে হবে। আগে হাদীস গ্রন্থ সংগ্রহ করতে হবে। এক নাম্বার কাজ তোমার হাদীস গ্রন্থ সংগ্রহ করা। এখন বাংলায় অনেক হাদীস গ্রন্থ তুমি পাবে। এই গ্রন্থ এক নাম্বারে যোগাড় কর। তারপরে তুমি যদি আরবি পড়তে পারো তো আরবি পড়ো। আর যদি আরবি পড়তে না পারো তো বাংলাটা ভালো করে পড়ো। বাংলাটা ভালো করে পড়লেই হবে। তবে, তবে একটা কথা আছে। কোরআনের পথে এবং হাদীসের পথে যে চলতে চায়, তার জন্যই কুরআন এবং হাদীস রপ্ত করা সহজ। কুরআন এবং হাদীস রপ্ত করা তার জন্যই সহজ যে কোরআনের পথে চলতে চায়, হাদীসের পথে চলতে চায়, আল্লাহর পথে চলতে চায়, রাসূলের পথে চলতে চায়।

এখন আমি রসূলের পথে চলতে চাই না, আমার হাদীস সংগ্রহ করার কোন চেষ্টা থাকবে না। দেখ আমি গতদিনের আলোচনায় বলেছিলাম যে, বোখারী (রহ.) ৬ লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন।

তারপরে সেখান থেকে বাছাই করে গ্রন্থবদ্ধ করেছিলেন মাত্র দুই হাজারের কিছু বেশি। আর তিনি তার গ্রন্থের মধ্যে বাদ পড়া হাদীসগুলো আনেননি। তারপর বলেছিলাম ৩ লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন মুসলিম (রহ.) ঐ যে মুসলিম শরীফ যেটাকে বলে,

সেখানেও তিন লক্ষ হাদীসের মধ্য থেকে মাত্র ৪ হাজার হাদীস তিনি রেখেছেন। আর হাদীস সংগ্রহের জন্যে যে কষ্ট তাঁরা করেছিলেন সেটা ভাবতে অবাক লাগে। বোখারী (রহ.) হাদীস সংগ্রহ করলেন কিভাবে তার গল্প শোনো। তিনি হাদীস সংগ্রহ করতে কোনো কোনো দেশে ৪ বারও গিয়েছেন। দূর-দূরান্তে সফর করেছেন। কোনো কোনো এলাকায় ২ বার ৩ বার। আর তখন তো হাঁটা ছাড়া উপায় ছিল না। হেঁটে হেঁটে দূর-দূরান্তে তিনি হাদীস সংগ্রহ করেছেন। তারপরে কি করেছেন? পাণ্ডুলিপি করেছেন। মজার গল্প। আমাদের মারজুক দাদুর তো পাণ্ডুলিপি আছে। আচ্ছা তুমি বলো তো পাণ্ডুলিপি কাকে বলে?

মারজুক : পাণ্ডুলিপি হচ্ছে যেখানে প্রথমে একটা কিছু তৈরি করা হয়।

মল্লিক : হ্যাঁ, পাণ্ডুলিপির সহজ ভাষা হলো যে, যেমন তুমি এখানে একটা কবিতা লিখেছো, ওখানে একটা কবিতা লিখেছো, সেখানে একটা কবিতা লিখেছো, সেখানে একটা কবিতা লিখেছো। তারপরে কবিতাগুলো একটা খাতার মধ্যে তুমি সুন্দর করে লিখে ফেললে, এটাকে পাণ্ডুলিপি বলে। ঐ যে ‘হাতেম তা’য়ী’ কাব্যগ্রন্থের নাম শুনেছো?

ফররুখ আহমদ ‘হাতেম তা’য়ী’ কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। এই ‘হাতেম তা’য়ী’ কাব্যগ্রন্থ রচনা করতে তিনি ৭ বার পাণ্ডুলিপি বানিয়েছেন। মহাকাব্য কিন্তু ‘হাতেম তা’য়ী’। প্রথমে সংগ্রহ করেছেন। সব কবিতাগুলো একটা খাতায় এনেছেন। আবার সেই খাতা থেকে আরেকটা খাতায় নিয়েছেন। সেই খাতা থেকে আরেকটা খাতায় নিয়েছেন এই ভাবে ৭ বার তিনি নতুন করে লিখেছেন। তো কোন খাতায় নতুন করে সুপরিকল্পিতভাবে সংগ্রহ করার নামই হলো পাণ্ডুলিপি।

এই ৬ লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করার পর তিনি পাণ্ডুলিপি তৈরি করলেন মক্কা শরীফে বসে। তারপরে এই পাণ্ডুলিপিটা চূড়ান্ত করলেন মদিনায় রসূলের মসজিদে বসে। ঐ যে তিনি বাছাই করলেন। আরো কথা আছে এখানে। তিনি শুধুই ঐগুলো বাছাই করলেন না প্রত্যেকটা হাদীস বাছাই করার আগে দুই রাকাত নামাজ পড়েছেন। প্রত্যেকটা হাদীস সংগ্রহ করার আগে দুই রাকাত নামাজ পড়েছেন এবং এজ্জেক্সার করেছেন। তোমরা এজ্জেক্সারটা হয় তো এখনই বুঝতে পারছো না। বাসায় গিয়ে আক্বা-আন্নার সাথে আলাপ করে নেবে। তারপর আমি একটু ইঙ্গিত দিয়ে দিচ্ছি সেটা হলো, একটা বিশেষ দোয়া আছে। সেই দোয়া পড়ে চিন্তা ভাবনা করতে হয়। কিংবা শুয়ে পড়তে হয়। তাহলে ঐ দোয়া

পড়ে শুয়ে পড়লে কিংবা চিন্তাভাবনা করতে থাকলে সঠিক সিদ্ধান্তটা আল্লাহ তোমাকে দিয়ে দিতে পারেন। এই জন্যে আল্লাহর রসূল (স.) বলেছেন যারা পরামর্শ করে কাজ করে এবং যারা এস্তেখারা করে কাজ করে তারা কোনো দিন ঠকে না।

আসলে এস্তেখারা মানেই হলো গবেষণা করা। এস্তেখারা মানেই হলো আল্লাহকে স্মরণ করা, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া। বুঝতে পেরেছো? তো প্রত্যেকটা হাদীস তিনি যখন সংগ্রহ করেছেন মূল পাণ্ডুলিপিতে নিয়েছেন, তখন ২ রাকাত নামাজ পড়েছেন এবং এস্তেখারা করেছেন। এস্তেখারার মাধ্যমে রসূলের সম্মতি নেওয়ার তিনি চেষ্টা করেছেন।

আরো একটা গল্প আছে। বোখারী (রহ.) এই যে বোখারী শরীফ লিখতে অগ্রসর হলেন, এটা নিয়ে কেন তিনি অগ্রসর হলেন? তার ওস্তাদের নাম হলো ইবনে ইসহাক। এই ইবনে ইসহাক সম্পর্কে আমি একটি কিতাবে পড়েছি যে, ইবনে ইসহাক এত বড় হাদীসের ওস্তাদ ছিলেন যে, চোখ বুঝলেই তাঁর চোখের সামনে ৫ হাজার হাদীসের পৃষ্ঠা উড়ে উড়ে বেড়াতো। তার মানে কি পরিমাণ মুখস্থ করেছিলেন এই ৫ হাজার হাদীস। তুমিও দেখবে একটা কবিতা মুখস্থ করেছো, ভালোভাবে মুখস্থ হয়েছে কবিতাটা। এই কবিতাটা আবৃত্তি করার সময় দেখবে যে, কবিতার পৃষ্ঠা তোমার সামনে এসে হাজির হয়ে গেছে আর মনে মনে তুমি পৃষ্ঠা দেখে দেখে পড়ছো। এ রকম যাদের মেধা খুব তীক্ষ্ণ তারা এই রকম ভাবে বিভিন্ন জিনিস মুখস্থ করেন। এই ইবনে ইসহাক একদিন হাদীস পড়াচ্ছেন, হাদীস পড়ানোর সময় ইবনে ইসহাক আফসোস করে বললেন হায় হায় এমন যদি কেউ হতো, তোমাদের কেউ যদি হাদীস শরীফের এমন একটি গ্রন্থ রচনা করতে, যাতে সহীহ হাদীসগুলো স্থান পেত, তাহলে খুবই উত্তম হতো। তাঁর ওস্তাদের এই কথা শোনার পর থেকে বোখারী (রহ.), ঈসমাইল বোখারী। বোখারীর মূল নাম কি দাদু?

শিশুরা : একটু লম্বা দাদু

মল্লিক : হ্যাঁ, বলো না

শিশুরা : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বোখারী।

মল্লিক : আলাদা আলাদা করে বল তোমাদের সাথে আমি বলবো।

শিশুরা : আবু আবদুল্লাহ

মল্লিক : আবু আবদুল্লাহ

শিশুরা : মুহাম্মদ

মল্লিক : মুহাম্মদ

শিশুরা : ইবনে

মল্লিক : ইবনে

শিশুরা : ইসমাইল

মল্লিক : ইসমাইল

শিশুরা : আল বোখারী

মল্লিক : আল বোখারী । দেখেছো কত সুন্দর নাম এবং কত চমৎকার নাম । তো আমি কি গল্প করছিলাম? সানী দাদু বলতে পারো?

সানি : হাদীসের গল্প ।

মল্লিক : হাদীসের গল্প তো বলছিলাম । মেজ দাদু বলো ।

শিশুরা : বোখারীর যিনি শিক্ষক ছিলেন ।

মল্লিক : শিক্ষক ছিলেন, তিনি কি বললেন? বলেন যে এমন কেউ যদি, এমন কাউকে যদি পাওয়া যেতো যে জাল হাদীসগুলো বা বানানো হাদীসগুলো বাদ দিয়ে, কারণ রসূলের নামে ইহুদী খ্রিস্টানরা কিছু হাদীস বানিয়েছে । কারা বানিয়েছে?

শিশুরা : ইহুদী খ্রিস্টানরা?

মল্লিক : ইহুদী খ্রিস্টানরা । এই জন্যে বোখারী (রহ.) এর ওস্তাদ বললেন যে এই জাল হাদীসগুলো থেকে যদি আসল হাদীসগুলোকে বাছাই করে কেউ সংগ্রহ করতে পারতো তাহলে কতোই না ভালো হতো । বোখারী (রহ.) শুরু করলেন । বোখারী (রহ.) এই যে শুরু করলেন ১৬ বছর পর্যন্ত । কতো বছর?

শিশুরা : ১৬ বছর ।

মল্লিক : ১৬ বছর পর্যন্ত শুধু এই হাদীসের পিছনে কাজ করেছেন । সেই জন্যে আজকে আমরা এই বোখারী শরীফকে এক জায়গায় পাচ্ছি । কত কষ্ট করে তাঁরা এই হাদীস সংগ্রহ করেছেন ।

মল্লিক : আর আমাদের ঘরে পড়ে থাকে হাদীসের বই আমরা পড়ি না । আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের কষ্টের কথা মনে করে একবারো নিজেরা

একটু সচেতন হই না। কি দুঃখ আমাদের জন্য। ঈমাম বোখারী (রহ.) ছিলেন খুব মর্যাদাসম্পন্ন। মনে রাখবে, যারা হাদীসের আমল করে। যারা কোরআনের আমল করে, যারা যথার্থভাবে কুরআন আমল করে, যথার্থভাবে হাদীসের আমল করে তারা অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ।

বোখারী (রহ.) হাদীস নিয়ে পড়েছিলেন সারা জীবন। কতোটা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন তিনি। সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করতো, ভালোবাসতো, সবাই তাঁকে মর্যাদা দিতো। এমনকি রাজা পর্যন্ত সেই সময়ের রাজা পর্যন্ত তাকে সম্মান দিতো এবং তাঁর জ্ঞানের স্বীকৃতি দিতো। রাজার ইচ্ছে হলো যে, এতো বড় পণ্ডিতের কাছে তিনি তার ছেলেদেরকে পড়াবেন।

তো রাজা বোখারী (রহ.) কে অনুরোধ করে বললেন যে, আমার ছেলেদেরকে আপনার একটু পড়াতে হবে। তবে শর্ত আছে, আমার ছেলেরা আপনার কাছে পড়তে যাবে কিন্তু তাদেরকে আলাদাভাবে পড়াতে হবে। বোখারী (রহ.) কতো আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ছিলেন। তিনি বললেন যে, “দেখেন, জ্ঞান হলো সবার জন্যে। জ্ঞান হলো সমস্ত মানুষের জন্যে। অন্যরা আমার কাছ থেকে যেভাবে জ্ঞান অর্জন করে আপনার ছেলেরা যদি সেইভাবে জ্ঞান অর্জন করতে পারে তাহলে আমার কাছে যেনো আসে। রাজা তো, রাজাদের আবার দেমাগ থাকে। কারণ রাজারা আল্লাহকে ভয় একটু কমই করে। কোন কোন রাজা আল্লাহকে ভয় করে, তাদের ব্যাপারটা আলাদা। কিন্তু অধিকাংশ রাজাই আল্লাহকে ভয় করে না। তো সেই রাজার সেন্টিমেন্টে লাগলো, মর্যাদায় লাগলো। ভালো বাংলায় বললে কি বলতে হয়। আঁতে লাগলো। তারপরে সে ইসমাইল বোখারী (রহ.) কে অ্যারেস্ট করার জন্যে এবং তাঁর উপরে নির্যাতন চালানোর জন্যে ফন্দি আঁটতে লাগলো।

এই ফন্দির খবর বোখারী (রহ.) পেলেন। রাজার অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে তিনি চলে গেলেন অন্য রাজ্যে। অন্য রাজ্যে গিয়েও তিনি শুনতে পেলেন যে, সেই রাজ্যও তাঁকে জায়গা দেবে না। কারণ রাজায় রাজায় খাতির। তারপরে তিনি আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করলেন, ‘হে রাক্বুল আলামীন! তোমার এই পৃথিবীতে আমার আর বেঁচে থাকার জায়গা রইলো না। তুমি আমাকে তোমার কাছে নিয়ে নাও।’ বোখারী (রহ.) এর কিছু সময় পরেই ইস্তিকাল করলেন।

তিনি আল্লাহকে ছাড়া কাউকে ভয় করতেন না। আল্লাহকেই তিনি ভালোবাসতেন। আল্লাহর ভালোবাসার জন্যেই হাজার হাজার মানুষকে তিনি হাদীস শিখিয়েছেন। এতো কষ্ট তিনি করে গেছেন হাদীস সংগ্রহের মধ্য দিয়ে। আমরা তাঁর সংগ্রহ করা হাদীস পেয়েছি। কিন্তু আমরা সেই হাদীস পড়ি না। এখানে কি একশতটি হাদীস পড়ার কেউ আছে? আমি তোমাদেরকে লজ্জা দেব না কিন্তু একশটা হাদীস পড়েছো এই এতো বয়স পর্যন্ত এরকম কথা খুব কমই বলতে পারবে। তো হাদীস সংগ্রহের ব্যাপারে আমরা একটা সুন্দর গল্প শুনলাম না?

শিশুরা : জ্বী।

মল্লিক : সুন্দর গল্প শুনলাম। আচ্ছা আসরে ছোট্ট ছোট্ট বেশ কয়েকটা গল্প আমরা শুনেছি। এর মধ্যে দেখি মেজ দাদুর কোন গল্পটা ভালো লেগেছে, হতে পারে সেটা ছোট্টগল্প। তবুও সেই গল্প থেকে মেজো দাদু কি শিখেছে বলবে এখন।

মল্লিক : হ্যাঁ, উনি শুয়েছিলেন। তো আমার মনে হয় সেই গল্পটার কিছু বাকী আছে। তারপরে ঐ যে হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছো।

ঐ যে লোকটা বেরিয়ে এলেন। বেরিয়ে আসার পরে তাঁর কাছ থেকে কিন্তু ইবনে আব্বাস অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ঐ একটি হাদীস সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছিলেন। এবং ঐ যে একটি হাদীস যে সাহাবীর কাছ থেকে নিয়ে এসেছিলেন তাঁকে সারা জীবন কিন্তু শিক্ষক হিসেবে মান্য করেছেন।

মল্লিক : আমরা একটা হাদীস গ্রন্থের নাম শুনেছি না?

শিশুরা : জ্বী, দাদু।

মল্লিক : মুসলিম। সহীহ মুসলিম। এই হাদীস যিনি সংগ্রহ করেছিলেন এর সংকলক যিনি, তিনি হচ্ছেন ইমাম মুসলিম। এ ইমাম মুসলিম হাদীসের ব্যাপারে কত মনোযোগী ছিলেন। একটা হাদীস তিনি খুঁজছেন পাচ্ছেন না। বই খুঁজছেন, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা খুঁজছেন, পাশে ছিলো আমরা ইফতারী করার সময় যে খেজুর খাই, সেই খেজুরের পাত্র।

তিনি পাতা উল্টাচ্ছেন আর খেজুর খাচ্ছেন। পাতা উল্টাচ্ছেন আর খেজুর খাচ্ছেন খেতে খেতে অনেক সময় চলে গেছে। তারপরে এক সময় তিনি যে হাদীসটা খুঁজছিলেন সেই হাদীসটা পেয়ে গেলেন। এদিকে দেখা গেলো যে হাদীসও খুঁজে পাওয়া শেষ আর এ দিকে

খেজুরও খাওয়া শেষ। আমরা একটি হাদীস গ্রন্থের নাম শুনেছি বোখারী তারপরে আরেকটি হাদীস গ্রন্থের নাম শুনেছি সেটার নাম কি?

শিশুরা : সহীহ মুসলিম

মল্লিক : এই সহীহ মুসলিম যিনি সংকলন করেন তাঁর নামও তো মুসলিম। দেখা গেলো যে, তিনি একটি হাদীস পাচ্ছেন না। তারপরে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টানো শুরু করলেন, পাশে ছিলো খেজুরের পাত্র। পৃষ্ঠা উল্টাচ্ছেন আর খেজুর খাচ্ছেন। কি তোমার খেজুর খেতে ইচ্ছা করে? একটু দেবী কর না।

শিশুরা : দাদু, ইফতার তো করা শেষ।

মল্লিক : ও হ্যাঁ হ্যাঁ দেবি করবে কেন? দেখো, আমরা যে ইফতারী করে ফেলেছি সে খবর নাই। খেজুর তো তুমি খেয়েছো?

শিশুরা : জ্বী, দাদু

মল্লিক : আচ্ছা, আবার খেজুর তোমাকে দেয়া হবে। তো খেজুর খেতে খেতে হাদীস পাওয়া হয়ে গেলো, খেজুর খাওয়া শেষ হয়ে গেলো, কতটা মনোযোগী ছিলেন তিনি। তারপরে অতিরিক্ত পরিমাণে খেজুর খাওয়া হয়ে গেল। পরে তিনি অসুস্থ হয়ে গেলেন। এই অসুস্থতার ভেতর দিয়েই তিনি ইন্তেকাল করলেন। দেখেছো কি মনোযোগ ছিলো হাদীস সংগ্রহে। একটা জ্বিনের কেছা আছে।

শিশুরা : দাদু, বলুন না।

মল্লিক : একটা জ্বিনের কেছা আছে। আমাদের উপমহাদেশে সবচেয়ে বড় বড় মুহাদিস যারা ছিলেন, হাদীসের শিক্ষক যারা ছিলেন তাঁদের মধ্যে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (রহ.) র নাম আগে করতে হয়। এই জন্যে যে তিনি হাদীসের চর্চা এই দেশে প্রথম করেছেন। আরও তাঁর অবদান আছে জ্ঞানের ক্ষেত্রে। তারপরে অনেক পরে এসে হাদীসের শিক্ষক হলেন আনোয়ার শাহ কাশমিরী (রহ.)। হাদীসের বড় পণ্ডিত ছিলেন। বিশাল পণ্ডিত ছিলেন। তিনি যে ছাত্রদের পড়াতে সেই ছাত্রদের মধ্যে একটা জ্বিনও এসে পড়াশোনা করতো। বুঝতে পেরেছো?

শিশুরা : জ্বী দাদু।

মল্লিক : বড় বড় ওস্তাদ। আমাদের দেশে অনেকেই জ্বিন বিশ্বাস করে না। তাদের কথা বাদ দাও। তারা তো আল্লাহকেই বিশ্বাস করে না। জ্বিন আর কি বিশ্বাস করবে! তারা তো কুরআনই বিশ্বাস করে না।

কোরআনের মধ্যে আছে 'মিনাল জ্বিন নাতি ওয়ান নাস'। এটা কোন-সূরায় আছে?

শিশুরা : সূরা নাস। একেবারে শেষ আয়াত।

মল্লিক : একেবারে শেষ আয়াত। সেখানে জ্বিনের কথা আছে। তার মানে কোরআনে জ্বিনের কথা আছে। কোরআনে ঐ জ্বিনের সঙ্গে আল্লাহর রসূলের কথোপকথন হয়েছিল।

জ্বিনেরাও ঈমান এনেছিলো কুরআন শুনে, সে কথাও কোরআনে আছে।

শিশুরা : কোরআনের একটা সূরাই আছে এই নামে।

মল্লিক : আমি যখন মক্কা শরীফ গিয়েছিলাম, তখন আমি বিভিন্ন জায়গা দেখেছিলাম। তো যে পাহাড়ে জ্বিনরা এসেছিলো আমি সেই জায়গাতে গিয়েছিলাম। আমার কিন্তু আসলে তখন ভয় করছিলো। জ্বিন যদি এখনো থাকে। আর যদি পট করে পাহাড়ের ভিতর থেকে এসে বলে ফ্যালে, মল্লিক ভাই কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম। তখন আমার অবস্থাটা কি হবে? আসলেই আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তো আনোয়ার শাহ কাশমিরী (রহ.) হাদীসের শিক্ষক ছিলেন। এটা কিন্তু সত্য ঘটনা। হাদীসের শিক্ষক ছিলেন। তিনি পড়াচ্ছেন। হঠাৎ দেখা গেলো একটা সাপ দৌড়ে বেড়াচ্ছে। ছাত্ররা সব ভয় পেয়ে গেছে। সাপটা দৌড় শুরু করে দিয়েছে। দৌড় শুরু করে দিলে ছাত্ররা সাপটাকে মেরে ফেলেছে। সাপটা মেরে ফেললে দেখা গেলো যে, এটা একটা পাখি হয়ে গেছে। একটা কাক না কি আমার মনে নেই। পাখি হয়ে পড়ে আছে। তারপরে জ্বিনের বাদশাহ টাদশাহ সব চলে এলো। বলল যে, হত্যার বদলা হত্যা, খুনের বদলা খুন ইসলামের নিয়ম, আপনারা মুসলমান। আপনারা খুন করেছেন আমাদেরই একজন জ্বিনকে।

সুতরাং যে খুন করেছে তাঁকে খুন করতে হবে। তারপরে কি করা যাবে? জ্বিনের মধ্যে তখন একজন সাহাবী বা তাবেঈ বেঁচেছিলেন, ফয়সালা করার জন্য তিনি আসলেন।

এসে তারপরে রসূলের একটা হাদীস দিয়ে দিলেন। ঐ যে আমি বলেছিলাম না? কোন কাজ কিভাবে করতে হবে সেই নিয়ম তো তোমার জানতে হবে।

আল্লাহর রসূল (সা.) বলেছেন, যে কোনো বিষাক্ত প্রাণী সে তোমাকে আহত করার আগেই তুমি তাঁকে মেরে ফেলতে পারো। এই ধরনের

আরও কিছু কথা সেখানে। ঐ যে বুড়ো জ্বিন, সে এসে বলল যে, আসলে খুনের বদলা তো খুন কিন্তু খুনের বদল খুন মানে কি? একটা মানুষ যখন আরেকটা মানুষকে খুন করবে তখন সেখানে খুনের বদলা খুন। কিন্তু এখানে তো যে মানুষটা মেরে ফেলেছে, সে তো সাপ মেরেছে। সে তো মানুষ মারেনি। তখন ঐ সাহাবী বা তাবেঈ এবং আনোয়ার শাহ কাশমিরী এরা সবাই মিলে ফায়সালা করে দিলেন।

আনোয়ার শাহ কাশমিরীর ছাত্রদের কারো কোন ক্ষতি হলো না। দেখ হাদীসের গল্প করতে করতে জ্বিনের গল্পে চলে এলাম।

তো আমরা আজকে বেশ কয়েকটা ছোট ছোট গল্প শুনলাম তাই না? আমরা আবার দাদুর কাছে জিজ্ঞেস করবো। আমাদের মেজ দাদু বলবে আজকে তার কাছে কোন গল্পটা ভালো লেগেছে। হোক না সেটা ছোট্ট এবং সেই গল্পের শিক্ষাটা কি সে তা বলবে। আমি সানিকেও জিজ্ঞাসা করতে পারি।

শিশুরা : দাদু, এই যে এতো বড় বড় মহা মনীষীরা এতো কষ্ট করেছেন হাদীস সংগ্রহের জন্যে। সেই হাদীস তো আমরা খুব সহজেই পাচ্ছি। আমাদের জন্য সহজলভ্য। অতএব আমাদের এর মূল্য দেওয়া উচিত, পড়া উচিত।

মল্লিক : হাদীস খুবই

শিশুরা : যত্ন সহকারে পড়া উচিত।

মল্লিক : হ্যাঁ, মেজো দাদু খুব সুন্দর করে শিক্ষামূলক কথা বলেছে। এই শিক্ষাগুলো আমাদের মান্য করতে হবে। তো আমরা আবার গল্পের আসরে একত্রিত হবো। গল্পের আসর শেষ করার আগে আমাদের ঐ মেজো দাদু একটা ছড়া শুনাবে। এই ছড়ার মধ্য দিয়ে আমাদের গল্পের আসর শেষ হয়ে যাবে।

শিশুরা : দাদু ছড়ার শিরোনাম হচ্ছে “নবীর কথা” লিখেছেন আমাদের সেই দাদু জয়নুল আবেদীন আজাদ।

মোদের প্রিয় নবীর কথা জানতে হবে ভাই/ তাইতো মোরা হৃদয় দিয়ে তারই গজল গাই।

মল্লিক : রসূলের আদর্শের মধ্যেই শান্তির সমাজ গড়ার আদর্শ নিহিত রয়েছে। সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আল্লাহ হাফেজ।

শিশুরা : আল্লাহ হাফেজ।

গল্প দাদুর আসর

পর্ব- ৪

ইসলামী শিক্ষার প্রসার

মল্লিক : আসসালামু আলাইকুম

শিওরা : ওয়া আলাইকুম আসসালাম ।

মল্লিক : ওয়া রহমাতুল্লাহি ।

শিওরা : ওয়া রহমাতুল্লাহি ।

মল্লিক : ওয়া বারাকাতুহ্ ।

শিওরা : ওয়া বারাকাতুহ্ ।

মল্লিক : দাদু ভাইয়েরা, তোমরা সবাই কেমন আছো?

শিওরা : আলহামদুলিল্লাহি আলা কুল্লি হাল? দাদু, আপনি কেমন আছেন?

মল্লিক : আমিও খুব ভালো আছি । আমাদের দাদু তুমি ভালো আছো?

শিওরা : আলহামদুলিল্লাহি আলা কুল্লি হাল ।

মল্লিক : আলহামদুলিল্লাহি আলা কুল্লি হাল । তো আজকে আমরা মজার একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো । জীবনীর বিষয়টা খুব মজার বিষয় না?

শিওরা : জ্বী, দাদু ।

মল্লিক : জীবনী পড়তে ইচ্ছা করে না?

শিওরা : জ্বী, দাদু ।

মল্লিক : জীবনী পড়লে কি হয় জানো? বড় বড় মানুষের জীবনী পড়লে; কিভাবে বড় হয় মানুষ, কিভাবে বড় হওয়া যায় এই সব জানা যায় ।

শিশুরা : জী, দাদু।

মল্লিক : আচ্ছা, তোমরা কে কে জীবনী পড়তে পছন্দ কর?

শিশুরা : (সবাই হাত তোলে)

মল্লিক : বাহ্ সবাই জীবনী পড়তে পছন্দ করে। আজকে আমরা সাহাবীদের জীবনী নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো। সাহাবীদের জীবনী নিয়ে আলোচনা করার আগে সাহাবীর অর্থ- আমি জিজ্ঞেস করবো। আগে অনেকগুলো গল্পের মধ্যে সাহাবীর প্রসঙ্গ এসেছে। আমি কোন একটা গল্পের মধ্যে সাহাবী শব্দের অর্থ বলেছি। সাহাবী শব্দের অর্থ কার কার মনে আছে?

শিশুরা : (সবাই হাত তোলে)

মল্লিক : বাহ্ বাহ্ দোনারও মনে আছে।

শিশুরা : জী, দাদু।

মল্লিক : সবাই হাত নামাও। আচ্ছা দোনা, তুমি বলোতো সাহাবী মানে কি?

দোনা : দাদু সাথী।

মল্লিক : দেখেছো কতো চমৎকার মিষ্টি নরম অর্থ করেছে! সাথী। আচ্ছা আর কে বলবে? আচ্ছা তুমি বলো তুমি বলো।

শিশুরা : দাদু, সঙ্গী।

মল্লিক : সঙ্গী হ্যাঁ, তুমি বল।

শিশুরা : চলার সাথী।

মল্লিক : চলার সাথী, খুব সুন্দর। এই অর্থটার মধ্যে ছন্দ আছে। একটা গতি আছে। বিজ্ঞান দাদু বলো।

শিশুরা : ফ্রেন্ড

মল্লিক : ফ্রেন্ড, ফ্রেন্ড। ও ইংরেজিতে বললো ফ্রেন্ড। আচ্ছা সাথী দাদু, তুমি তো স্বাস্থ্যবান একটা লোক, তুমি একটা গাব্বা শব্দ বলতো দেখি?

শিশুরা : সহচর

মল্লিক : ঠিকই, যেমন স্বাস্থ্য অর্থটাও ঐ রকম। স্বাস্থ্যকর অর্থ। আচ্ছা আমার বিজ্ঞান দাদুর ইংরেজি শব্দ বলি। এই শব্দটা বলার সঙ্গে সঙ্গে, আমার একটা ইংরেজি বাক্য মনে পড়লো।

“এ ম্যান ইজ নোন বাই দি কোম্পানী হি কিপস।”

মানে সোজা কথায়, বন্ধু দিয়েই বন্ধু চেনা যায়। আমার দাদু একটা ভালো শব্দ বলেছে। আসলে সাহাবীদের জীবনী নিয়ে তো আমরা আলোচনা করবো।

শিশুরা : জ্বী, দাদু

মল্লিক : সাহাবীদেরকে ভালো করে চিনতে হলে আগে ভাগেই রসূল (স.) কে জানতে হবে। তুমি যদি রসূল (স.) কে জেনে ফেলো, রসূলের (স.) জীবনী সম্পর্কে তোমার স্পষ্ট ধারণা হয়ে যায়। একটা পরিষ্কার ধারণা হয়ে যায়। কি ধারণা?

শিশুরা : পরিষ্কার ধারণা।

মল্লিক : পরিষ্কার ধারণা হয়ে যায় তাহলে সাহাবীদেরকে তোমরা চিনতে পারবে। কেননা, সূর্যের আলো থেকে আলোকিত হয় চন্দ্র তাই না?

শিশুরা : জ্বী, দাদু।

মল্লিক : সূর্যের আলো থেকে আলোকিত হয় চন্দ্র। আমরা যদি রসূলে করীম (স.) কে সূর্যের মত ধরে নিই তাহলে চাঁদের মতো আমাদের ধরে নিতে হবে সাহাবীদের। বুঝতে পেরেছ এইবার?

শিশুরা : জ্বী, দাদু।

মল্লিক : সূর্য যে আলো বিতরণ করে সেই আলোই তো চাঁদ পায় তাই না? আচ্ছা তো আমরা ছোট্ট একটা বিষয় নিয়ে এখন কথা বলবো। সেটা হচ্ছে সাহাবী কারা। সাহাবী কারা এটা আমাদের জানতে হবে না?

শিশুরা : জ্বী, দাদু।

মল্লিক : রসূলের (স.) সঙ্গে যারা দেখা করেছেন। রসূলের (স.) সঙ্গে যারা গল্প করেছেন, রসূলের (স.) সঙ্গে যাদের বন্ধুত্ব ছিল এরাই তো সাহাবী তাই না?

শিশুরা : জ্বী, দাদু।

মল্লিক : দেখ তো এরাই যদি সাহাবী হয় তাহলে রসূল তো আবু জেহেলের সাথেও কথা বলেছেন, আবু লাহাবের সাথেও কথা বলেছেন। এখন আবু লাহাবও যদি সাহাবী হয়, আবু জেহেলও যদি সাহাবী হয়, তাহলে আসল সাহাবী কারা?

শিশুরা : যাদের ঈমান ছিল; যাদের ঈমান ছিলো তারাই সাহাবী ।

মল্লিক : মেজ দাদু পরিষ্কার করে বলার চেষ্টা করেছে, আর আমাদের এই যে, মোটা মোটা দাদুটা সেও একটু বলার চেষ্টা করেছে । আচ্ছা শোনো সাহাবী কাদের বলে । রসূলে করীম (স.)ও বেঁচে আছেন । ইয়েমেনের একজন রসূল প্রেমিক তিনি মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি রসূল (স.) কে অসম্ভব রকম ভালোবাসতেন । কেউ কেউ বলে যে ওহুদের যুদ্ধে রসূলের (স.) যখন দাঁত ভেঙে গেল.. কি ভেঙে গেল?

শিশুরা : দাঁত ভেঙে গেল । (সমস্বরে)

মল্লিক : দাঁত ভেঙে গেল । এই রসূল প্রেমিক যখন শুনলেন তখন তিনি তার সবগুলো দাঁত ভেঙে ফেললেন । যদিও এইসব কথা নিয়ে মতবিরোধ আছে কিন্তু ভালোবাসা সব পারে ।

মল্লিক : ভালোবাসার জন্য মানুষ আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মরে যাচ্ছে না?

শিশুরা : জ্বী, দাদু । (সমস্বরে)

মল্লিক : সেখানে রসূলের ভালোবাসায় যদি কেউ সবগুলো দাঁত ভেঙে ফেলে দিয়ে থাকে তো আমি এই নিয়ে বিতর্ক করতে চাই না । যাইহোক, যিনি দাঁতগুলো ভেঙে ফেলেছিলেন, তার নাম হচ্ছে, উয়াইস করনি । কারণ অঞ্চলে তার বসবাস ছিলো এই জন্যে তাঁকে করনি বলা হতো । তিনি কতো ভালো মানুষ ছিলেন জানো? রসূলে করীম (সা.) ওমর (রা.) কে বলেছিলেন, ওমর তোমার সঙ্গে কোনো এক যুদ্ধে উয়াইস করনির দেখা হয়ে যাবে । উয়াইস করনির যদি দেখা হয়ে যায়, তাহলে উয়াইস করনির কাছে তুমি তোমার মায়ের জন্যে দোয়া করতে বলবে । ওমর (রা.) কে রসূল বলেছেন, তুমি তোমার জীবনের গুনাহখাতার জন্যে ঐ উয়াইস করনিকে দোয়া করতে বলবে । কতো বড় মাপের মানুষ । আর রসূল (স.) বলে দিলেন তুমি একটা চিহ্ন পাবে উয়াইস করনিকে চেনার জন্যে । সে চিহ্নটা হলো তার আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে সাদা সাদা দাগ থাকবে । তোমরা দেখেছো না আমাদের দেশে?

এক ধরনের লোকদের হঠাৎ দেখা গেলো যে, ঠোঁট সাদা হয়ে গেছে । হঠাৎ দেখা গেল যে, কপালের কানিটা সাদা হয়ে গেছে । হঠাৎ দেখা গেলো ঘাড় খানিকটা সাদা হয়ে গেলো, এটা একটা রোগ । এই রোগটা কেউ কেউ বলে যে, উয়াইস করনির ছিলো । যারা বলে যে, তার কুষ্ঠ রোগ ছিলো, এটা সত্য নয় । এটা তোমরা বিশ্বাস করবে না ।

তাঁর হাতে এই সাদা রোগটা ছিলো। রসূল (স.) কি বললেন? তুমি কোন জেহাদে তাঁকে পাবে। এবং তাঁর হাতে সাদা দাগ পাবে। সে মূলত তাঁকে প্রকাশ করতে চায় না। এই উয়াইস করনি যতোদিন বেঁচে ছিলেন, তাঁর আত্মার সেবা তিনি করতেন। আত্মার সেবা বাদ দিয়ে তিনি মদিনাতে এসে রসূলের (স.) সাথে দেখা করতে পারেন নাই। সারা জীবনেই তাঁর সাথে দেখা করার সুযোগ হয় নাই। রসূল (স.) যতোদিন বেঁচে ছিলেন ততোদিন তাঁর আত্মা ছিলেন অত্যন্ত অসুস্থ, এই জন্যে। দেখো পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী রসূল (স.) কে ভালোবেসে ছিলেন।

কিন্তু রসূলের নির্দেশকে মান্য করেছিলেন। রসূলের (স.) নির্দেশ, বিভিন্ন সময় রসূল (স.) বলেছেন, তোমরা তোমাদের মায়ের সেবা করবে। উয়াইস করনির মা ছিলেন অসুস্থ। এই মায়ের সেবা করতে গিয়ে দুনিয়াতে সবচেয়ে যে মানুষটাকে ভালোবাসতেন সেই রসূলকে তিনি রসূলের জীবদ্দশায় দেখতে পাননি। অথচ রসূলের প্রেমিক ছিলেন। তাঁকে সাহাবী বলা হয় না।

তাঁর ঈমান ছিলো, তাঁর আমল ছিলো, তারপরও তাঁকে সাহাবী বলা হয় নাই এই জন্যে যে, সাহাবী হওয়ার শর্ত হলো ঈমান সহকারে রসূলকে দেখতে হবে। এবং ঈমানসহকারে মারা যেতে হবে। যে ব্যক্তি বৈঈমান হয়ে মারা গেলো ঈমান সহকারে রসূল (স.) কে দেখেছিল সেও সাহাবী না। আবার দেখো একব্যক্তি সে রসূল (স.) কে জীবদ্দশায় দেখে নাই, সে শুনলো যে রসূলের ইষ্টেকাল হয়ে গেছে, দ্রুত সে মদিনায় চলে এলো। মদিনায় চলে এসে রসূলে করীমের (স.) মৃত লাশ, পবিত্র লাশ সে দেখলো, তাঁকে সাহাবী বলা হয়েছে, দেখেছো?

রসূল (স.) ইষ্টেকাল করেছেন। ইষ্টেকাল করার পরে রসূলকে এক ব্যক্তি দেখেছেন তাঁকে কিন্তু সাহাবী বলা হচ্ছে। তাঁর মানে তিনি রসূল (স.) কে ঈমান অবস্থায় দেখেছেন। রসূল মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু মৃত্যুবরণ করলেও রসূলের লাশ তিনি দেখেছেন, মুখমণ্ডল তিনি দেখেছেন। সে জন্যে তাঁকে সাহাবী বলা হচ্ছে। এখন সোজা কথায় যারা ঈমান সহকারে রসূলকে দেখেছে এবং ঈমান সহকারে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন তাঁরা হলেন সাহাবী। সাহাবী যারা ছিলেন তাঁরা রসূল (স.) কে কেমন ভালোবাসতেন?

এক সাহাবী, তিনি রসূলকে কবরে রাখলেন, আরো অনেকেই রসূল (সা.) কে কবরে রাখলেন, তারপরে সেই সাহাবী করলেন কি,

জীবনের জন্যে দুর্লভ একটি ইতিহাস গড়ার জন্যে তিনি কি করলেন, এগুলো কোন পলিটিক্স না এগুলো হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা, তিনি করলেন কি হাতের একটা আংটি তিনি কবরের মধ্যে ফেলে আসলেন। সবাই উঠে এলো। সবাই উঠে আসার পরে সেই সাহাবী বলছেন, আহহা আমার আংটিটা আমি কবরে ফেলে এসেছি। তারপরে সবাই বললো যাও যাও তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো।

আংটিটা তিনি নিয়ে আসলেন। তারপরে গোমর ফাঁস করে দিলেন। বললেন, আসলে আমি চেয়েছিলাম আমিই যেনো রাসূলের কবর থেকে উঠে আসা শেষ ব্যক্তি হই, সেই জন্যে আমি এটা বুদ্ধি করে করেছিলাম। রসূলের ভালোবাসা দেখেছো? সাহাবীরা এই রকম করে রসূল (স.) কে ভালোবাসতেন। আরেকটা গল্প শোনো।

শিশুরা : জ্বী, দাদু।

মল্লিক : আমি এই রকম করে কয়েকটা গল্প বলবো আজকে। ছোট্ট ছোট্ট গল্প।

শিশুরা : জ্বী, দাদু।

মল্লিক : রসূলে কারীম (স.) কে অসম্ভব রকম ভালোবাসতেন ওমর (রা.)। ওমর (রা.) আর রসূল (স.) একদিন হেঁটে হেঁটে কোথাও যাচ্ছেন। একজন নবী আর একজন সাহাবী। কিন্তু দুই বন্ধু। দুই বন্ধু হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন। যাচ্ছেন।

হঠাৎ রসূল (স.) জিজ্ঞেস করলেন ওমর তুমি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসো? ওমর (রা.) ছিলেন স্পষ্টভাষী। যা বলবেন সোজাসুজি বলবেন। রাখ-ঢাক নেই। কোরআনে একটা আয়াত আছে। ওয়াকুল কাওলান সাদিদা। যা বলবে সোজাসুজি বলবে। স্পষ্ট করে বলবে। ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কিছু বলবে না। অনেকে এই রকম আছে কিন্তু যে, একটা প্রাণী আছে না সেই প্রাণীটা পানি কিভাবে খায়? মেজ দাদু, বলতে পারো কিভাবে পানি খায়?

শিশুরা : পেছন দিয়ে ঘুরিয়ে খায়।

মল্লিক : হ্যাঁ হ্যাঁ, আরেকটু পরিষ্কার ভাবে বললে ভালো হতো। গাধা কখনো স্বচ্ছ পানি খায় না। সে ঘুলিয়ে তারপরে পানি খায়। তো এক ধরনের লোক আছে যারা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলে। ওমর (রা.) এই পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কথার ধার ধারেন না। তিনি যা বিশ্বাস করতেন বলে ফেলতেন। রসূল (সা.) কে বললেন, ইয়া রাসূল্লাহ! এই মুহূর্তে

আমি আমাকেই বেশি ভালোবাসি। তারপরে আপনাকে ভালোবাসি। রসূল (সা.) চুপ করে রইলেন। দুই বন্ধু হাঁটছেন। কিছু দূর যাবার পর আবার মৌনতা ভেঙে রসূল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, এবার বলো তো ওমর তুমি কাকে বেশি ভালোবাসো? এইবার ওমর (রা.) কান্না শুরু করেছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই মুহূর্তে আমি আপনাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। তারপরে আমাকে ভালোবাসি। এই ওমর (রা.) কি ছিলেন? একজন যুবক ছিলেন।

ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড শত্রুতা তিনি করতেন। তারপরে ওই যে গল্প করেছিলাম না? তিনি কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন? তারপরে তিনি খলিফা হলেন। আখা জাহানের খলিফা।

সমস্ত দুনিয়ার অর্ধেক দুনিয়ার তিনি খলিফা হলেন। তিনি কতোটা বিনয়ী ছিলেন, সেই বিনয় নিয়ে আমি গল্প করবো। মাঝখানে আমাদের দাদু কবি কাজী নজরুল ইসলামের ‘ওমর ফারুক’ কবিতা থেকে অল্প কয়েক লাইন আবৃত্তি করবে।

শিশুরা : আমার কবিতার নাম ‘ওমর ফারুক’ লিখেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। ইসলাম সে তো পরশ মানিক তাকে কে পেয়েছে খুঁজি
পরশে তাহার সোনা হলো যারা তাদেরই মোরা বুঝি
আজ বুঝি কেনো বলিয়াছিলেন শেষ পয়গম্বর—
‘মোরপরে যদি নবী হতো কেউ সে হতো এক ওমর।’

অর্ধ পৃথিবী করেছে শাসন ধুলার তখতে বসি
খেজুর পাতার প্রাসাদ তোমার বারে বারে গেছে খসি।
সাইমুম ঝড়ে পড়েছে কুটির তুমি পড়নি কো নুয়ে
উর্ধ্বের যারা পড়েছে তাহারা তুমি ছিলে খাড়া ভুঁয়ে।।

মল্লিক : দেখেছো, আমার দাদু, ‘ওমর ফারুক’ কবিতা যেটা আমাদের প্রিয় কবি, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন, সেই কবিতা থেকে কয়েকটা লাইন সে আমাদের পড়ে শোনালাম।

ওমর (রা.) কি বললেন? বললেন, আচ্ছা অর্ধেক জাহানের খলিফা ওমর তুমি অহংকার করছো, রাখো? খুতবা দেওয়ার সময় তোমাকে আমি আজকে আচ্ছা মতো শাস্তি দেবো।

খুতবা দিতে দাঁড়ালেন। ওমর (রা.) এর খুতবা শোনার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে লোকেরা আসতো এবং তোমাদের মনে রাখতে হবে যে, ওমর

(রা.) পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ শাসক শুধু নন তিনি সেই সময়ের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচকও ছিলেন। আরবি ভাষা এবং সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচক ছিলেন। এই জন্য তার বক্তৃতা ছিলো অসাধারণ বক্তৃতা। খুতবা দিতে দাঁড়িয়েছেন। খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে বলা শুরু করলেন, ওমর তুমি হচ্ছো সেই ওমর যে ওমর দুম্বা চরিয়ে বেড়াতো। তুমি হচ্ছো সেই ওমর যে ঘোড়া চরিয়ে বেড়াতো। তোমাকে দেখে লোকেরা ভয় পেতো। তোমাকে দেখে লোকেরা দূরে সরে যেতো। তোমার ভয়ে অস্তির থাকতো এলাকার লোকজন এবং তোমাকে কেউ চিনতো না, এই পৃথিবীর তুমি হচ্ছো সেই ওমর।

এইভাবে তিনি ওমর (রা.) এর যতো বদনাম আছে সব বদনাম খুতবার মধ্যে পেশ করে ওয়াখেরে দাওয়ানা ওয়ানিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন বললেন।

সমস্ত লোকেরা অবাক হয়ে গেলো। নামাজের পরে যাদের একটু সাহস ছিলো এবং যাদের আবেগ ছিলো তারা বললো, আমরা দূর-দূরান্ত থেকে আপনার খুতবা শুনতে আসছি। আপনি আজকে একি বললেন? তখন ওমর (রা.) বললেন, আমার ভিতরে অহংকার এসেছিলো সে জন্যে আমি আসলে কি ছিলাম সবাইকে জানিয়ে দিলাম। যাতে আমাকে কেউ আর বড় বলে মনে করতে না পারে। আর আমি আমার অহংকারের বীজ নষ্ট করে দিলাম।

সাহাবীদের যেই সব গুণ ছিলো, সেইসব গুণ বড় মানুষ হওয়ার জন্য দরকার। আয়েশা (রা.) 'র বোনের ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের। আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের খালা হলেন আয়েশা (রা.)। আয়েশার (রা.) ছিলো দুটো হাত, তিনি কেবল দান করতেন, কেবল দান করতেন। একদিন হলো কি রসূলে কারীম (স.) একটা দুম্বা জবাই করে সকালবেলার দিকে আয়েশা (রা.)এর কাছে রেখে কাজে গেলেন। ফিরে এলেন রাতে। রাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে আয়েশা (রা.) বললেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ (স.) ঐ যে দুম্বাটা জবাই করে দিয়ে গিয়েছিলেন না ঐ দুম্বার সব আমি দান করে দিয়েছি।

খালি গলাটা আছে। কি আছে?

শিশুরা : (সমস্বরে) গলাটা আছে।

মল্লিক : গলাটা আছে আর সবটাই দান করে দিয়েছি। রসূল তো রসূল (স.)। আমরা হলে কি করতাম? আমরা, হ্যাঁ আজকে একটু গোশত খাবো

ভেবেছিলাম সব দান করে দিয়েছো এরকম করলে হয়, রসূল (স.) খুব খুশি হলেন। রসূল (স.) বললেন, আয়েশা, একথাটা মনে রাখবে। রসূল (স.) কি বললেন? রসূল (স.) বললেন, আয়েশা সব দান করে দিয়েছো এটা বলো না, গলাটা আছে শুধু এটা বলো না, বলো যে, গলাটাই শুধু নেই আর সবটাই আছে। এরকম দানের হাত ছিলো আয়েশা (রা.) এর। এই দানের হাতের বিরুদ্ধে তাঁর বোনের ছেলে, ভাগ্নে, তিনিও সাহাবী ছিলেন, খুব জ্ঞানীলোক ছিলেন। পরে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের খালার বিরুদ্ধে একদিন একটা কথা বলে বসলেন। আসলে খালার দানের হাতের যে অবস্থা তাতে হাতটা একটু সামলানো দরকার। দানের হাতটা বেশি বড় হয়ে গেছে। সামলানো দরকার। আয়েশা (রা.) এতোটা রেগে গেলেন, দানের বিরুদ্ধে সে কথা বলেছে। আয়েশা (রা.)'র দানের হাতটা ছিল প্রসারিত। এই দানের হাতের বিরুদ্ধে ছোট্ট একটা অভিযোগ করলেন তারই ভাগ্নে আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)!

আয়েশা (রা.) খুবই দুঃখ পেলেন এবং ভাগ্নের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিলেন। এখন ভাগ্নে তো খালার সাথে, এমন খালা যাকে না দেখলে সে টিকতে পারে না। এমন খালা যার কাছ থেকে ছোটবেলায় জ্ঞানার্জন করেছেন এবং সব সময় এখন পর্যন্ত জ্ঞানার্জন করেন। এখন তিনি অর্থাৎ জুবায়ের (রা.) সমস্যায় পড়ে গেলেন। বারবার চেষ্টা করতে লাগলেন খালার সাথে কথা বলার। খালা কথা বলছিলেন না। তারপরে আত্মীয়-স্বজন সবাই মিলে আয়েশা (রা.) কে বোঝালেন। তারপর তিনি আবার আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.) এর সাথে কথা বলা শুরু করলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.) আয়েশা (রা.) এর দানের বিরুদ্ধে জীবনে আর কোনো দিন একটা কথা বলেন নাই। ওমর (রা.) প্রসিদ্ধ সাহাবীর নাম। তাঁর ছেলের নাম আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর। তিনি যদি কোথাও যেতেন তাহলে তার জন্যে কেউ যদি চেয়ার ছেড়ে দিতো, মুরব্বি বা সম্মানী লোক গেলে আমরা চেয়ার ছেড়ে দেই না?

শিশুরা : জ্বী, দাদু।

মল্লিক : আমরা তো চেয়ার ছেড়ে দেই। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের (রা.) অভ্যাস ছিলো তিনি কোথাও গেলে তাঁর সম্মানে যদি কেউ দাঁড়াতো তিনি সেই জায়গায় বসতেনই না। মানুষকে এতো তিনি সম্মান করতেন।

আর আমরা কি করি। আমরা কোথাও গেলে মুরব্বিও দেখি না, সম্মানী লোকও দেখি না, চেয়ার একটা খালি পেলেই আগে সেখানে বসে পড়ি। এই কাজটা আমরা করি। এই কাজটা আমরা গাড়িতে বেশি করে করি। আমরা যদি সাহাবীদের জীবন থেকে সবকিছু শেখার চেষ্টা করি, তাহলে আমাদের জীবন উন্নত হতো। একটি কথা বলতেই হবে, সে কথাটি হচ্ছে, সাহাবীরা হচ্ছেন রসূল (সা.) এর জীবনের ব্যাখ্যা।

সাহাবীরা হচ্ছেন রসূলের (সা.) কাজের ব্যাখ্যা। সাহাবীরা হচ্ছেন রসূলের (সা.) কাজের সমর্থনকারী। এটা যেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক তেমনি বলতে পারি সাহাবীদের কাছ থেকে আমাদের জীবনের অনেক কিছু শেখার আছে। যেমন- কবিতার ব্যাপারে আমি সাহাবীদের কাছ থেকে শিখেছি। কাব বিন মালিক (রা.) বড় নেতা ছিলেন এবং বড় কবি ছিলেন। তাঁকে যেমন রসূল (সা.) কবিতার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেন। তেমনি তিনিও রাসূলকে (সা.) কবিতার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেন। একদিন কাব বিন মালিক (রা.), কবি এবং বড় নেতা তিনি রসূলকে (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূল্লাহ (সা.) কবিতার ব্যাপারে আপনার মতামত কি? আল্লাহর রসূল (সা.) বললেন, একজন মুমিন সে হাতিয়ার দিয়ে যেমন লড়াই করে। তেমনি কবিতা দিয়ে, তেমনি ভাষা দিয়ে সে লড়াই করে। তার মানে কবিতার ভাষা, সংস্কৃতির ভাষা, সাহিত্যের ভাষা, এসবই হলো লড়াই করার ভাষা। এই ভাষার মধ্য দিয়ে আমরা দেশের জন্যে লড়াই করি, আমরা জাতির জন্যে লড়াই করি, আমরা সত্যের জন্যে লড়াই করি। দাদু ভাইয়েরা আমরা সাহাবীদের সম্পর্কে বেশ কয়েকটা ছোট ছোট গল্প শুনলাম। এবার শুনবো আমাদের শফিক দাদুর কাছ থেকে একটা গান। কেমন?

শিশুরা : (সম্মুখে) জ্বী দাদু।

সবাই : সাহাবীদের উপর আল্লাহ তায়াল্লা সন্তুষ্ট ছিলেন। রাদিআল্লাহ আনহু তাই উপাধি দিলেন।

সাহাবীরা হলেন আল্লাহর নবীর খাঁটি অনুসারী
দ্বীনের জন্য তারা থাকতেন ভূখা অনাহারী
নির্ভাবনায় সত্য ন্যায়ের ঝাণ্ডা তুলে নিতেন।। ঐ
আল্লাহর পথে তাদের ত্যাগের তুলনা হয় না যে
আলোকিত জিন্দেগানির তারাই উপমা যে
মানবতার জন্যে তারা সব বিলিয়ে দিতেন।। ঐ

মল্লিক : সাহাবীদের উপর আল্লাহ তায়াল্লা সন্তুষ্ট ছিলেন কেন? সাহাবীরা সারা জীবন পুণ্যের কাজ করে গেছেন, পুণ্যের কাজ করতেন। আমরা গানের সঙ্গে সঙ্গে আজকে আরও একটু মজা করবো। সেটা হলো আমাদের মেজো দাদু একটা ছড়া বলবে। তারপরেই আমাদের গল্পের আসর শেষ হয়ে যাবে।

শিশুরা : দাদু!

মল্লিক : হ্যাঁ

শিশুরা : ছড়াটি আমাদের জন্যে আমাদের জয়নুল আবেদীন আজাদ দাদু পাঠিয়েছেন।

মল্লিক : হ্যাঁ, আমাদের জন্যে তো বেশ কয়েকটি ছড়া তিনি পাঠিয়েছেন এখন পড়।

শিশুরা : শিরোনাম হচ্ছে “নবীর বন্ধু যারা”

নবীর যারা বন্ধু স্বজন তারা সোনার মানুষ

এ নয় শুধু গল্পগাথা, কিংবা কথার ফানুস।

নবীর যারা বন্ধু ছিলেন, ছিলেন মানুষ ভালো

ত্যাগ তিতিক্ষায় সারা জীবন জ্বলে গেছেন আলো

ধন-সম্পদ সব দিয়েছেন ছিলেন বড় আপন

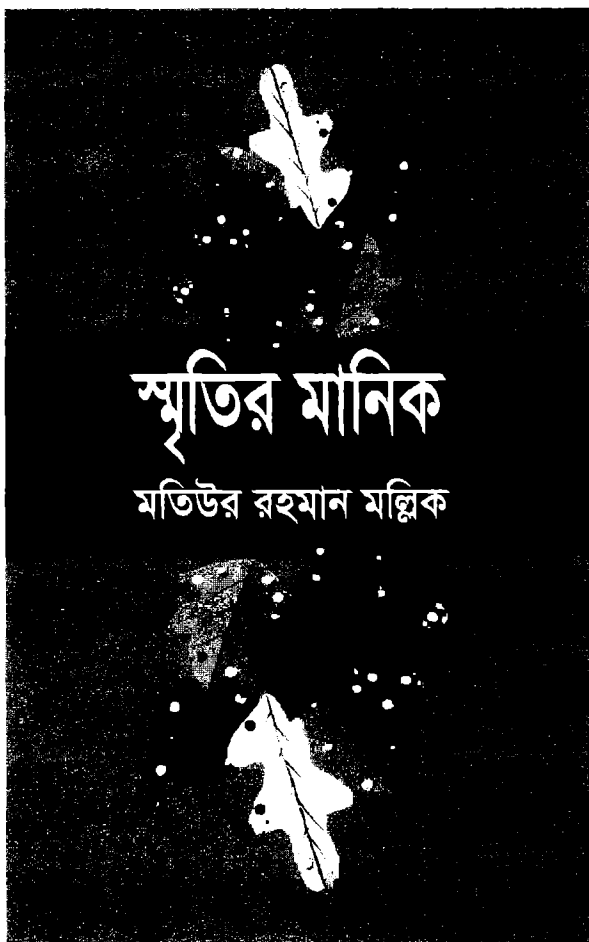
সাহাবারা নবীর কথায় দেন বিলিয়ে জীবন।

মল্লিক : দাদু ভাইয়েরা আমরা যদি ভালো হতে চাই। তাহলে রসূলের (স.) জীবন ভালো করে পড়তে হবে। সাহাবীদের জীবনী ভালো করে পড়তে হবে, তা না হলে আলোর পথ, ন্যায়ের পথ আমরা আবিষ্কার করতে পারবো না। আজকের মতো আমরা গল্পের আসর শেষ করি। আল্লাহ হাফেজ।

শিশুরা : (সমস্বরে) আল্লাহ হাফেজ।

স্মৃতির মানিক

[অগ্রদ্বিত]



প্রসঙ্গ কথা

‘স্মৃতির মানিক’ কবি মতিউর রহমান মল্লিকের একটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধের বই। এটি মূলত স্মৃতিগদ্য। এখানে কবির শৈশব-তারুণ্যের গল্প, লেখক হওয়ার ইতিবৃত্ত, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নানান কাজে তিষ্ঠ-মধুর স্মৃতি, কবির প্রিয়ভাজন, প্রিয় মানুষদের সাথে জীবনের নানা স্মৃতি, লেটে থাকা অব্যক্ত কথামালা চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন গল্প-আড্ডাচ্ছলে। কবির আত্মার মানুষদের বিয়োগান্ত ঘটনার দুর্বিষহ স্মৃতি এখানে কবি ভারাক্রান্ত হৃদয়ের আকুতি ভরে তুলে ধরেছেন। এই পাণ্ডুলিপিতে ১১টি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। পাণ্ডুলিপিটির প্রচ্ছদ ঐকেছেন মোমিন উদ্দীন খালেদ।

সূচিপত্র

সাহিত্যের প্রেমে সংস্কৃতির ভালোবাসায়/ ২০৯

শাহাবুদ্দীন ভাইয়ের গ্রামের বাড়িতে একদিন/ ২১৬

উপশমহীন এক কষ্টের স্মৃতি/ ২২০

শহীদ মালেক আজো আমায় ডাকে/ ২২৪

সেই সে ঈদের দিনগুলো/ ২২৮

বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্র : দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে একটি তাত্ক্ষণিক স্মরণ/ ২৩৫

বাগেরহাট সংস্কৃতি কেন্দ্রের প্রথম সম্মেলন : নতুন আলোর ঝলকানি/ ২৩৮

প্রথম অডিও অ্যালবাম : প্রসঙ্গ কথা/ ২৪৮

স্মৃতির মানিক : অখণ্ড সাইমুমের অখণ্ডাংশ কিছু কিছু/ ২৫২

ফ্রান্স সফরের টুকরো স্মৃতি/ ২৬০

তিনি আর উত্তর দেবেন না/ ২৬৩

সাহিত্যের প্রেমে সংস্কৃতির ভালোবাসায়

এক. ওহে বান্দর কলা খাবি নাকি

এক অসাধারণ স্বভাব কবির নাম মল্লিক আহমদ আলী। হাই স্কুলের এক সময়ের এক জাদুরেল শিক্ষক। বাংলা ভাষার এতো বড় পণ্ডিত আমি আমার জীবনে দেখিনি। আমার পরম সৌভাগ্য যে, বিরাট মাপের এই মানুষটিই আমার বড় ভাই।

ছোটবেলার একটা দৃশ্য আমাকে পাগল করে তুলেছিল। দৃশ্যটি হচ্ছে— বড় ভাই হেরিকেনের আলোয় কবিতা লিখছেন আর আমার বড় ভাবী নিঃশব্দে এবং গভীর আন্তরিকতায় তালপাতার পাখায় বাতাস করে যাচ্ছেন। ফাঁকে ফাঁকে আবার পান বানিয়েও দিচ্ছেন; বড় ভাই কোনো কথা ছাড়াই পান তুলে নিচ্ছেন গালে—পানের দিকে না তাকিয়ে।

ঐ মনোরম দৃশ্য দেখে দেখে, আমিও কবিতা লেখার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম এবং কবিতা লেখার জন্যে বিষয়বস্তু খুঁজতে গিয়ে কখনো তাকিয়ে থাকতাম আকাশের দিকে, কখনো তাকিয়ে থাকতাম উড়ন্ত পাখির দিকে, কখনো তাকিয়ে থাকতাম মেঘমালায় দিকে, কখনো তাকিয়ে থাকতাম অফুরন্ত সবুজের দিকে, কখনো তাকিয়ে থাকতাম ধরা-ছোঁয়ার বাইরের দিগন্তের দিকে।

ঐভাবে কত দিন যে-চলে গিয়েছিলো আজ আর মনে নেই। শুধু মনে পড়ে শেষ পর্যন্ত বিষয়বস্তু খুঁজে না পেয়ে একটি মাদুর, এক জগ পানি এবং একটি গ্লাস নিয়ে একদিন আমি চলে গিয়েছিলাম আমাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকের ছোট্ট একটা বিলের ওপারের অসম্ভব নির্জন একটি বাঁশ বাগানের ভেতর।

সারাদিন কেটে গিয়েছিলো আমার কবিতার বিষয়বস্তু খুঁজতে খুঁজতে এবং ঐ বাঁশ বাগানের ভেতরেই।

অবশেষে কবিতার দেখা মিললো। লিখে ফেললাম:

ওহে, বান্দর কলা খাবি নাকি

তাই কি এতো ডাকাডাকি

ঐ ধরনের আরো কয়েকটি লাইন লিখে ফেলেছিলাম সে-দিন এবং প্রথম লিখেছিলাম। কিন্তু আজ আর বাকী লাইনগুলো কিছুতেই মনে করতে পারি না।

জীবনের প্রথম কবিতা লেখার কী যে আনন্দ তা প্রকাশ করা যাবে না। সে এক অপার্থিব উল্লাস। সে এক অনির্বচনীয় সুখ।

আমার মেজো ভাই মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ডা. মল্লিক আবদুল কাদের মহিউদ্দীন খুব ভালো গল্প লিখতেন তখন, খুব ভালো স্পোর্টসম্যানও ছিলেন এবং তার সাথে আমার সম্পর্কও ছিলো খুব খোলামেলা। কবিতাটা তাঁকেই দেখালাম। দেখেই তিনি হো-হো করে হেসে উঠলেন এবং মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলেন, ‘মা, মা, তোমার ছোয়াল আরো এটো কবি অইছে, আমাগে ক্যালা-ট্যালা সব বান্দররে খাওয়ায়ে দেয়ার ব্যবস্থা এরিছে, এহোন কি এরুবা এরো।’

মেজো ভাইয়ের কথা শুনে এবং মায়ের হাসি দেখে আমি সেদিন পালিয়ে বেঁচে ছিলাম কিন্তু বাড়িময় ছড়িয়ে গিয়েছিলো আমার ঐ প্রথম কবিতার প্রথম লাইন। যার সাথেই দেখা হচ্ছিল সেই আমাকে ঐ কবিতার লাইন না শুনিয়ে ছাড়ছিলো না। নাকানী-চুবানীর ঐ ঘটনা আজও আমাকে লজ্জায় নাজেহাল করে ছাড়ে।

দুই. আধুনিক কবিতা লেখার প্রেরণা

প্রথম কবিতা লেখার পর একদিকে যেমন আমি নাজেহাল হয়েছিলাম, অন্যদিকে তেমনি আমি কবিতা লেখার জন্য যার-পর-নাই জেদী হয়ে উঠেছিলাম। ভালো হোক মন্দ হোক প্রায়ই কবিতা লিখতাম, ইচ্ছে মতোন কবিতা লিখতাম, দেখাতাম না কাউকে।

এ-সময়ই আমি আমার এক ক্লাসফ্রেন্ড আব্বাসকে কবিতায় চিঠি লিখলাম। কবিতাটা আমার কাছে বেশ ভালোই লাগলো। বড় ভাইকে দেখালাম। বড় ভাই গভীর মনোযোগ দিয়ে কবিতাটা পড়লেন। আমার দিকে তাকালেন এবং বললেন, ‘এখন থেকেই তুমি আধুনিক কবিতা লিখতে শুরু করো, মনে হচ্ছে—তুমি খুব ভালো কবিতা লিখতে পারবে।’

বড় ভাইয়ের কথায় আমি সে-দিন যে কতোটা উজ্জীবিত হয়েছিলাম, তা বর্ণনা করার মতো ভাষা আমি আজও জোগাড় করতে পারিনি। শুধু সে-দিন থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত ‘তুমি খুব ভালো কবিতা লিখতে পারবে’ এই কথাটি অষ্টপ্রহর

আমার মধ্যে গুঞ্জনিত হয়েছিলো। আমি কবিতা লেখায় মনোযোগ দিলাম।

তখন আমার ভাবনা শুধু, কিভাবে ভালো কবিতা লেখা যায়। এমনিই কবিতা পড়তাম। কবিতা যতো কঠিনই হোক, বুঝি আর না বুঝি, কবিতার একটা অলংঘনীয় আকর্ষণ দীর্ঘ সময় ধরে মুহ্যমান করে রাখতো আমাকে। হয়তো সেই কারণে, কেউ না বলা সত্ত্বেও, আমি বুঝে নিয়েছিলাম, কবিতা লিখতে হলে কবিতা পড়তে হবে।

বড় ভাইয়ের ব্যক্তিগত লাইব্রেরিটি ছিলো অত্যন্ত উঁচুমানের লাইব্রেরি। ইতোমধ্যেই রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কবিতা আমার পড়া হয়ে গেছে। তবুও তার কবিতা সমগ্র, জীবনানন্দ দাসের কবিতা সমগ্র, নজরুলের কবিতার একটি সংকলন এবং বিশেষ করে সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা সমগ্র নতুন করে আমার নিত্যদিনের অপরিহার্য সঙ্গী হয়ে উঠলো। সঙ্গী হয়ে উঠলো জসীম উদ্দীনের কবিতার বইগুলো।

জীবনানন্দের কবিতার রহস্যময়তা, সুকান্তের কবিতার বৈপ্লবিক চৈতন্য এবং সর্বহারার প্রতি সহানুভূতি আমাকে তখন উন্মাতাল করে তুলেছিল। এখন প্রতিদিনের কাজ হলো কবিতার বই পড়া আর দু-একটি করে কবিতা লেখা। আমি আজও কবিতা লেখার চেয়ে কবিতা পড়ি অনেক বেশী।

ঐ যে বড় ভাই বলেছিলেন, ‘তুমি খুব ভালো কবিতা লিখতে পারবে’। সত্যি কথা বলতে কি, বড় ভাইয়ের ঐ কথা হাতে-নাতে প্রমাণিত হয়ে গেলো সে-দিন, যে-দিন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক হযরত মাওলানা আবদুল হাই আমার একটি দীর্ঘ আধুনিক কবিতা পড়ে, অনেকক্ষণ নিম্পলক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে উঠেছিলেন, ‘তুমি আধুনিক কবিতা লেখো? সুন্দর, খুবই সুন্দর; খবরদার, যে যাই বলুক, লেখা বন্ধ করবে না কখনো এবং আমাকে নতুন কবিতা লিখলেই পড়ে শোনাবে।’

আধুনিক কবিতার ব্যাপারে একজন মাদরাসা-শিক্ষকের আগ্রহ দেখে আমি সে-দিন হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমি এই আধুনিক মনন সম্পন্ন আলেমে দ্বীনের কাছেই ইসলামী আন্দোলনের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিলাম। তিনিই আমাকে ইসলামী আন্দোলনের পথে চলবার প্রথম প্রেরণাদাতা মহাপুরুষ।

তিন. দেশের ডাক পত্রিকার সাহিত্য-সম্পাদক ও নুরুল হক

আমাদের গ্রামের নাম বারুইপাড়া। প্রাচীন নাম বারোপাড়া। বারুইপাড়া আবার আমাদের ইউনিয়নের নামও। বাগেরহাট সদর থানার ইউনিয়ন। আমাদের গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত থেকে বয়ে গেছে অনিন্দ্য সুন্দর এক নদী— এলাকার

লোকেরা বলে বোরের নদী। নদীর পশ্চিম তীর ধরে দাঁড়িয়ে আছে পাইকপাড়া নামের চোখজুড়ানো আর এক গ্রাম। এই গ্রামেরই ছেলে নূরুল হক। বয়সে আমার চেয়ে কয়েক বছরের ছোট। কিন্তু বুদ্ধিমত্তায় যথেষ্ট পাকা-পোক্ত। ঐ বয়সেই নূরুল হক খুলনা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'দেশের ডাক'-এর এজেন্ট হয়েছিলো। নূরুল হকই আমাকে দেশের ডাক পত্রিকার গ্রাহক বানায়।

'দেশের ডাক' পত্রিকা তখন সাপ্তাহিকভাবে প্রকাশিত হতো এবং জমজমাটভাবে প্রকাশিত হতো ছোটদের পাতা এবং পরিচালিত হতো ছোটদের আসরও। নূরুল হক আমাকে— একদিকে যেমন— ছোটদের পাতায় লিখতে উদ্বুদ্ধ করতো, তেমনি উদ্বুদ্ধ করতো একটি আসর গড়ে তোলার জন্য।

একসময় আমি 'দেশের ডাক'র নিয়মিত লেখক হয়ে যাই। লেখা যা-ই পাঠাই, তা-ই ছাপা হতে থাকে। একবার একটা দীর্ঘ কবিতা 'হলদে পাখী' পাঠাই। দৈনিক পত্রিকা সাইজের 'দেশের ডাক' এর ছোটদের পাতায় তা দুই কলাম জুড়ে ছাপা হয় এবং পুরো দুই কলামে— একেবারে ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত।

হলদে পাখী ছাপা হবার পর— কিছুদিন যেতে না যেতেই— নূরুল হক খবর দিলো, 'সাহিত্য-সম্পাদক সাহেব তোমার সাথে দেখা করবার জন্য আগামী শুক্রবার আসবেন, বিকেলে আসবেন; তোমাকে অবশ্যই থাকতে হবে। তোমার লেখায় এতোটাই তিনি মুগ্ধ হয়েছেন যে, দেখা না করে ছাড়বেন না। সেই খুলনা শহর থেকে দশ-বার মাইল ঠেংগিয়ে তিনি আসবেন, এতো কষ্ট করে এসে তোমাকে না পেলে ভীষণ দুঃখ পাবেন এবং আমার লজ্জার কোনো শেষ থাকবে না।'

সাহিত্য-সম্পাদক সাহেব নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে আমাদের গ্রামে এলেন। নূরুল হক সেদিন একটা অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করেছিলো।

আমি ছোটবেলা থেকেই লাজুক প্রকৃতির এবং আপত্তিকর রকমের মুখচোরা প্রকৃতির। অনুষ্ঠানের ভেতরে না ঢুকে, দূর থেকে সাহিত্য-সম্পাদক সাহেবকে খুব করে দেখলাম। ভীষণ ভালো লাগলো। কবিদের মতো চুল— লম্বা, গায়ে সাদা পাঞ্জাবী— দীর্ঘ, পরনে সাদা পাঞ্জামা— ঢোলা, চোখে কালো স্ফেমের চশমা— ভারী। ঠিক বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের মতো দেখতে। কথা বলতে দারুণ ইচ্ছে করেছিলো, কিন্তু সংকোচের ঠেলায় পেরে উঠলাম না, পালিয়ে গেলাম।

পরের সপ্তাহে, আমাকে উদ্দেশ্য করে, 'দেশের ডাক'র সাহিত্য-সম্পাদক সাহেব (যাঁর নাম আজ আর কোনোভাবেই মনে করতে পারছি না) ছাপালেন বিশাল এক চিঠি এবং ছোটদের পাতায়। চিঠিতে আমাদের গ্রামের সৌন্দর্যের উল্লেখ থাকলো, সুন্দর অনুষ্ঠানের উল্লেখ থাকলো, নূরুল হকের চমৎকার যত্নের উল্লেখ থাকলো, থাকলো আমাকে না পাওয়ার ভীষণ বেদনার সুদীর্ঘ বর্ণনা;

সেই সঙ্গে থাকলো ‘দেশের ডাক’এ গিয়ে তার সাথে দেখা করার যার-পর-নাই আহ্বান।

প্রকাশিত চিঠিতে ছিলো পরিপূর্ণ আবেগ এবং স্নেহ-মমতা-মাখা প্রাণের উত্তপ্ত স্পর্শ- বিরল হৃদয়ের টান। যে-টান উপেক্ষা করা যায় না, অবহেলা করা যায় না, করা সম্ভবও নয়। সেই জন্যে, কিছুদিন যেতে-না-যেতেই আমি ‘দেশের ডাক’ পত্রিকার অফিসে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলাম। কী যে খুশি হলেন তিনি, কতো যে আনন্দিত হলেন- তা ভাষায় বর্ণনা করতে পারবো না এবং কতোকিছু যে তিনি আমাকে খাইয়েছিলেন সেদিন এবং উপহার দিয়েছিলেন- তার বর্ণনা না হয় না-ই দিলাম। তবে একথা অকপটে স্বীকার করতেই হবে, তার মতো লেখক-দরদী সাহিত্য-সম্পাদক আমি আমার জীবনে কখনো দেখিনি।

শুনেছি, তার বাড়ি সাতক্ষীরায় এবং তিনি বেশ কয়েক বছর আগে ইষ্টেকাল করেছেন। কিন্তু অমর হয়ে আছেন আমার অন্তরের মধ্যখানে- যেখানে লুকিয়ে আছে আমার হৃদয়।

চার. সবুজ কাঁচার আসর ও সরদার আমজাদ ভাই

নূরুল হকের প্রেরণায় এবং বিশেষ করে ‘দেশের ডাক’ পত্রিকার ছোটদের আসরের নানাবিধ খবর পড়ে-পড়ে একটি আসর করার উদ্যোগ গ্রহণ করলাম। আসরের নাম দিলাম ‘সবুজ কাঁচার আসর’। আসরের সঙ্গে যুক্ত করলাম শেখ আবদুর রহমান সাহিদ, মতিয়ার রহমান ফরাজী, আকবর আজাদ, সমীর কুমার বোস, নূরুল হক প্রমুখকে।

প্রতি শুক্রবার বিকেলে আমরা আসর করতাম। আসর করতাম আমাদের গ্রামের হাইস্কুলের খোলামেলা সবুজ এবং উদার চত্বরে। স্বরচিত ছড়া পড়তাম, স্বরচিত কবিতা পড়তাম, স্বরচিত গল্প পড়তাম। অর্থাৎ যে যা লিখতাম- ভালো হোক মন্দ হোক- পড়তাম।

অল্পদিনের মধ্যেই আসর জমে উঠলো। একসময় এমন হলো যে, লেখকদের চেয়ে শ্রোতাদের সংখ্যা হয়ে গেলো অনেক বেশী। বেশীর ভাগ সময়ে, পঠিত লেখার ওপর আলোচনা করতাম আমি, মতিয়ার রহমান ফরাজী এবং শেখ আবদুর রহমান সাহিদ।

আসর সেদিন আরো জমে ওঠতো, যেদিন গলা ছেড়ে গান গাইতো মতিয়ার রহমান ফরাজী কিংবা আকবর আজাদ কিংবা রজ্জা-রজ্জব আলী।

নির্ভুল অথচ পাগল-করা নজরুল-সংগীতের শিল্পী মতিয়ার রহমান ফরাজী, আধুনিক গানের দরাজ কণ্ঠের শিল্পী আকবর আজাদ এবং অদ্ভুত মিষ্টি গলার পল্লীগীতির শিল্পী রজ্জব আলী।

আসরের মাধ্যমে মাঝে-মধ্যে আমরা বিভিন্ন দিবসও পালন করতাম। দিবস পালনের এইসব অনুষ্ঠানে শেখ আবদুর রহমান সাহিদ অসাধারণ বক্তৃতা করতো। বক্তৃতা করতো চমৎকার ভঙ্গিমায়ে, চমৎকার গতিময়তায়, চমৎকার শব্দ-সংযোজনায়— যেনো অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান স্যারের অল্পবয়সী কোনো বক্তৃতার সরাসরি ছাত্র। সুন্দর কবিয়ালী বক্তৃতা করতে পারতো মতিয়ার রহমান ফরাজী। ওজস্বী বক্তৃতা করতে পারতো আকবর আজাদ। কখনো নূরুল হকও বক্তৃতা করতো। সমীর কুমার বোস ছিলো— অত্যন্ত মেধাবী, চুপচাপ স্বভাবের, সাধারণত আলোচনায় থাকতে চাইতো না।

আমরা একবার আসরের উদ্যোগে, একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনের আয়োজন করলাম। সভাপতি করলাম আমাদের গ্রামের সে-সময়ের গ্রাজুয়েট এবং ভাসানী ন্যাপের নেতা সরদার আমজাদ ভাইকে। আমরা কেউ বক্তৃতা করলাম, কেউ কবিতা পড়লাম, কেউ গান গাইলাম। সবশেষে সরদার আমজাদ ভাই উঠে দাঁড়ালেন সভাপতির ভাষণ দেয়ার জন্যে। শুরু করলেন ভাষণ:

ভাইসব, আজ একুশে ফেব্রুয়ারি, আজ একুশে ফেব্রুয়ারি, আজ একুশে ফেব্রুয়ারি...

ধুত্তরি ছাতা আমারে দিয়ে অবেনানে... ..

কথাটি বলেই আমজাদ ভাই বসে পড়লেন। শ্রোতা-দর্শকরা হো-হো করে হেসে উঠলো। আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান শেষের দিকে এসে গাষ্টীর্য হারিয়ে ফেললো। সরদার আমজাদ ভাই লজ্জায় লাল হয়ে গেলেন।

আমাদের সাহিত্য আসরের সংবাদাদী যথাযথভাবে ছাপা হতো এবং ছাপা হতো নূরুল হকের স্বতঃস্ফূর্ত দায়িত্ববোধের কারণে। গভীর মমত্ব ও গহীন আন্তরিকতার কারণে।

সাহিত্য আসরের নানান সংবাদ আমরা পাগলের মতো পড়তাম। সংবাদের মধ্যে আমাদের কারোর নাম দেখলে আনন্দের স্তম্ভ থাকতো না। প্রখ্যাত ছাত্রনেতা সুশান্ত মজুমদারের নাম আমাদের মুখস্থ হয়ে গিয়েছিলো তার ছাত্রনেতা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করার বহু আগে। কেননা ‘দেশের ডাক’র ছোটদের পাতায় তার গল্প প্রায়ই ছাপা হতো। ছাপা হতো তার বাগেরহাট শহরের আসরের নানান খবর। এ-ভাবে আসরের মাধ্যমে পিরোজপুর, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা, যশোর, কুষ্টিয়ার শিশু-কিশোর লেখকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় গড়ে উঠেছিলো, সম্পর্কও গড়ে উঠেছিলো।

গত সাহিত্য-সংখ্যায় প্রকাশিত চারিত্র-পরিচিতি:

এক. কবি মল্লিক আহমদ আলী

কবি মল্লিক আহমদ আলী আমাদের এলাকায় কবি সাহেব হিসেবে সমধিক পরিচিত। মঠবাড়িয়া কে.এম.লতিফ ইনিস্টিটিউশন, পিরোজপুর; বাগেরহাট সরকারী হাইস্কুল; মূলঘর সরকারী হাইস্কুল, ফকিরহাট, বাগেরহাট; সোনাতুনিয়া মাদরাসা, রামপাল, বাগেরহাট; বারুইপাড়া হাইস্কুল, বাগেরহাট প্রভৃতি স্কুল এবং মাদরাসায় প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে শিক্ষকতা করেছেন। শিক্ষকতা করেছেন—অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে— বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে।

ছাত্রজীবনে ভাষাসৈনিক ড. হালিমা খাতুন, কবি আবুবকর সিদ্দিক, গবেষক সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেনের সঙ্গে সাহিত্য-আন্দোলন করেছেন। কবিতার সূত্রে কবি ফররুখ আহমদের সাথেও তার ঘনিষ্ঠতা ছিলো।

কবি মল্লিক আহমদ আলী বাগেরহাটের কৃতিসন্তান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ সরকারের সাবেক রাষ্ট্রদূত জনাব রুহুল আমীন সাহেবের বড় ভগ্নিপতি ও ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির সাবেক অধ্যাপক ইঞ্জিনিয়ার শামীম আহসান খালেদের আব্বা।

কবি মল্লিক আহমদ আলীর প্রকাশিত গ্রন্থ যথাক্রমে ১. রোদ বৃষ্টি ঝড় (কাব্যগ্রন্থ) ২. সোনামনিদের ছড়ার ভুবন (ছড়াগ্রন্থ) ৩. ছড়া পড়ি জীবন গড়ি (ছড়াগ্রন্থ)

দুই. হযরত মাওলানা আবদুল হাই

হযরত মাওলানা আবদুল হাই সাহেবের বাড়ি— যতোদূর মনে পড়ে— বরিশাল জেলায়। পড়াশোনা করেছেন লক্ষ্মীপুর জেলার এক কালের অবিসংবাদিত মাদরাসা— টুমচর মাদরাসায়। মাওলানা আবদুল হাই সাহেব অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বিভিন্ন পরীক্ষায় স্ট্যান্ড করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন তুখোড় ছাত্রনেতা। একদা টুমচর মাদরাসার-ছাত্রসংসদের জি.এস ছিলেন তিনি এবং ইসলামী ছাত্রসংঘের সাথে ছিলেন।

আমাদের গ্রামের মাদরাসা— বারুইপাড়া সিদ্দিকীয়া সিনিয়র মাদরাসার অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক ছিলেন। বর্তমানে তেলীখালী— তুষখালী অঞ্চলের কোন এক মাদরাসায় শিক্ষকতা করছেন। আমাদের অঞ্চলে ইসলামী আন্দোলনের বীজ সর্বপ্রথম তিনিই বপন করেন।

হযরত মাওলানা আবদুল হাই সাহেব আজীবন নিবেদিতপ্রাণ দায়ী— এক অসাধারণ আল্লাহর দিকে আত্মনাকারী মহান ব্যক্তিত্ব।

শাহাবুদ্দীন ভাইয়ের গ্রামের বাড়িতে একদিন

প্রখ্যাত নজরুল গবেষক, সাহিত্য গবেষক শাহাবুদ্দীন আহমদ ভাই জন্মেছিলেন পশ্চিমবঙ্গে। চব্বিশ পরগনায়। বাদুড়িয়া থানার আরজুলা গ্রামে। ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এক জমিদার বাড়িতে। এক সময় সাতক্ষীরায় শাহাবুদ্দীন ভাইদের বিরাট জমিদারী ছিলো।

ক'বছর আগে আমি একটি ইকবাল সেমিনারে যোগ দেয়ার জন্য কোলকাতায় গিয়েছিলাম। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের এ সময়ের চেয়ারম্যান মহোদয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে অনেকের মধ্যে শান্তিনিকেতনের উর্দু এবং ফারসি বিভাগের চেয়ারম্যান সাহেবও ছিলেন। কোলকাতার ইকবাল পর্ষদই এ জবরদস্ত সেমিনারের আয়োজন করেছিলো। আমি গিয়েছিলাম বাংলাদেশের ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা মীর কাশেম আলী ভাইয়ের নির্দেশে।

সেমিনার শেষ হয়ে যাবার পরপরই চব্বিশপরগনার ইসলামী গানের এক শিল্পী এসে হাজির হয়ে গেলো এবং তাদের গ্রামের বাড়ি বেড়াবার দাবি জানিয়ে বললো: আক্কা-আম্মা-ভাই-বোনেরা সবাই আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছে। না গেলে আমি মুখ দেখাতে পারবো না।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম:

কী যে বলো, সবাই আমাকে চেনে নাকি?

আমার বিস্মিত ভাব দেখে চব্বিশপরগনার ঐ শিল্পী খানিকটা বাহাদুরী করে বললো:

আপনার কতো গানই তো ওদের শুনাই, চিনবে না?

সংগঠক, কবি, গীতিকার, সুরকার ও সংস্কৃতিসেবী।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে বললাম:

তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা তো তোমাদের ওদিকেই? নাকি? নিয়ে যেতে পারবে?
দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর করলো: ইনশাআল্লাহ।

ইসলামী গানের ঐ শিল্পী কথা রেখেছিলো। নিয়ে গিয়েছিলো নারকেল বাড়িয়ায়।
বাঁশের কেল্লার স্মৃতিময় কেন্দ্রে, নিয়ে গিয়েছিলো কাছেই চাঁদপুরে। যেখানে
এখনো বাস করছে শহীদ তিতুমীরের বংশধরেরা।

বাঁশের কেল্লার গোটা এলাকা দেখে আসার পর মনটা ছিলো ভারাক্রান্ত।
তিতুমীরের শোকে ভারাক্রান্ত। তবুও রাত পার করে দিয়ে সকালের নাস্তা
করেছিলাম বাদুড়িয়া থানা শহরের একটি হোটেলে।

ইসলামী গানের এ শিল্পীর সঙ্গে নারকেল বাড়িয়া আসার পথেই কথা হয়েছিলো
জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের বাড়ি দেখতে যাবার ব্যাপারে। তো
হোটেল থেকে নেমেই হাঁটছি দু'জনে। কথা বলছি দু'জনে যে, কিভাবে যাবো
আমরা। হঠাৎ আমি জিজ্ঞাস করলাম:

তুমি কি আরঙ্গলা নামে কোনো গ্রামের কথা শুনেছো কখনো? যদুর মনে
পড়ছে- এই চব্বিশ পরগনারই কোনো গ্রামের নাম হবে।

ও কলহাস্যে বলে উঠলো:

কেনো বলুন তো?

ওর হাসিটা ইতিমধ্যে রীতিমতো অট্টহাস্যে পরিণত হয়েছে। বিব্রতবোধ করতে
লাগলাম। তবু বললাম:

আমাদের ঢাকায় একজন নজরুল গবেষক আছেন। বিশাল মাপের গবেষক-
শাহাবুদ্দীন আহমদ। নাম শুনেছো কখনো? তাঁর মূল বাড়ি ঐ আরঙ্গলা গ্রামে।

আমার কথা শুনে ও একবারে থমকে দাঁড়িয়ে বললো:

চলুন আগে আরঙ্গলাতে যাই, তারপরে অন্যসব হবে তখন। এখানে থেকে
কয়েক টাকা রিকশা ভাড়া মাত্র। হেঁটেও যাওয়া যায়।

আমি লাক দিয়ে বুকে চেপে ধরলাম ওকে। বললাম:

চলো, চলো, চলো, এক্ষণই চলো। আল্লাহ আকবার হেঁটেই যাবো।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে আরঙ্গলায়, শাহাবুদ্দীন ভাইদের গাঁয়ে পৌঁছে গেলাম।

সুন্দর সাজানো-গোছানো একগ্রাম আরঙুল্লা। প্রথম দেখাতেই তার প্রধান প্রধান অংশ ঐতিহ্যময় শহরতলীর মতো মনে হবে। কী এক আবেগে আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো অশ্রু-অগোচরে।

শাহাবুদ্দীন ভাইদের বাড়ির সীমানার মধ্যে ঢুকলাম। বেশ কয়েকটা বড় বড় ধানের গোলা। বাইরের উঠানের গা ঘেঁষে। তারপরেই পুরনো আমলের ভারিকি মেজাজের দালান-কোঠা এবং অন্যান্য বাড়িঘর।

আমার সঙ্গী-শিল্পী খানিকক্ষণের মধ্যে শাহাবুদ্দীন ভাইদের মূল দালান খুঁজে বের করলো এবং ঢুকে পড়লো বাড়ির ভেতরে। দেরি হলো না খুব একটা। সাক্ষাৎ এক ইরানী মেয়ে-১৬ না হয় ১৭ বয়স হবে। ওকে দেখে আমার এক খালার কথা মনে পড়লো। সাদর অভ্যর্থনা জানালো এই বলে:

শাহাবুদ্দীন সাহেব আমার মেজো আক্কা, বাংলাদেশের কবি আপনি? আসুন, ভেতরে আসুন। আক্কা এক্ষণই এসে পড়বেন।

আকাশে তখন মেঘের গর্জন। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ভয়াবহ একটা সময়। এরই মধ্যে অপূর্ব সুন্দর এক মধ্যবয়সী নায়ক- কয়েকটা বড় বড় কাঁচা আম হাতে নিয়ে- পড়িমরি করতে করতে ঘরে ঢুকলেন। আমরা তখন খাচ্ছি।

কোনো রাখঢাক না-করে ঐ মেয়েটিই সোজাসুজি বলে উঠলো:

মেঝে আকার ভক্ত। বাংলাদেশের কবি। দেখা করতে এসেছেন।

ভদ্রলোক নিজেকে সামলাতে সামলাতে বলতে লাগলেন:

শাহাবুদ্দীন ভাই আমাদের মেঝো ভাই। আমি ছোটো। ওঁরা সব কেমন আছেন? কোলকাতা হয়ে এলেন নাকি? নাকি সাতক্ষীরার পথে।

দীর্ঘদেহী মহাপুরুষের মতো মানুষটাকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলাম:

তিতুমীরের বাঁশের কেলা দেখার একটা স্বপ্ন ছিলো। সেটা দেখেই বাদুড়িয়ায় এসে গুনলাম- শাহাবুদ্দীন ভাইদের বাড়ি একেবারেই কাছে। তাই আসা। ড. শহীদুল্লাহ সাহেবের গ্রামেও যাবার প্রবল ইচ্ছে আছে।

আমার কথা শেষ না হতেই শাহাবুদ্দীন ভাইয়ের ছোটো ভাই গিয়াসউদ্দীন না না করে বললেন:

থাকুন না একটা রাত। কথাবার্তা তো কিছুই হলো না।

উঠতে ইচ্ছে করছিলো না। সত্যিসত্যিই মনটা থেকে যেতে চাচ্ছিলো। তবুও না উঠে উপায় নেই। আরো বেশকিছু জায়গায় যাবার তাড়া। তাই প্রসঙ্গ পাঁচটার জন্য বললাম।

আপনাদের বাড়িতে তো অনেক জমিজমা, ভালোজাতের আমগাছ হবে কী পরিমাণ? একটু হাসলেন আমার কথা শুনে। তারপর বললেন:

এই হয়েছে এক ঝামেলা। নানান কারণে রাজনীতি করতে হয়। ভূত তাড়িয়ে বেড়াই। পাহারা দেবার জন্য একটা কাজের ছেলে আছে। তা একশ'র মতো হবেই। একা পেরে ওঠে না।

আমার আর জানতে বাকী থাকলো না যে, শাহাবুদ্দীন ভাইদের জায়গা-জমি এখনো কি পরিমাণ আছে। তাই মনটা আবারো কেঁদে উঠলো। বলতে লাগলো: সোনার চামচ মুখে নিয়ে যে মানুষটির জন্ম হয়েছিলো- শুধু অটল আদর্শবাদী হবার কারণে কী অমানুষিক কষ্টই না করতে হচ্ছে আজো তাঁকে।

ইতোমধ্যে আম-ঝাড়া-ঝড় শুরু হয়ে গেলো। চতুর্দিকে কড়কড়-মড়মড় শব্দ শোনা যাচ্ছে। উঠোনের এলাকায় দেখা যাচ্ছে বড় বড় ফোঁটার আলপনা। বৃষ্টির দৃষ্টিজুড়ানো জলছাপ। আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

ঐ অবস্থায় গিয়াসুদ্দীন ভাইও বেরিয়ে পড়লেন আমাদের সঙ্গে। বাড়ির ভেতরের রাস্তা দিয়ে আমরা এসে উঠলাম বড় রাস্তায়। পাকা পথে। পাকা পথের ওপারে দেখলাম বিরাট বিল। আদিগন্ত ধানের ক্ষেত।

আমরা রিকশার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। আদিগন্ত ধানের ক্ষেতের দিকে আঙুল তুলে গিয়াসুদ্দীন ভাই বললেন;

ঐ বিলেই আমাদের ক্ষেত, আমাদের খামার।

রিকশা এসে গেলো। সালাম বিনিময় করে আমরা উঠে পড়লাম। আম-ঝাড়া-ঝড় বৃষ্টির মধ্যেই কি এক কষ্টে আমার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগলো। ভাবতে লাগলাম- এক খাঁটি মুসলমানের মতো জীবনযাপনের স্বপ্ন নিয়ে যিনি একদিন পশ্চিমবঙ্গের ভিটেমাটি ছেড়ে পূর্ব বাংলার মুহাজির হয়েছিলেন- চলে যাবার সময় সেই শাহাবুদ্দীন ভাইয়ের কতোই না কষ্ট হয়েছিলো।

ফুলেফুলে কাঁদতে লাগলাম। বৃষ্টি তখন আর বৃষ্টি নেই। রীতিমতো বর্ষা হয়ে গেছে। আমার সঙ্গী শিল্পী জামানও যেনো কোনো এক বেদনায় নির্বাক হয়ে আছে।

উপশমহীন এক কষ্টের স্মৃতি

সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিচরণ করতে গিয়ে আমি অর্জন করেছি বেশ কয়েকটি কষ্টের স্মৃতি। মরহুম আব্বাস আলী খান সাহেবকে হারানোর কষ্টের স্মৃতি, মরহুম কবি আফজাল চৌধুরী স্যারকে হারানোর কষ্টের স্মৃতি, মরহুম সিদ্দিক জামাল ভাইকে হারানোর কষ্টের স্মৃতি, মরহুম বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী স্যারকে হারানোর কষ্টের স্মৃতি, মরহুম সৈয়দ আলী আহসান স্যারকে হারানোর কষ্টের স্মৃতি, শিল্পী আব্দুল মান্নান আরা আপাকে হারানোর কষ্টের স্মৃতি।

শিল্প-সাহিত্য-সাংস্কৃতির অঙ্গনের আমি একজন সামান্য কর্মী। একজন সামান্য এবং অনুপ্রবেশযোগ্য কর্মী হলেও আমি ঐসব অসামান্য মানুষের অফুরন্ত স্নেহ পেয়েছিলাম- ভাবতেও অবাক লাগে। আবার বুকটা হাহাকারও করে ওঠে। হাহাকার করে ওঠে তাঁদের স্নেহ, তাঁদের আদর, তাঁদের সোহাগ পাবার জন্যে। না, সে-পাওয়া আর কখনও, কোনো দিনও, কোনো কালেও হয়ে উঠবে না। কেবল স্মৃতির কান্নায় ভরে যাবে মন।

দুই.

কিন্তু শিল্পী মহিউদ্দীন বাকী এবং কবি গোলাম মোহাম্মদ ভাইকে হারানোর কষ্ট অন্য রকম। অন্য রকম উপশমহীন বেদনায় জর্জরিত এবং ক্ষত-বিক্ষত স্মৃতির মতো অসহায়। মাঝে মাঝে মনে হয়- অতিশয় ছোট আমার এ বুকটা কখন বুঝি চোঁচির হয়ে যায়।

তিন.

অনেকগুলো বছর হয়ে গেলো মহিউদ্দীন বাকী আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। চলে গেছে অল্প বয়সে। সেই যে চলে গেছে আর আসেনি, আর গান শোনার বায়না ধরেনি, আর গান শেখার জন্যে দিনের-পর-দিন জ্বালাতন করেনি।

চার.

সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে আমি ঢাকায় আসি। ঢাকায় আসি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্রথম সভাপতি মীর কাশেম আলী ভাইয়ের আহ্বানে। এসেই সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠার পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করি। এই প্রস্তুতিকালে বাংলাদেশের যে-ক’টি শহর আমি সফর করি, তার মধ্যে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা এবং বরিশালের সাংস্কৃতিক তৎপরতা ছিলো নজর কাড়ার মতো।

ডা. আবদুল জলিল ভাই অত্যন্ত সংস্কৃতিমনস্ক ছাত্রনেতা ছিলেন। ছাত্রনেতা ছিলেন বরিশালের। পড়তেন বরিশাল মেডিকলে। তারই একান্ত আগ্রহে আমি প্রথম বরিশাল যাই। বরিশাল যাই সাংস্কৃতিক সফরে।

এরপর থেকে আমি ক্রমাগতভাবে বরিশালে গিয়েছি। বরিশালে গিয়ে সেই তখন থেকেই যেমন আমি অসংখ্য সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রেমিক দায়িত্বশীল পেয়েছি, তেমনি পেয়েছি অনেক-অনেক মেধাবী গীতিকার-সুরকার শিল্পীদের।

গীতিকারদের মধ্যে পেয়েছিলাম আমিনুল ইসলাম ভাইকে বিশেষভাবে। আমিন ভাই একসময় বরিশাল-জেল্লা সভাপতি ছিলেন এবং ভালো গান লিখতেন, সুরও করতে পারতেন। অসাধারণ শিল্পী হিসেবে পেয়েছিলাম সৈয়দ মজুর ভাইকে। কতোই বা বয়স হবে তখন তার। আমার লেখা এবং সুর করা একটি গান- ‘দাও খোদা দাও হেথায় পূর্ণ ইসলামী সমাজ’- যখন সে গাইতো পরম পরিতৃপ্তিতে আমার সমস্ত অস্তিত্ব ভরপুর হয়ে যেতো।

কিন্তু আমি মহিউদ্দীন বাকীকে পেয়েছিলাম অন্য এক পরিচয়ে। পেয়েছিলাম বিনয়ী হিসেবে, পেয়েছিলাম নিবেদিত প্রাণ হিসেবে এবং পেয়েছিলাম এক মহৎ হৃদয়ের অধিকারী মানুষ হিসেবে। মহিউদ্দীন যে হৃদয়কে একান্তভাবে ধারণ করেছিলো, সে হৃদয়, বরিশালের সেইসব নদীর মতো, যেসব নদীর সম্পর্ক কেবল সমুদ্রের সঙ্গে।

মনে পড়ছে, বরিশালে গিয়েছি, কোনো এক প্রোত্খামের শেষে, মহিউদ্দীন পাশে এসে কানে-কানে বলছে- ‘আজকে আমাদের বাসায় যেতেই হবে, আব্বা-আম্মা আপনার গান শুনতে চেয়েছেন। ‘আমি বললাম, ‘জলিল ভাই অনুমতি দিলেই যাওয়া যাবে, নয়তো নয়।’ জলিল ভাই শেরপুর জেলার মানুষ, উদার প্রকৃতির মানুষ, হাসতে-হাসতে বললেন, ‘মহিউদ্দীনদের বাড়িটা আমাদের বাড়ি, যান, খালাম্মারা খুশি হবেন’।

সেদিন খালাম্মারা খুশি হয়েছিলেন কিনা জানি না তবে আমি যে খুব খুশি হয়েছিলাম এবং চিরকালের জন্য খুশি হয়েছিলাম, তা আজো অনুভব করতে পারি। অনুভব করতে পারি এই কারণে যে, বরিশাল গেলে এখনও মহিউদ্দীনদের বাসায় যাবার জন্য মনটা ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

পাঁচ.

বরিশালের হেরাররশি শিল্পীগোষ্ঠীর জন্য গভীর আন্তরিকতা লক্ষ্য করেছি- ডা. জলিল ভাইয়ের মধ্যে, যা সত্যি-সত্যিই তুলনাহীন। সাংগঠনিক কাজে ঢাকায় এলে, আমার কাছ থেকে গান নিয়ে যাবার জন্যে পেছনে লাগতেন। বাধ্য হয়ে ক্যাসেট করে দিতাম নতুন কোনো গান।

কিন্তু হেরাররশির জন্য গান লিখে যাবার ব্যাপারে তুলনাহীন ধৈর্যের অধিকারী ছিলো মহিউদ্দীন বাকী।

আমি তখন আলুবাজার মেসে থাকি। আলুবাজার মেসই তখন কেন্দ্রীয় মেস। সদস্য-সম্মেলন হয়ে গেছে। হঠাৎ দেখি মহিউদ্দীন বাকী। জিজ্ঞেস করি, ‘কি ব্যাপার, মহিউদ্দীন ভাই যে, ‘জি. মল্লিক ভাই, সম্মেলনে গাওয়া নতুন গানগুলো নিয়ে যাবার জন্যে থেকে গেলাম’।

সে-বছর অন্তত এক সপ্তাহ ঘুরেছিলো বাকী আমার পেছনে। কিন্তু গান না নিয়ে সে বরিশাল যায়নি।

এই যে, এক সপ্তাহ সে আমার পেছনে লেগেছিলো এবং আমি তাঁকে সময় দিতে পারছি না, তাতে কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও তার চোখে-মুখে বিরক্তির চিহ্ন মাত্র দেখিনি। বরং তার আচরণের মধ্য দিয়ে আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি-আমি গান দিচ্ছি না বলে সে আদৌ অসন্তুষ্ট নয়, আমার সাথে থাকতে পারছে, আমার গানের ব্যক্ততা দেখতে পারছে তাতেই সে পরম পরিতৃপ্ত।

বরিশালের হেরাররশির প্রাক্তন পরিচালক ডা. সিরাজ, প্রাক্তন পরিচালক আবদুল হাই, সৈয়দ মজুর খুব বড় মাপের শিল্পী-সন্দেহ নেই। কিন্তু মহিউদ্দীন বাকী যে খুব মেধাবী এবং নিরাপোষ- আদর্শবাদী-পরিশ্রমী শিল্পী ছিলো তাতেও কোনো সন্দেহ নেই।

মানুষকে কাছে টানবার এক অসম্ভব গুণ আল্লাহ তাঁকে দিয়েছিলেন। অনেকটা তারই জন্যে তাদের ফকিরবাড়ির বাসায় ইসলামী আন্দোলনের ছাত্র-কর্মীরা ভিড় জমাতো। মুখ্য দৃষ্টিতে আমি যখন তার প্রতিটি তৎপরতার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। তাকিয়ে থাকতাম কখনো- কখনো। মনে হতো- ইসলামী আন্দোলনের জন্য, ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জন্য দরকার হলে সে তার কলিজাটাকেও বের করে দিতে দ্বিধা করবে না।

ছয়.

আমি আমার শিল্পসাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক জীবনে দেখেছি-শিল্পী-সাহিত্যিক পাওয়া যায় তো আদর্শের সৈনিক পাওয়া যায় না। আবার আদর্শের সৈনিক

পাওয়া যায়তো শিল্প-সাহিত্যের যথার্থ সমঝদার পাওয়া যায় না। অথচ মহিউদ্দীন বাকী ছিলো এ ক্ষেত্রে এক দুর্লভ দৃষ্টান্ত। সে একই সঙ্গে ছিলো শিল্পী ও আদর্শের সৈনিক।

বরিশাল শহরের সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে মহিউদ্দীন বাকীর নাম উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। একটি মানুষ এক সঙ্গে কতো দিক সামাল দিতে পারে এবং কতো দিক সামাল দেয়া সম্ভব, তা আমি আমার চেয়েও বয়সে ছোট মহিউদ্দীন বাকীর কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে আবিষ্কার করতে পেরেছি।

অনেক-অনেক প্রেরণার মধ্যে মহিউদ্দীন বাকীও আমার বুকের মধ্যে অন্য একটি প্রেরণা হয়ে দিশারী নক্ষত্রের মতো দেদীপ্যমান। আমি তাঁকে ভুলতে পারি না, ভোলা সম্ভব হয় না।

সাত.

ঢাকায় বসে আমি তার মৃত্যুর খবর পেয়েছিলাম। সে-খবর বজ্রপাতের মতো। যে-খবর অস্তিত্বকে বিপন্ন করার মত অসহনীয় যন্ত্রণায় জর্জরিত। মহিউদ্দীনকে হারানোর বেদনায় আমি যখন কাতর হয়ে পড়ি, তাঁকে নিয়ে লেখা একটি গান গেয়ে আমি আজো হৃদয়ের অব্যক্ত জ্বালা নির্বাপনের চেষ্টা করি-

সেই অভিমানী মান করে গেছে

গান আর সেতো কভু গাবে না,

জনসভা জলসায়

মাহফিলে মাজলিসে

তারে আর কেউ খুঁজে পাবে না।

কিন্তু উপশমহীন এক কষ্টের স্মৃতির কতোটুকুই বা সহনীয় করে তুলতে পারে একটি স্বরচিত গান কিম্বা একটি স্বসুরারোপিত বিরহ-বিধুর পঙ্ক্তিমাল।

শহীদ মালেক আজো আমায় ডাকে

একটা প্রবাদ আছে- ছোটবেলার জ্ঞান অর্জন হচ্ছে : পাথরে খোদাই করার মতো
আর বড়ো বয়সের জ্ঞান অর্জন হচ্ছে: পানিতে খোদাই করার মতো ।

সত্যিই প্রবাদটার একটা তাৎপর্য আছে; আসলে ছোটবেলায় কোনো-কোনো
ঘটনা এমন- যা কোনোভাবেই ভোলা যায় না ।

মালেক ভাইয়ের শাহাদাতের ঘটনা- আমার জীবনে পাথরে খোদাই করা ঘটনার
মতো; কোনোভাবেই তা ভুলে যেতে পারিনি । বরং ক্রমাগতভাবে সে-ঘটনা
আরো স্পষ্ট হয়েছে ।

দুই.

মনে আছে, স্পষ্ট মনে আছে, তখন বারুইপাড়া সিদ্দিকিয়া সিনিয়র মাদরাসায়
পড়ি- এই মাদরাসার স্বনামধন্য ছাত্র আব্দুল্লাহ দেলওয়ার হোসাইন সাইদী-
১৯৬৯ সাল । তারিখটা ১৬ আগস্ট হবে । ক্লাস করছি, সকালের দিক, হঠাৎ
বাগেরহাট থেকে খবর এলো- আবদুল মালেক ভাইকে নির্মমভাবে হত্যা করা
হয়েছে ।

সে-দিন কাউকে-কিছু-না বলে কাঁদতে-কাঁদতে মাদরাসা থেকে বেরিয়ে
গিয়েছিলাম আর মনে-মনে বলছিলাম- আজ ইসলামের জন্যে শহীদ হবার কথা
মাদরাসা ছাত্রদের সেখানে শহীদ হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সুতরাং এখন
থেকে জানবাজি রেখে কাজ করবো, কোনো বাধায় আর পিছপা হবো না ।

সত্যি কথা বলতে কি মালেক ভাইয়ের শাহাদাতের ঘটনায় শুধু আমি নই, আমাদের বারুইপাড়া শাখার সবাই ঝড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লাম ইসলামী আন্দোলনের সামগ্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে।

ঝাঁপিয়ে পড়লো আশরাফ ভাই, তালেব ভাই, কামাল ভাই, মুজিব দাদা। সেই যে ঝাঁপিয়ে পড়লো তারা, আর কি পারলো জেহাদের ময়দান ছেড়ে যেতে? শুধু আশরাফ ভাই, তালেব ভাইয়েরা কেনো, আমাদের এলাকার অনেক ছাত্রই গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলো রাতারাতি।

আমাদের এ-অঞ্চলে সব সময়ই ফুরফুরা-পীর- সিলসিলার প্রভাব ছিলো, তাঁরাসহ সব ইসলাম পন্থীরা সেদিন থেকে, সেই শাহাদাতের ঘটনা শোনার দিন থেকে ইসলামী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেন। তাঁদের সেই সহানুভূতি আজো আছে।

হ্যাঁ, আশরাফ ভাইদের কথা বলছিলাম। আশরাফ ভাই এখন একটি হাইস্কুলের হেড মণ্ডলানা এবং ফকিরহাট থানা জামায়াতের সেক্রেটারি; তালেব ভাই খুলনায় আছেন, একটি হাইস্কুলের খ্যাতিমান শিক্ষক। কামাল ভাই একদা মক্কা-জামায়াতের দায়িত্বে ছিলেন- সদ্য এলাকায় ফিরেছেন। মুজিব দাদা এই সেদিনও বাগেরহাট জেলা জামায়াতের আমীর ছিলেন, বারুইপাড়া মাদরাসার সুদক্ষ প্রিন্সিপাল হিসেবে তাঁর খ্যাতির অন্ত নেই।

এ-কথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, মালেক ভাইয়ের শাহাদাতের আগে মুজিব দাদারা- আমরা মালেক ভাইকে খুব বেশি যে চিনতাম, তা না। কিন্তু তাঁর শাহাদাতের পর তিনি হয়ে গেলেন আমাদের নিত্য-আলোচ্য-বিষয়, প্রতিদিনের অনুপ্রেরণা।

তিন.

মালেক ভাইয়ের শাহাদাতের পর তাঁকে জানবার জন্যে আমার ব্যাকুলতার শেষ ছিলো না। সম্ভবত এই ব্যাকুলতা আল্লাহ কবুল করেছিলেন, মালেক ভাইকে নিয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন রচনা এবং সংকলন কিভাবে-কিভাবে যেনো আমার হাতে চলে আসতো। এই ব্যাপারে সিদ্দিক জামাল ভাই এবং আনসার উদ্দীন হেলাল ভাইয়ের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে মতিয়ার রহমান খান ভাই-কে।

সিদ্দিক জামাল ভাই ছিলেন আমাদের জেলা-দায়িত্বশীল। প্রায়ই আমাদের শাখায় সফরে আসতেন। পরে শুনেছি- আমাদের শাখাটি সম্ভাবনাময় হবার কারণে, সরাসরি জেলাই তত্ত্বাবধান করতো।

সিদ্দিক জামাল ভাইয়ের দারসে কোরান ছিলো অসাধারণ এবং মমতাময়। তাঁর আলোচনা ছিলো আবেগপূর্ণ ও তথ্যবহুল। সেই সব দরসে এবং আলোচনায় মালেক ভাইয়ের কোনো-না- কোনো প্রসঙ্গ থাকতোই।

সিদ্দিক জামাল ভাই একদিকে আমার দায়িত্বশীল, অন্যদিকে আত্মীয়। সেই কারণে, তাঁর সাথে ওঠা-বসার একটি বাড়তি সুযোগ ছিলো আমার। এই ওঠা-বসার সময়টিতে, প্রায় এক অদ্ভুত আন্তরিকতায় তিনি শহীদ মালেকের প্রসঙ্গ টানতেন।

তুখোড় বক্তা ছিলেন আনসার উদ্দীন হেলাল ভাই, অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন মতিয়ার রহমান খান ভাই। মনে পড়ে- তাঁদের আগুনঝরা বক্তৃতার প্রবলতর প্রসঙ্গ ছিলেন মালেক ভাই। ঠিক এইভাবে তাঁদের মাধ্যমে পেতাম মালেক ভাই সম্পর্কিত প্রকাশনা। এইসব প্রকাশনা বারবার পড়তাম। বহুবার পড়তাম। পড়তাম আর পড়তাম। তৃষ্ণা মিটতো না তবু।

হঠাৎ একবার হাতে এলো- চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত ‘শহীদ আবদুল মালেক স্মৃতি সংখ্যা’। আকাশের চাঁদ পেলাম যেনো। সংখ্যাটির প্রতিটি লেখা আমাকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিলো। সম্ভবত এই সময় আমি প্রায়ই মালেক ভাইকে স্বপ্নে দেখতাম। স্বপ্নে দেখবো না কেনো? শহীদ আবদুল মালেক স্মৃতিসংখ্যায় প্রকাশিত আবু নাসের মুহাম্মাদ আবদুজ্জাহের ভাইয়ের লেখা পড়ে- ঐ সময় আমি- হাউ-মাউ করে কাঁদতাম। কখনো কখনো কাঁদতে-কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়তাম।

এক সময় এমন হলো যে, চলনে-বলনে-জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মালেক ভাই স্বপ্ন, মালেক ভাই বাস্তব হয়ে গেলেন।

মালেক ভাই এই যে স্বপ্ন হলেন, এই যে বাস্তব হলেন, তাতে কিন্তু লাভই হলো। আত্মগঠনে যত্নবান হলাম, যত্নবান হলাম কোরানকে জানার জন্যে, রাসূলে খোদাকে জানার জন্যে। যত্নবান হলাম শ্রমে, ত্যাগে, সহনশীলতায়। সুতরাং যথার্থ অর্থেই মালেক ভাই শহীদ হয়ে গিয়ে আল্লাহর দীন-কায়েমের কাজকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিতে শেখালেন, সবচেয়ে বড় ত্যাগ এবং কোরবানীর জন্যে প্রস্তুত থাকতে শেখালেন।

চার.

একবার এক কাজে মালেক ভাইয়ের জেলা শহর বগুড়ায় যাওয়ার সুযোগ হলো। সেখান থেকে মালেক ভাইয়ের গ্রামের বাড়ি যাবারও সুযোগ হলো। এই সুযোগটা

করে দিলেন মালেক ভাইয়ের আপন ভাইপো- তৎকালীন বগুড়া জেলা সভাপতি- আবদুল বাসেত।

শহীদ মালেক ভাইয়ের গ্রামে গিয়ে মনটা যেনো জুড়িয়ে গেলো।

কিছুক্ষণ আলাপ করার সুযোগ হলো মালেক ভাইয়ের ভাইয়ের সঙ্গে। কিন্তু আলাপ ছিলো মর্মস্পর্শী। মালেক ভাইয়ের ভাই বলেছিলেন :

‘আম্মা মালেককেই সবচেয়ে ভালোবাসতেন। সেই মালেকের শাহাদাতের খবরটা- আমাদের না জানিয়ে হঠাৎ করে একজন-আগ-পাছ না ভেবে আম্মাকে দিয়ে ফেলে। আম্মা বুকে প্রচণ্ড আঘাত পান এবং বলে ওঠেন- আমার মালেককে তো কোনোদিন একটা পাটকাঠি দিয়েও মারিনি আমি, হায়! আমার বাছাকে নির্মমভাবে কে খুন করলো। আমার বাছা কতো-না-কষ্ট পেয়েছে।

আম্মার ওই বুকের ব্যথা আমৃত্যু ছিলো।

ঐ ব্যথা আর ভালো হয়নি কোনোদিন। ঐ ব্যথাই এক সময় মারাত্মক আকার ধারণ করে। আম্মা মারা যান ঐ ব্যথা নিয়েই।

মালেক ভাইয়ের আম্মা এক আবেদা মহিলা ছিলেন। এলাকার বহু মেয়েকে তিনি কোরান শিখিয়েছিলেন এবং বড়-বড় জায়গায় তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। মালেক ভাইয়ের আব্বা কোনো সিলসিলার লোক ছিলেন না। কিন্তু এক-এক মসজিদে এক-এক দিন জুমা পড়তেন তিনি এবং জুমার আগে খুতবা দিতেন, বক্তৃতা করতেন। তিনি ছিলেন এলাকার এক সম্মানিত-শিক্ষিত মুরবি।

ঐসব খবর জানার পর থেকে শহীদ আবদুল মালেক ভাই আরো আমার প্রতিদিনের অনঙ্গ অনুপ্রেরণা হয়ে আছেন।

সেই সে ঈদের দিনগুলো

আমি জন্মেছিলাম বাগেরহাটের পশ্চিম-উত্তর প্রান্তের এক নিভৃত গাঁয়ে। ড. নীলিমা ইব্রাহিমের গ্রাম আর আমাদের গ্রামের মাঝখানে মাত্র ছোট দু-টো গ্রাম। আমাদের গ্রামের নাম বারুইপাড়া, ড. নীলিমা ইব্রাহিমের গ্রামের নাম মূলঘর, মাঝখানে ছোট দু-টো গ্রামের নাম রাজপাট এবং সোনাখালী।

আমাদের গাঁয়ের প্রকৃতি এবং পরিবেশ আজো আমাকে ভীষণভাবে টানে। আমাদের গাঁ অর্থাৎ বারুইপাড়ার দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে বয়ে গেছে প্রান্তহীন শুভ্র শাড়ীর মতো সুন্দর একটা নদী। নদীর দুই ধারে শাড়ীর পাড়ের মতো ঘনসবুজের গ্রাম। কারো নাম শোতাল, কারো নাম কাটাখালি, কারো নাম বাগদিয়া, কারো নাম কাঁঠালতলা, কারো নাম পাইকপাড়া, কারো নাম কোমরপুর, কারো নাম মশিদপুর, কারো নাম যাত্রাপুর।

আমাদের গাঁয়ে ছিলো প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড বৃক্ষ— কিছু তো আজো আছে। সবচে' বড় বৃক্ষটি— বিশাল মহীকুহট— বহাল তব্বিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এখনো। বৃক্ষটি এতো বিশাল যে, একটা বাজারের প্রায় অর্ধেকটা তার ছায়ার নিচে জমজমাট। এই ধরনের গাছকে আমাদের অঞ্চলে বলে ফুল-গাছ। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই ধরনের গাছকে শীল-কড়াইও বলে; ইংরেজি নাম 'রেইন-ট্রি'।

আমাদের গাঁয়ের বাজারের ঐ ফুল-গাছের নীচেই সাধারণত রাজনৈতিক সমাবেশ হয়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। কবি-ঔপন্যাসিক সোলায়মান আহসান ভাইকে একবার আমরা ঐ গাছের নীচে বারুইপাড়া ইসলামী সাহিত্য সমিতির পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দিয়েছিলাম। ইনকিলাবের সাহিত্য সম্পাদক হাসনাইন ইমতিয়াজ ভাইয়ের সাথে ২৫/৩০ বছর আগে, ঐ ফুল-তলাতেই আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

তিনটে ফুটবল খেলার মাঠ, দশটা মসজিদ, একটা ফাজেল মাদরাসা, একটা হাইস্কুল, একটা প্রাইমারি স্কুল এবং একটা কিন্ডারগার্টেন স্কুল রয়েছে আমাদের গ্রামে। আমি আমার গ্রামের মাদরাসায় ফাজেল পর্যন্ত লেখাপড়া করেছি।

দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী এম.পি তিনিও- ঐ মাদরাসারই ছাত্র ছিলেন এবং তখনো তিনি জনপ্রিয় মানুষ ছিলেন, জনপ্রিয় বক্তা ছিলেন।

ছাত্র ছিলাম মাদরাসার। কিন্তু ফুটবল খেলার প্রতি এক অপ্রতিরোধ্য টান ছিলো আমার। তর সইতো না বিকেল পর্যন্ত। দুপুর গড়াতেই মাঠে গিয়ে হাজির হতাম। খেলতাম লেফট হাফে। ডান পায়ের চেয়ে বাম পায়ে আমার শক্তি বেশী ছিলো বলে, যতোদিন খেলেছি লেফট হাফেই খেলেছি। আমার কাজ ছিলো, বল টেনে-টুনে গোল-দাতা-খেলোয়াড়ের পায়ে ফেলে দেয়া এবং কখনো-কখনো গোল দেবার চেষ্টা করা কিন্তু গোল খুব কমই দিতে পারতাম। বরং গোলের বল জোগান দেবার ব্যাপারে আমার ফলপ্রসূ প্রচেষ্টা থাকতো বেশী। আজো তাই রসিকতা করে বলি- খেলতাম তো ভালো কিন্তু গোল দিতে পারতাম না, পড়তাম তো ভালো কিন্তু ভালো সার্টিফিকেট জোগাড় করতে পারতাম না। জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখি- ঐ একই দৃশ্য; জোগান দিয়ে গেলাম ভালো, জুটলো না কিছুই।

সকালের দিকে মাদরাসার ক্লাসে অংশ নিয়ে পেতাম অনেক-অনেক বন্ধু; বিকেলের দিকে খেলার মাঠে গিয়েও পেতাম অনেক-অনেক বন্ধু। আমাদের গাঁয়ের হাট বসে সোম এবং বৃহস্পতিবার। ঐ দু-দিন খেলা হতো না বলে বাজারের ঘাটের বড়-বড় নৌকোয় বসতো গানের আসর। সুতরাং ছোটবেলা থেকে সামষ্টিক-জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। যদিও অন্তরের অভ্যন্তরে আমি একটি নির্জনতাপ্রিয় অস্তিত্ব অনুভব করে এসেছি। সে-কথা না-হয় অন্য কোনো দিন লেখা যাবে। আজ না।

মূলত আমি যতোটা-না-ছিলাম পারিবারিক- ছোটবেলা থেকে- তারচে' সামষ্টিক অথবা সামাজিক ছিলাম অনেক বেশী। ঈদের দিন এলে, এই সামষ্টিকতা পরিব্যাপ্তি পেতো আরো-আরো।

ঈদের দিন এলো তো আনন্দের সীমা থাকলো না। আজান দিয়ে ফজরের নামাজ পড়তাম। তারপর বেলা উঠতে-না-উঠতেই কেশব রায়ের পুকুরের দিকে ছুট। তারপর দল বেঁধে গোসল। তারপর পড়ি-মরি-মরি করে বাড়ি এসে বসে পড়তাম রান্নাঘরের পিঁড়িতে। মা থাল ভরে শিনি রেখেছেন। 'মিটের শিনি'। [খেজুরে গুড় দিয়ে রান্না করা শিরনিকে আমাদের অঞ্চলে ঐ-রকমই বলে।] তখনও ধোঁয়া উঠছে। তখনো গরম। বিস্মিল্লাহ বলে শুরু না-করে পারতাম না। ঢোক গেলা হয়ে যেতো কয়েকবার।

হ্যাঁ শিনি, সেকি শিনি! এমন সুগন্ধ-সুঘ্রাণ যে, মানুষও মৌমাছি হয়ে যায়। এই শিনি আর কম খাওয়া সম্ভব। গাদিয়ে-পালিয়ে খেতে থাকতাম। মা বলতেন, 'নে, অইছে, এ্যান্নে যা তাড়াতাড়ি, নাহলি তো নামাচ পাবিনানে।'

ছোটবেলায় মাদরাসায় পড়তাম তো গায় দিতাম লম্বা-জামা। হাঁটুর-চার-আঙুল-সমান-নীচে পর্যন্ত। মাথায় দিতাম গোল টুপি। এই পোশাকই ঈদের সময় নতুন-নতুন পেতাম।

মা-র তাড়ায় নতুন জামা-কাপড় পরলাম। এবার চললাম মাদরাসার মাঠে। এটাই আমাদের এলাকার সবচেয়ে বড় ঈদের জামায়াত। কয়েক গ্রামের মানুষ এখানেই ঈদের নামাজ আদায় করে।

ঈদের নামাজ আদায় করার পরই মোনাজাতের পালা। আধাঘণ্টা/পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে মোনাজাত। মোনাজাত করতেন মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা- মহান শিক্ষানুরাগী-অসাধারণ পরহেজগার এবং এলাকার সর্বজন শ্রদ্ধেয় জনাব গাজী সাহেব। মোনাজাতের মধ্যে অস্তুত বিশ্বার উচ্চারণ করতেন, ‘লা-তাক্নাতু মির্রাহ্‌মাতিল্লাহ, ইল্লাল্লাহা ইয়াগফিরুজ্-জুনুবা জামীয়া।’ হঠাৎ পেছনে কারো হাতের ওজন অনুভব করলাম। তাকিয়ে দেখি আবু তালেব। ধমক দিয়ে বললো, ‘আলো, চূপ করে থাক, আত্‌ উচো এরে রাকতি পাত্তিছি না।’ বুঝলাম, আবু তালেব তার মোনাজাত আমার পিঠের ওপরেই রেখে দিয়েছে।

উল্লিখিত চিত্র আমাদের ঈদের জীবনে ঘুরে-ফিরে এসেছে বহুবার। কিন্তু মৌসুম-সময় এবং পরিবেশের বৈচিত্রে তা বিচিত্র হয়ে ধরা দিয়েছে।

বলছিলাম আবু তালেবের কথা। খুব ভালো হা-ডু-ডু খেলতে পারতো। প্রচণ্ড সাহসী-দুষ্ট- বেয়াড়া কিন্তু সং। তালেব যা-করবে রেখে- ঢেকে করবে না। মাদরাসায় পড়ে হা-ডু-ডু খেলা মহাপাপ। ও খেলতো ঠিকই কিন্তু জিজ্ঞেস করলে মিথ্যে বলতো না। ছাত্র হিসেবে তালেব মেধাবী ছিলো। খুলনা মহানগরীর একটি স্কুলের ও এখন প্রখ্যাত শিক্ষক।

কস্টে-মস্টে ঈদের মোনাজাতটা শেষ করে খুঁজে বেড়াইতাম বন্ধুদের। অল্প একটু খুঁজলেই পেয়ে যেতাম সবাইকে। তারপর দলবেঁধে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি, এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রাম। এইভাবে আবদুর রহমান সাহিদদের বাড়ি, আকবর আজাদদের বাড়ি, কামাল ভাইদের বাড়ি, ইজাবুরদের বাড়ি, আক্বাসদের বাড়ি, দোস্ত মতি ফরাজীদের বাড়ি, নজরুল ভাইদের বাড়ি, মনু ম্যাভাইদের বাড়ি, ইকরাম ম্যাভাইদের বাড়ি, রেজা ম্যাভাইদের বাড়ি ঘুরতে-ঘুরতে এবং অন্যান্য স্বজনদের বাড়ি ঘুরতে-ঘুরতে কখন যে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে যেতো টের পেতাম না। হ্যাঁ, জোহরের নামাজের স্মৃতি হতো না আক্বাস অথবা মুজিবদাদার জন্য। আক্বাস হয়তো হাঁক দিয়ে বললো : ‘শালারা জন্নের পাআ খাতিছিহ, নামাচ পড়বি না? বেলা নামে পেইছে গাছের মাতায়, শালাগে উশ নেই।’

তালেব সাথে-সাথে জবাব দিলো : ‘অতো দরবেশ ক্যালাবি না, এহোনো দশবাড়ি চোক বুজে খায়া যাব্যানে।’

বয়সে মুজিব দাদা আমাদের বড়, লেখাপড়ায়ও বড়, তিনি হয়তো সমাধানের সুরে, বললেন: ‘আব্বাসের কতাদা খাঁটি গরুর খাঁটি দুধির মত খাঁটি, তা এই সমানের পুওরি অজু এরে নিলি হয়, তারপরে এটুটু আগোয়ে মোল্লাগে মসসিদি যায়ে নামাচ্ পড়ে নিলি অবানে, তালেব আর কি কও?’

মুজিব দাদার কথার ওপরে আজো তেমন কেউ কথা বলে না।

একরোখা তালেব সাথে-সাথে সায় দিয়ে বললো : ‘দাদা আপনি অচ্ছেন, জায়েগে মুরক্বা- নাউজুবিল্লা- মুরক্বি, আপনার কতা কি ফেলাতি পারি, কিতা ফেলায় দ্যাকপানে দেহি, এ-শালারা-নাউজুবিল্লা- বাইরা এহনি-অজু এত্তি অবে, নামাচ্ পড়ে তারপরে অন্য কতা।’

নামাজ পড়া শেষ হয়ে গেলো তো আবার শুরু হয়ে গেলো বাড়ি-বাড়ি খাওয়া।

আমাদের মধ্যে সবচে’ বেশী খেতে পারতো ঐ তালেবই। ওর পাতে খাবার দিতে থাকলে না করতো না। বলতো : ‘বাড়ি আপনাগো, থাল আপনাগো, বাত-তরকারীও আপনাগো, তাহালি আপনাগো থালে আপনাগো মাছ-গোস্ত রাকপেন, সেহানে আমার কিছু কআর আছে কন্? আর কলিই বা আপনারা তাতে কান দেবেন ক্যানো? আপনাগে কাজ আপনারা এরে যান, আমার কাজ ইনশাআল্লাহ আমি এবার চেষ্টা এয়ারবানে ল্যাহেনানে, খালি এটুটু দোয়া এয়ারবেন আর কি?’

আমি খেতে পারতাম, কিন্তু পাল্লা দিয়ে খাবার মতো লোক ছিলাম না। তবু বাহাদুরী দেখাবার জন্যে শুরুতে না-খেয়ে গল্প-গুজবই বেশী করতাম। আমার অবস্থা দেখে হাকিম ভাইসাহেব হয়তো বলে বসলো : ‘ও মতি, অতো ফ্যাচোর-ফ্যাচোর এল্লি খাআ যায় নাহি, এটুটু খাওদিন দেহি, পরে কিন্তু কপালে জোটপে নানে, কয়ে রাক্লাম।’ ভাইসাহেবের সতর্কবাণী গ্রহণ করতাম খুব গুরুত্বের সাথে এবং বলতাম : ‘শ্যাষ পর্যন্ত দ্যাহেনানে লোকসান দেবোনানে, দরদ দ্যাহানোদদুন্নি দন্যবাদ।’ সত্যিকথা বলতে কি, সবার খাওয়া শেষ হয়ে গেলে পরে আমি শুরু করতাম অর্থাৎ সবার খাওয়া যখন প্রায় শেষ তখন শুরু করতাম আমি- আগে বলেছি- বাহাদুরী দেখাবার জন্যে। ‘খুব খেতে পারি’ বাহাদুরী দেখাতে গিয়ে, শেষের দিকে কয়েকবার ভাত নিতাম, গোস্ত নিতাম। এভাবে দু-একবার যে জিতে যাইনি তা নয়, তবে তা ষোলো আনা আনন্দ দেয়নি। আসলে আনন্দ তো প্রকৃত প্রতিযোগিতায়।

যতোই বাড়ি-বাড়ি দলবেঁধে খেয়ে বেড়িয়েছি-না-কেনো, বিকেলে মাঠে যেতে ভুল হয়নি। আমাদের বাড়ি থেকে বড় খেলার মাঠটা কাছেই। হাইস্কুলের

মাঠটা- আমাদের গ্রামের মধ্যে হলেও আধ-মাইল দূরে। ঈদের দিনে ম্যারেড-আনম্যারেড খেলাটা বড় মাঠেই হতো এবং দারুণ রকমের জমতোও। আমাদের আনম্যারেডদের মধ্যে কামাল ভাই, নজরুল ভাই, সাহিদ ভাই খুব ভালো খেলতেন। একটু ছোটদের মধ্যে জামাল এবং সেকেন্দাররাও খুব ভালো খেলতো। কখনো-কখনো ম্যারেডরা যে জিততো না তা নয়, তবে আনম্যারেডরাই জিততো বেশী। জিতবে না কেনো? সাহিদ ভাই, নজরুল ভাইয়ের মতো ‘ব্যাকের প্রেয়ার’; এবং কামাল ভাইয়ের মতো ‘স্ট্রাইকার’ কি ম্যারেডদের তখন ছিলো? আর আমার মতো বাঁ-পায়ের প্রেয়ারের কথা নাইবা বললাম।

খেলাধুলো শেষ করে মাগরিবের জামায়াত করতাম আমরা অনেকেই। তারপর চলে গিয়েছি- হাঁটতে-হাঁটতে-বাজারের ঘাটে। নোয়াখালি-চাটগাঁ থেকে আসা বড়-বড় নৌকো অথবা পালদের নৌকায় অথবা নদীর পাড়ের সবুজ ঘাসের মধ্যে শুরু করতাম গানের আসর। মতি ফরাজী, আকবর আজাদ কিনা আমাদের কর্তৃ তখন ডেকে আনতো অন্য কোলাহল।

আমাদের গ্রামের সবচে’ বড় দীঘিটি খানজাহান আলী [র.] খনন করেছিলেন। এটি এখন আর খুব একটা গভীর নেই। তবে কামাল ভাইদের দোতলা দালানের সামনের দীঘিটি বেশ গহীন এখনও। কখনো-কখনো ঈদের দিন খুব ভোরে-ভোরে এখানেই আয়োজন করা হতো সাঁতার এবং পানির নীচের ডুবিয়ে থাকার প্রতিযোগিতা। একবার এই প্রতিযোগিতায় আমি প্রথম হয়েছিলাম। প্রথম হয়েছিলাম দুই মিনিট তের সেকেন্ড ডুবিয়ে থেকে। এরপরও দু-একবার বিজয়ী হয়েছি। বিজয়ী হয়েছি অন্যত্র। কিন্তু ঈদের দিন : ভোরবেলার প্রতিযোগিতার মতো স্বাদে-গন্ধে অপরূপ এ-রকম প্রতিযোগিতা চোখে পড়ে না। দু-তিন মিনিট কিভাবে ডুবিয়ে থাকতে পারতাম, কতো-জনই-না জানতে চেয়েছে, কোনো-দিন-কাউকে বলিনি। আজ বলবো। আসলে আমি হিসেব করে দেখেছি- ডুবিয়ে গুণতে থাকলে অন্যমনস্ক থাকা যায় এবং সময়েরও একটা আন্দাজ করা যায়। আমি ডুবিয়ে-ডুবিয়ে-পাঁচ শ’ পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে গুণতে পারলে বুঝতে পারতাম আড়াই মিনিট হয়ে গেছে এ-ছিলো আমার নিজস্ব ‘ডিসকভারি’। এবং আমার বিজয়ের পেছনের রহস্য এটাই। দূর-পাল্লার ডুবিয়ে সাঁতার প্রতিযোগিতায়ও ঐ একই পদ্ধতিতে আমি সাফল্যের শীর্ষ স্পর্শ করেছিলাম দু-একবার।

কোনো-কোনো ঈদের আগের দিন প্যান করতাম- নামাজ পড়বো খানজাহান আলী (র.)-এর ষাটগম্বুজ মসজিদে। তো ঈদের দিন রাত ৪ টের দিকে শুরু করতাম হাঁটা। ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদ আমাদের গ্রাম থেকে ৬/৭ মাইল দূরে। পাইকপাড়া-কোমরপুর-যাত্রাপুর-রহিমাবাদ-বাদোখালি-রাজাপুর-মগরাহাট পাড়ি

দিয়ে-জামায়াত শুরু হবার বেশ আগেই- পৌছে যেতাম ঘোড়াদীঘির পাড়ে ।
দীঘির দিকে চোখ পড়তেই একটানা হেঁটে আসার ক্লান্তি হলুদ পাতার মতো
করে-ঝরে পড়ে যেতো ।

আমাদের এলাকা থেকে ঘোড়াদীঘির পাড়ে গিয়ে উঠতে হয় দীঘির উত্তর-পূর্ব
কোণ স্পর্শ করে । ষাটগম্বুজ মসজিদ এবং ঘোড়াদীঘির পরশ-পাওয়া দখনে
হাওয়া হুড়মুড় করে লাফিয়ে পড়ে তার উত্তর পাড়ে । সে কি হাওয়া । বনেদী
এবং অভিজাত হাওয়া আর কি । আর দীঘির দৃশ্য- নীল আকাশ তার বুকের
ভেতরে; রূপের সাগর তার সারা অঙ্গে । তার তীরের দিকে শ্যাওলায় জড়িয়ে
গেছে তারকার বিস্ময় । সুতরাং দীঘির দিকে তাকালে পরে এবং স্পর্শ পেলে তার
অনঙ্গ হাওয়ার- থাকে না কষ্ট, থাকে না শ্রান্ত-মনস্কতা ।

ষাটগম্বুজ মসজিদে ঈদের নামাজ পড়ার পেছনে আরো একটি কারণের কথা
কবুল করতেই হয় । সেই কারণটা হলো- খাজেলী দীঘি : দীঘির কুমীর ।

ষাটগম্বুজ মসজিদ পড়েছে ‘সুন্দরঘোনা’ গ্রামের সীমানার মধ্যে । সীমানার
পূর্বপ্রান্ত থেকে ‘রণবিজয়পুর’ গ্রামের শুরু । রণবিজয়পুরের মাঝামাঝি গিয়ে
উত্তর দিকে একটুখানি এগিয়ে গেলে ‘দরিতালুক’ গ্রাম- আমার আপন বড়
ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ি । এই গ্রামই আমার এক নানা- ষাটগম্বুজ মসজিদের বর্তমান
খতিব- মাও: নূরুল ইসলাম সাহেবের বাড়ি; এই গ্রামই আমার এক বন্ধু মাও:
নাসিরউদ্দীনের বাড়ি; এই গ্রামই আমার বড় ভাইয়ের আপন শ্যালক- কবি
আবু বকর সিদ্দিক স্যারের ভগ্নিপতি, মিসরস্থ বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রদূত-
রুহুল আমিন সাহেবের বাড়ি । ঈদের নামাজ পড়ে- অনেক সময়- সোজা চলে
আসতাম এই গ্রামে; বড় ভাই কবি মল্লিক আহমদ আলী সাহেবের শ্বশুর বাড়ি ।
পেটে তখন এক সমুদ্র ক্ষুধা । ঐ বাড়ির রকমারি রান্না- ঈদের দিনের সুব্বাদু
রান্না- গলা পর্যন্ত খেয়ে সোজা খাজেলী অর্থাৎ খান জাহান আলী (র.)-এর
দীঘিতে । উদ্দেশ্য একটাই- দীঘির কুমীর দেখা ।

এখনো ঈদের দিনে কুমীর দেখা বেশ সহজ । খাদেমরা এই ধরনের দিনগুলোতে
‘আঁয়-আঁ-আঁয়-আঁয়-আঁয়...য় ধলা পাড়, কালা পাড় আঁ...য়’ বলে ডাকতে
থাকে । খাদেমদের ডাকে সাড়া দেয় কুমীররা । উঠে আসে একেবারে সিঁড়ির
ওপরে ।

আমার বড় ভাইয়ের ছোট শ্যালকের নাম রুহুল হক । আমার এক অসাধারণ
বন্ধু । আমরা একই বয়সের । খাজেলীর কুমীর দেখে দেখে এবং তার চার-পাড়
ঘুরে-ঘুরে পার করে দিয়েছি কতো যে-বিকেল, কত যে-সন্ধ্যা- তার হিসেব নেই ।
সবুজ মিতালী সংঘ নামে- বারুইপাড়া পাইকপাড়া- শোতাল এই তিন গ্রাম মিলে-

আমরা একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তুলেছিলাম। এই সংগঠনের উদ্যোগে বের হতো হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা ‘দুঃসাহসী’; এই নামে দেয়ালিকাও বের হতো; প্রতি শুক্রবারে অনুষ্ঠিত হতো বিতর্ক; নিয়মিত পরিচালিত হতো খেলাধুলো; সমাজকল্যাণমূলক কাজও ঐ সংগঠনের মাধ্যমে করতাম আমরা।

ঈদ আসতো- আমরা সিদ্ধান্ত নিতাম: যাদের বাড়িতে ঈদ হবে না, গভীর রাতে, সবুজ মিতালী সংঘের পক্ষ থেকে, চাল-শুড় এবং নারকেল পৌছে দেবো এবং চুপি-চুপি গভীর রাতে পৌছে দিতাম। কী- যে খুশি হতো- যা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না এমন খুশি- কিছু দরিদ্র মানুষ। মনে আছে- এই ঈদে যে- আনন্দ পেয়েছিলাম, তার স্বাদ এবং গন্ধ অন্যসব ঈদ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। গভীর রাতে ঘুরে-ঘুরে, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখে দেখে ওমর ফারুক (রা.) কী যে প্রেরণা পেতেন- আমরা এইবারই প্রথম অনুভব করেছিলাম।

আজো তো ঈদের দিন আসে। কিন্তু খুঁজে ফিরি বৃক্ষভরা একটি গ্রাম, অনেক-অনেক সন্তান হারানো একজন মা, ধোঁয়া উড়তে থাকা একখাল খেজুরে গুড়ের শিরনি, পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে বেড়ানো- বন্ধু-বান্ধবদের প্রাণবন্ত একটি দল, বিবাহিত-অবিবাহিতদের ফুটবল প্রতিযোগিতা, রাত চারটেয় উঠে ষাটগম্বুজ যাবার সুযোগ, ঈদের আগের দিন রাতে সঙ্কলহীন মানুষদের বাড়ি-বাড়ি ঘোরার ল্প্‌হা এবং খুঁজে ফিরি, কেবল খুঁজেই ফিরি- সেইসে ঈদের দিনগুলি।

বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্র

দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী একটি তাৎক্ষণিক স্মরণ

প্রায় একযুগ অর্থাৎ বার বছরের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত সাহিত্য পত্রিকা কল্লমের সাথে, নতুন কল্লমের সাথে যুক্ত থাকলাম। শেষের দিকে ঠিকই বুঝতে পারলাম-নতুন সফর আমাকে ডাকছে। ডাকছে নতুন সমুদ্র।

কোনো ভূমিকা ছাড়াই আমার একান্ত অভিভাবক মীর কাশেম আলী ভাই একদিন বললেন, ‘ইবনে সিনা ট্রাস্ট একটি সাংস্কৃতিক কর্মসূচি হাতে নেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে, আপনি যোগদান করতে পারেন ঐ বিভাগে’। আমি আমার চূড়ান্ত মতামত এক সপ্তাহের মধ্যে দেয়ার ওয়াদা করলাম। সারাটি সপ্তাহ আমার কেটে গেলো নানান ভাবনায়। অবশেষে আমি আমার সম্মতির কথা জানালাম। খুশি হলেন মীর কাশেম আলী ভাই।

একদা ডাকলেন আবু নাসের মোহাম্মদ আব্দুজ্জাহের ভাইও। কথা বলতে বলতে একপর্যায়ে কেঁদে দিয়ে বললেন, ‘মনে হবে যে, এইমাত্র তোমাকে দায়িত্ব দিলাম, আসলে তিনবছর আগ থেকে তোমাকে নিয়ে আমরা চিন্তা করছি। স্বাধীনভাবে এইবার কাজ শুরু করো’। তখন আমার চোখেও পানি। দোয়া চেয়ে বাসায় ফিরলাম।

ইবনে সিনা ট্রাস্টের ‘সাংস্কৃতিক সমন্বয় কর্মকর্তা’ হিসেবে ইবনে সিনা ট্রাস্টের প্রধান অফিসে যোগদান করলাম। এই যোগদানের পেছনে ভেতরে-ভেতরে কাজ করলো কয়েকটি স্বপ্ন ও ইচ্ছে :

১. ইসলামী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে সরাসরি সহযোগিতা করার স্বপ্ন ও ইচ্ছে।
২. এসব সংগঠনগুলোর সংকট ও সমস্যাগুলোকে সরাসরি অনুধাবনের স্বপ্ন ও ইচ্ছে।
৩. এসব সংগঠনগুলোর দুঃখ ও কষ্টের সঙ্গে সরাসরি নিজেকে জড়িয়ে ফেলার স্বপ্ন ও ইচ্ছে।

সাংস্কৃতিক সমন্বয় কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সময় একটি বৃহত্তর পরিকল্পনা তৈরী করার জন্য নির্দেশ করলেন মীর কাশেম আলী ভাই। একটি বৈঠকে তা পেশও করলাম।

বৈঠকটি ছিলো আমার জীবনের একটি স্মরণীয় বৈঠক। বৈঠকে ছিলেন সর্বজনাব কমোডর [অব.] এম আতাউর রহমান, শাহ আবদুল হান্নান, আবু নাসের মোহাম্মদ আবদুজ্জাহের, মীর কাশেম আলী, ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান প্রমুখ।

ঐ বৈঠকেই একটি সংস্কৃতিকেন্দ্র গড়ে তোলার ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্ত হয়— আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষা করতে হবে, শালন করতে হবে এবং বিকশিত করতে হবে। সেই সঙ্গে অপসংস্কৃতি রোধকল্পে গড়ে তুলতে হবে বৃহৎ এবং ব্যতিক্রমধর্মী কোনো প্রতিষ্ঠান।

কেন্দ্রের কাজ প্রথম শুরু হলো ইচ্ছাটেনে। কোনো নাম ছাড়াই। তারপর কেন্দ্র কবীর কুঞ্জ, ৫/৫ গজনবী রোড, মোহাম্মদপুর এলো ১৯৯৮-তে।

১৯৯৮-এর ৪ঠা মার্চ কেন্দ্রের পরিচালনা পরিষদের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। ঐ বৈঠকেই সিদ্ধান্ত হলো, কেন্দ্রের নাম হবে, ‘বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্র’। মিলনায়তনসহ পুরো চত্বরের নাম হবে, ‘প্রত্যাশা প্রাঙ্গণ’।

কেন্দ্রের নামের একটা তালিকা প্রথম পেশ করেছিলাম কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রশাসন মীর কাশেম আলী ভাইয়ের কাছে। তার ভেতর থেকে তিনি ‘বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্র’ নামটি প্রথম পছন্দ করেছিলেন। ‘প্রত্যাশা’ বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্রের সভাপতি কমোডর (অব.) আতাউর রহমান সাহেবের দেয়া নাম।

বৈঠকটি ছিলো আমার জীবনের একটি স্মরণীয় বৈঠক। বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্রের পরিচালনা পরিষদে রয়েছে বাংলাদেশের স্বনামখ্যাত ব্যক্তিবর্গ :

১. সভাপতি	কমোডর [অব.] এম আতাউর রহমান
২. সদস্য প্রশাসন	জনাব মীর কাশেম আলী
৩. সদস্য	অধ্যাপক আবু নাসের মুহাম্মদ আবদুজ্জাহের
৪. সদস্য	জনাব মুহাম্মদ ইউনুছ
৫. সদস্য	ইঞ্জিনিয়ার ইফ্ফান্দার আলী খান
৬. সদস্য	ইঞ্জিনিয়ার মোস্তফা আনোয়ার
৭. সদস্য	জনাব এম. কামালুদ্দিন
৮. সদস্য	জনাব নুরউদ্দিন মুহাম্মদ সাদেক হোসাইন

প্রত্যাশা প্রাক্ষণ নিয়ে আমরা যারা প্রতিদিন স্বপ্ন এবং ইচ্ছের বীজ রুয়ে চলেছি, চলেছি পরিশ্রমের দুই-দুটি হাত ধরে। তারা হলো :

১. মতিউর রহমান মল্লিক
২. হাসান মুর্তাজা
৩. জাকির আবু জাফর
৪. কামাল শামসুল আলম
৫. ফরিদী নুমান
৬. আলী আসগার তালুকদার
৭. আমিনুর রহমান বাচ্চু
৮. মোকাররম হোসাইন কোরেশী
৯. ফরহাদ হোসেন
১০. সালমান আল আযামী
১১. শিবলী সোহায়েল আব্দুল্লাহ
১২. হাফেজ মওলানা বেলাল হোসাইন
১৩. অধ্যাপক নাসীর মাহমুদ
১৪. বদরুল ইসলাম মুনীর
১৫. ইদ্রিস ফারুক
১৬. কিমানা কিবরিয়ানী
১৭. হিমিকা রেজা
১৮. রুহিনা তাসনীম
১৯. আব্দুল্লাহ আল মাসুদ
২০. কল্লোল শরিফী
২১. উমার আন্দালিব/খালিদ সাইফ
২২. মালিক আব্দুল লতিফ
২৩. আফসার নিজাম

একদা এই প্রাক্ষণের সাথে যুক্ত ছিলো হাসিনুর রব [বর্তমানে ইরান রেডিওতে কর্মরত], মাহফুজুর রহমান আখন্দ [বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট করছে] এবং শাহিদ মুবীন [বর্তমানে একটি পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক]। আমরা মনে করি, তারা যেখানেই থাকুক না কেনো, আজো আমাদের নিত্যদিনের কর্মসঙ্গী।

প্রত্যাশা প্রাক্ষণ তার জাতি, তার অভিভাবকদের প্রত্যাশা পূরণে যেনো আকাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে পারে, আর তার কল্যাণকামীদের স্বপ্ন ও ইচ্ছেকে যেনো যথার্থ করতে পারে বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্রের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে মহান আল্লাহর দরবারে এই দোয়াই শুধু করি এবং সবাইকে এই দোয়া করার জন্যই অনুরোধ করি।

বাগেরহাট সংস্কৃতিকেন্দ্রের প্রথম সম্মেলন : নতুন আলোর বলকানি

প্রত্যাশা প্রাক্কণের দফতরে তখন এক হাজার ঝামেলা। হাদীকে বললাম -
আব্দুল্লাহিল হাদী:

বাগেরহাট সংস্কৃতিকেন্দ্রের নির্বাচিত সম্পাদক- এখনো নভেম্বর '৯৮-এর
রিপোর্ট তৈরি করতে পারিনি, বাজেটও করতে পারিনি ডিসেম্বরের; আমাকে বাদ
দাও, ড. গাউস স্যার আছেন, সম্মেলন উৎসে যাবে। এবারকার মতো আমার
পক্ষ হয়ে একটু কথা বলো- বাগেরহাট সাংস্কৃতিক সম্মেলনে আমি না গেলে-
কেউ আর রাগ করবে না তাহলে!

হাদী সবাইকে বুঝিয়ে বলবার ওয়াদা করে চলে গেলো। আমিও ৭/১১/৯৮
তারিখে ফোন করার ওয়াদা করলাম।

কিন্তু সাত তারিখে ফোন করতে গিয়ে পড়লাম ফাঁদের মধ্যে। ডেফোডিলস
কিন্ডার গার্টেনের শিক্ষকমন্ডলীর প্রধান- মোহাম্মদ আলী চৌধুরী- বাগেরহাটের
প্রান্ত থেকে বললেন, আপনার তো আরো আগে ফোন করার কথা ছিলো,
এতোক্ষণ আজাদ ভাই- কবি আজাদ আবুল কালাম- বাগেরহাট সংস্কৃতিকেন্দ্রের
নির্বাচিত সভাপতি- হাদী ভাই আপনার জন্য অপেক্ষা করে চলে গেলেন এবং
বলে গেলেন, আপনাকে আসতেই হবে, হস্পস্ অবস্থা এদিকে। মল্লিক ভাই,
আমিও মনে করি, সত্যিই আপনার আসা দরকার।

বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্রের সহকারী-সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান আখন্দর
সাথে পরামর্শ করলাম- ও বললো, আপনার যাওয়া দরকার, এদিক যা হয়
একটা হবে।

ছুটির দরখাস্ত শাহিদ মুবীনের মাধ্যমে পাঠালাম সাইফুল আলম খান মিলন ভাইয়ের কাছে মঞ্জুর হলো। এটিএম আজহারুল ইসলাম ভাইয়ের সম্মতি পেলাম। তারপর দাঁড়ালাম গিয়ে মিন্টু ভাইয়ের সামনে। খানজাহান আলী – রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করায়, সাথে সাথেই তিনি অনুমতি প্রদান করলেন।

বাগেরহাট গিয়ে পৌছলাম ৯/১২/৯৮ তারিখ সকালে। উঠলাম ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদের খতিব মাওলানা নূরুল ইসলাম সাহেবের (আমার এক নানা) বাসায়। নানা চমৎকার মানুষ, হৃদয়বান এবং আলেমে দ্বীন।

সারারাত্রির সফরের ধকল ছমড়ি খেয়ে পড়লো রুগ্ন শরীরে। নাস্তা করে খানিক ঘুমালাম। ইতোমধ্যে সভাপতি এবং সম্পাদক [বাগেরহাট সংস্কৃতিকেন্দ্রের] এসে হাজির। কর্মসূচি নিয়ে বসলাম।

বৈঠকের কিছু দূর যেতে না যেতেই আমার আক্কেল গুড়ুম। সম্মেলন হচ্ছে না। হচ্ছে ৯ তারিখের পরিবর্তে ১০ তারিখ থেকে। দুদিনের সম্মেলন। তবে ১০ এবং ১১ নয়। ১০ এবং ১২। ১১ তারিখ ফাঁকা। কিন্তু আমার জন্য ফাঁকা এখন ১১ তারিখই শুধু নয়, ৯ তারিখও।

যেখানে আমার একটা দিনও কোথাও দেবার মতো নেই, সেখানে বাধ্য হয়ে এই বাগেরহাটেই দিতে হবে একটানা চার দিন। একেই বলে তাকদীর। মানুষ যেখানে বন্দী।

হ্যাঁ, দুদিনের সম্মেলন খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে দেখলাম। প্রথমদিন সেমিনার। সেমিনারের বিষয় ‘খলিফাতাবাদ রাজ্যের অধিপতি খানে আযম উলুঘ খানজাহান (রহ.)’। দ্বিতীয় দিন কর্মী ও সংগঠক সম্মেলন, সকালে। বিকেলে প্রকাশনা উৎসব। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সম্মেলন শুরু হবে আজ ১০ তারিখ বিকাল ৪টায়। কিন্তু সকাল থেকেই ভেতরে শঙ্কা। কখনো, কখনো উল্লাস। দুপুরে খেলায় বাগেরহাট ইসলামী ব্যাংকের সেকেন্ড অফিসার আবদুস সালাম এবং বেগম নাসরিনের বাসায়। আমি গোস্ট-টোস্ট খুব একটা পছন্দ করি না বলে বেগম নাসরিন রান্না করেছিল তাজা তাজা শাক, কদুর তরকারি আর মণ্ডসুমী মাছ।

তৃপ্তির সাথে খেয়ে-দেয়ে একটু গড়াগড়ি দেবো কি বাগেরহাট সংস্কৃতিকেন্দ্রের সম্পাদক হাদী এসে হাজির; ‘নিতে এলাম, এখনই যেতে হবে’।

বাগেরহাট জেলখানার সামনে আসতেই বুকেটা খানিক কেঁপে উঠলো। না, জেলের ভয় নয়, স্মৃতির যন্ত্রণায়— শৈশব এবং যৌবনের কতো না দিন কেটে গেছে এই শহরের অলি-গলি পথে-প্রান্তরে। এক অব্যক্ত বিরহে কেঁদে উঠলো হৃদয়।

চোখের কোণায় বুঝি জমে উঠেছিলো পানি। রিকশার ত্রিঃ ত্রিঃ বেলের শব্দে সম্বিং ফিরে পেলাম। দেখি বাগেরহাট শিল্পকলা একাডেমি হলের প্রধান ফটক সামনে। সাংস্কৃতিক সম্মেলন শুরু হবে এই একাডেমি হলেই।

শিল্পকলা একাডেমি হলের ঠিক পশ্চিম পাশে বড় একটা পুকুর। স্বচ্ছ এবং পরিচ্ছন্ন, শান্ত এবং শীতলতায় আকর্ষণ। উত্তর পাশে টেনিস ফিল্ড। দক্ষিণ পাশে স্বাধীনতা উদ্যান। পূর্ব পাশে পুরনো কোর্ট ভবন এবং ডিসির বাংলো। পাশাপাশি একটি সংগীত বিদ্যালয়ও আছে। শিল্পকলা একাডেমির প্রবেশ ফটকের পশ্চিম দিক থেকে ‘শিশু বিদ্যালয়’ প্রেস ক্লাব বামে এবং ডাইনে পুকুর রেখে অল্পবয়সী নারকেল গাছের সারি চলে গেছে একেবারে পুকুরের পশ্চিম পাশের ফুলবাগান পর্যন্ত।

সবকিছু মিলিয়ে বাগেরহাট শিল্পকলা একাডেমির পরিবেশ শিল্প এবং কলায় দেদীপ্যমান।

ঐ ধরনের একটি উজ্জ্বল জায়গা সম্মেলনের জন্য বেছে নেয়ায় সংস্কৃতিকেন্দ্রের কর্মকর্তাদের প্রতি আমার আস্থা এবং বিশ্বাস আরো শিলীভূত হলো।

সম্মেলন শুরু হলো সালাতুল আসরের আগে কুরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে। খানজাহান শিল্পীগোষ্ঠীর তৌহিদ, বাগেরহাট সরকারী কলেজের অনার্সের ছাত্র। তার তেলাওয়াত এবং অনুবাদ, সেই সঙ্গে সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী, ঢাকার সদস্য শিল্পী আবদুল লতিফের হামদ এনে দিলো বর্ষণমুখর রাত্রিশেষের স্নিগ্ধ সকাল।

কোনো মহৎ সম্মেলনের জন্যে ঐ অনিন্দ্য প্রতিবেশ অস্তুত প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রস্তুত করা যায় না।

সালাতুল আসরের বিরতির পর বাগেরহাট সংস্কৃতিকেন্দ্রের সম্পাদক আবদুল্লাহিল হাদী মেহমানদের আসন গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানালো।

সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন বিশিষ্ট কবি গবেষক শিক্ষাবিদ, ‘খানজাহান আলী রিসার্চ একাডেমি’ পত্রিকার সম্পাদক, ‘খানে আজম হযরত খানজাহান আলী (রা)’ গ্রন্থের খ্যাতিমান লেখক সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেন, প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করলেন প্রখ্যাত গবেষক, লেখক, দৌলতপুর, খুলনা সরকারী কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান ড. শেখ গাউস।

অন্যান্য অতিথির মধ্যে আসন গ্রহণ করলেন, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আকরামুজ্জামান, অধ্যক্ষ আনোয়ার হোসেন, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এডভোকেট মীর শওকত আলী বাদশা এবং প্রবন্ধকার কবি আজাদ আবুল কালাম। আমিও আসন গ্রহণ করেছিলাম এক পর্যায়ে।

বলা বাহুল্য, সেমিনারের মধ্য দিয়েই সম্মেলন শুরু হয়। একটি চমৎকার প্রবন্ধ পড়েন কবি আজাদ আবুল কালাম। প্রবন্ধে পরিবেশিত বেশ কিছু তথ্য দর্শক-শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে :

ক.

খানজাহান (র:) একদিকে ছিলেন প্রখ্যাত ইসলাম প্রচারক ও মুজাহিদে আজম এবং অন্যদিকে ছিলেন সফল শাসনকর্তা ও সমাজ সংস্কারক।

খ.

ইতিহাস প্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীন হযরত নূর কুতুবুল আলমের নিকট দ্বীনি-শিক্ষা লাভ করে খানজাহান (র:) নিজেও একজন উঁচু দরের আলেমে পরিণত হয়েছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, তিনি আরবি ও ফারসি ভাষার সুপণ্ডিতও ছিলেন, সু-সাহিত্যিকও ছিলেন। তার মাজারের শিলালিপিতে যে-সব উদ্ধৃতি আছে, তাতে কবিতা এবং উন্নতমানের গদ্য-সাহিত্য রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় :

দরি দুনিয়া ক্যায়সে ইয়ার নাদিদাম
আগার দিদাম দানাদারি না দিদাম

এই ধরাধামে দরদী আমার
কারো খুঁজে নাহি পাই;
যদিও পেয়েছি, অচিরে দেখেছি,
দানাদারি তার নাই।

গ.

তিনি মসজিদ নির্মাণ করে সেখানে যেমন ইল্ম শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। আবার যারা মুসলমান হয়েছিলেন, তাদেরকে সামরিক শিক্ষা প্রদান করে; দেশরক্ষায় যাতে ভূমিকা পালন করতে পারে, সে জন্যে ব্যারাক নির্মাণ করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শুরু হলো আলোচনা। আলোচনা করলেন, প্রবীণ শিক্ষাবিদ, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক আকরামুজ্জামান। প্রবন্ধের ত্রুটি বিচ্যুতি খুব চমৎকারভাবে তুলে ধরলেন তিনি। বিশেষ করে, প্রবন্ধে উদ্ধৃত কবিতার কয়েকটি চরণ এবং একটি মন্তব্য সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করলেন এবং বললেন, চরণগুলির সিদ্ধান্ত মেনে নিলে, মহাপুরুষ খানজাহানের ওপর অবিচার

করা হবে। কেননা খানজাহান [রা] এদেশে মানুষ মারতে আসেননি, এসেছিলেন উদ্ধার করতে। অথচ অমুসলিম কবির কবিতায় বলা হয়েছে:

খানজাহান মহামান পাত্শা নফর
যশোর সনদ লয়ে করিল সফর
তার মুখ্য মহাপত্র মামুদ তাহির
মারিতে বামুন বেটা হইল হাজির

আলোচনা করলেন, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী-আইনজীবী মীর শওকত আলী বাদশা মিয়া। তিনি তাঁর মূল্যবান আলোচনার এক পর্যায়ে বললেন, বড়-বড় মানুষের জন্ম হয়েছে এই বাগেরহাটে। বাগেরহাটেরই কৃতীসন্তান- খান এ সবুর খান, ডা. মোজাম্মেল হোসেন, শেখ আবদুল জলিল, মাওলানা ইউসুফ, কর্নেল মুজাফ্ফির রহমান প্রমুখ। কিন্তু খানজাহানের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষায় কেউ কি কোনো অবদান রেখেছেন? আজো তো বর্তমান সরকারে রয়েছেন বেশ ক'জন শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিবিদ, তারাও কি কিছু করবেন?

এ্যাডভোকেট বাদশা মিয়ার আলোচনায় ছিলো উপলব্ধি সংজ্ঞার তীব্রতা- যা শ্রোতা দর্শকদের প্রবলভাবে আলোড়িত করে।

মীর শওকত আলীর আলোচনার পর মধ্যে এলেন খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ এবং তুখোড় বাগী অধ্যক্ষ আনোয়ার হোসেন। সম্মানিত অধ্যক্ষ বাগেরহাট, খানজাহান আলী এবং প্রাসঙ্গিক বিবিধ বিষয়ে পরিশুদ্ধতম বক্তব্য পেশ করেন। তাঁর তথ্যবহুল আলোচনার একাংশে ছিলো বাগেরহাটের জন্যে অনুমোদিত যাদুঘরের প্রসঙ্গ। জনাব অধ্যক্ষ দুঃখ করে বলেন, একদা একটি যাদুঘর সরকারীভাবেই বাগেরহাটের জন্যে অনুমোদিত হয়েছিলো। অনুমোদিত হয়েছিলো মহাপুরুষ খানজাহানের কীর্তিরাজি তথা বাগেরহাটের পুরাকীর্তি সংরক্ষণের জন্যে। ষাটগন্ডুজ মসজিদের সামনে ভবনও তৈরী হলো। কিন্তু কার অদ্ভুত ইশারায়, সেই যাদুঘর খানজাহানের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত বাগেরহাট থেকে চলে গেল অন্যত্র। কে দেবে এর জবাব? কেনো এই উপেক্ষা?

প্রধান অতিথি ড. মোহাম্মদ গাউস তাঁর অভিভাষণে উল্লেখ করেন, উন্নত বিশ্ব এখন ইতিহাস উদ্ধারে এবং ঐতিহ্য রক্ষায় অধিকতর এগিয়ে এসেছে। আজ যদি পর্যটন কর্তৃপক্ষ আন্তরিক হতো, তাহলে বাগেরহাটের অগণন কীর্তিরাজির মধ্যে একটি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলতে ভুল করতো না। সুন্দরবন ছিলো, সমুদ্র ছিলো, নিকটতম একটি আধুনিক পর্যটন কেন্দ্র অল্প সময়ের মধ্যেই তাই জমজমাট হয়ে উঠতো নিঃসন্দেহে। সুতরাং সম্মানিত হতো দেশ, সংগৃহীত হতো মুদ্রা, বৈদেশিক মুদ্রাও।

ড. গাউস আরো বললেন, নানাবিধ উৎকর্ষের জন্য খানজাহান আলী [র]-কে আমাদের প্রয়োজন। এবং একান্তভাবে। আমরা তার স্মরণে কিছু করি আর না করি, তাতে তার কিছুই যাবে আসবে না। বরং যদি কিছু একটা করতে পারি তো গৌরবান্বিত হবো আমরা, সম্মানিত হবো আমরা, আলোকিত হবে দেশ, দেশের মানুষ, গোটা জাতি। সুতরাং আমাদেরই প্রয়োজনে-তার শিক্ষা, তার সংস্কৃতি, তার কীর্তি ও ঐতিহ্য রক্ষায়-বলিষ্ঠ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

কবি আজাদ আবুল কালামের প্রবন্ধের প্রশংসা করে প্রধান অতিথি খানজাহান আলী [র:] সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রে, বেশ কিছু সমস্যার কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন, কিংবদন্তির ওপর নির্ভর করা ঐতিহাসিকের কাজ নয়, তাই প্রকৃত খান জাহান [র:] কে যথার্থভাবে তুলে ধরার জন্যে চাই প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ, ব্যয়বহুল উদ্যোগ। যতোদিন তা না হবে, কোনো গুরাহাও হবে না ততোদিন। এ প্রসঙ্গে ড. গাউস কবি গবেষক সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেনের ব্যক্তিগত উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেন বাগেরহাট সংস্কৃতিকেन्द्रের প্রশংসা করে বলেন, খানজাহান আলী সম্পর্কিত একটি সেমিনারের আয়োজন করার জন্যে উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাই, ধন্যবাদ দিই বাগেরহাট সংস্কৃতিকেन्द्रকে, কেন্দ্র সময়ের দাবী পূরণ করেছে।

বক্তৃতার এক পর্যায়ে সম্মানিত সভাপতি কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, খানজাহানের ইতিহাস খননের কাজে, এক-বুক-ব্যথা নিয়ে, একদা কোদাল চালিয়েছি আমি একাই। আমার পাশে কেউ ছিলো না। গবেষণার ঝোলা নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছি। কেউ আদর করেছে, কেউ তাড়িয়ে দিয়েছে। খানজাহান [র:]—র জন্যে আজ নতুন নতুন উদ্যোগ দেখে তাই আমার আনন্দের সীমা নেই।

খানজাহান [র.] ছিলেন রসূলে খোদার খাঁটি অনুসারী, মানবতার প্রকৃত দরদী, এ অঞ্চলের নির্যাতিত মানুষের মুক্তির জন্যে, ঈমানহীন মানুষের ঈমানের জন্যে ছুটে এসেছিলেন। ছুটে এসেছিলেন মাতৃভূমির মায়া ছিন্ন করে। আমার শুধু একটাই দাবী- খানজাহানের কীর্তিগুলোর গায়ে গায়ে আজো যে সব শিলালিপি ঠায় দাঁড়িয়ে কথা বলে, কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না, সেইসব শিলালিপির ভাষা উদ্ধার করুন। উদ্ধার করুন ইতিহাসের স্বার্থে, সভ্যতার স্বার্থে এবং যুগ যুগ ধরে জমে থাকা অগণিত জিজ্ঞাসার জবাবের স্বার্থে।

সেমিনার যখন শেষ হলো, তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত। সাফল্যের উপটোকন ভরে গেছে মনের ডালা। হৃদয়ের গভীর থেকে কে যেনো বলে উঠলো- এমন চমৎকার আলোচনা অনেক সময় রাজধানীতেও হয় না। সুতরাং সুযোগ থাকতেও যারা

সেমিনারে এলো না, তারা প্রথম প্রভাতী থেকে বঞ্চিত থাকলো, বঞ্চিত থাকলো নিজেকে আবিষ্কার করার মতো একটি উজ্জ্বল উদ্যোগ থেকে।

খানজাহানের [রহ.] দীঘির পাড়ের পাদপ্রদীপেই হাদীদের বাড়ি। প্রতি বছরই অনুষ্ঠিত হোক অধিকতর সমৃদ্ধ সেমিনার – এই কামনা করে পা বাড়লাম ঐ দীঘীর পাড়েরই নয়নাভিরাম এক গ্রাম ‘সুন্দরঘোনার’ দিকে।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন- ১২ তারিখ সকালে শুরু হলো সাংস্কৃতিক কর্মী ও সংগঠকদের সম্মেলন। বাগেরহাট সংস্কৃতিকেন্দ্রের সম্মানিত সভাপতি কবি-সাংবাদিক আজাদ আবুল কালামের সভাপতিত্বে। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করলেন কেন্দ্রের সম্পাদক আবদুল্লাহিল হাদী।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, সমন্বিত সাংস্কৃতিক সংসদ সসাস- এর বাগেরহাট জেলার আহ্বায়ক মোহাম্মদ ইউনুসসহ হাবেলী ইসলামী সমাজকল্যাণ পাঠাগারের প্রতিনিধি, খানজাহান আলী সাহিত্য পরিষদের প্রতিনিধি এবং অন্যান্য সংগঠনের কর্মী ও সংগঠকবৃন্দ।

দীর্ঘ সময় ধরে সংগঠকরা তাদের সংগঠনের রিপোর্ট পেশ করেন এবং উপস্থিত প্রতিনিধিদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

সম্মেলনে উপস্থাপন করা হয় অনেকগুলো প্রস্তাব। যেগুলোর একটি হচ্ছে – খানজাহান আলী সেতু সম্পর্কিত। সম্মেলন প্রস্তাব করে, রূপসা নদীর উপর যে সেতু নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে, তার নাম অবশ্যই ‘খানজাহান আলী সেতু’ রাখতে হবে।

সম্মেলন অপসংস্কৃতির মোকাবেলায় আপোসহীন লড়াই চালিয়ে যাবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।

বিকালে শুরু হয় প্রকাশনা উৎসব। শুরু হয় বাগেরহাট আমলাপাড়া হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক, বাগেরহাট সাহিত্য পরিষদের সভাপতির সভাপতিত্বে। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন প্রখ্যাত গবেষক, লেখক এবং ক্যাকটাস বিশেষজ্ঞ আবদুস শহীদ খান। আলোচনায় অংশ নেন, কবি নাসির নাজিরী, অধ্যাপক আখতার ফারুকজ্জামান, অধ্যক্ষ আনোয়ার হোসেন।

আলোচনায় আমিও অংশ নিয়েছিলাম।

প্রকাশনা উৎসব হয় দুটি কাব্যগ্রন্থকে কেন্দ্র করে। একটির নাম ‘জীবন্ত মৃত্যুর মত’; অন্যটির নাম ‘অনন্তের জাহ্নত অন্তর’।

কবি সৈয়দ ওমর ফারুকের ঐ কাব্য দুটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯৫-৯৬তে।

সৈয়দ ওমর ফারুকের খ্যাতি গবেষক হিসেবে। ‘খানে আজম হয়রত খানজাহান আলী র.]’ গ্রন্থ তার গবেষণাকর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ ফসল। তারপরও সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেন মূলত কবি।

তাঁর সম্পর্কে ড. গাউস একদা লিখেছিলেন, “সৈয়দ ওমর ফারুক বাগেরহাট অঞ্চলের সক্রিয় লেখকদের মধ্যে অন্যতম। তিনি দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত। ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে তার ‘খানজাহান আলী’ গ্রন্থটি। গ্রন্থটি পাঠকমহলে সমাদৃত হয়েছে। বহু বৎসর আগে এই বইটির ভূমিকা লিখতে পেরেছিলাম বলে এখনও নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। তবে তিনি শুধু গবেষক নন – কবিও”।

প্রকাশনা উৎসবের প্রধান অতিথি জনাব আবদুস শহীদ খান ঐ কবি সম্পর্কে বলেন, কবি ওমর ফারুক সেই সব কবিদের একজন যারা নির্ধাত মানুষের জন্যে অশেষ দরদ অনুভব করেন। এবং তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে, তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন প্রতিবাদী হবার জন্যে, অধিকার আদায় করার জন্যে। তাই তাঁর ‘জীবন্ত মৃত্যুর মত’ কবিতায় বলতে শুনি :

বারবার আমার এ হুকুম দিতে ইচ্ছা হয়

হয় তুমি কবরে ঘুমাও

না হয় একবার, অন্তত: একবার,

শুকনো হাড়ে কম্পন তুলে ঝনঝনি বাজাও।

সৈয়দ ওমর ফারুককে যথার্থ কবি হিসেবে অভিহিত করে প্রধান অতিথি বলেন, কবি ওমর ফারুক শুধু বাগেরহাটের কবি নন, সারা বাংলার কবি। সুতরাং তাঁর যথার্থ মূল্যায়নে কেউ যদি কলম ধারণ করে, গ্রন্থ রচনা করে— আমরা তাঁকে সহযোগিতা করবো।

অধ্যাপক আখতার ফারুকজ্জামানের আলোচনা ছিলো লিখিত এবং তথ্যবহুল। তাঁর আলোচনায় দুটি কাব্যই আলাদা আলাদাভাবেই প্রাধান্য পায়।

বাগেরহাট ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এক কর্মকর্তা, কবি নাসির নাজিরীও চমৎকার আলোচনা করেন।

অধ্যক্ষ আনোয়ার হোসেন তাঁর প্রাণবন্ত আলোচনায় বলেন, গ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হবার অনেক পরেই অনুষ্ঠিত হলো প্রকাশনা উৎসব। এমনটি না হওয়াই ছিলো শোভনীয়। তবুও শেষ পর্যন্ত যে হতে পারলো, এর জন্যে বাগেরহাট সংস্কৃতিকেন্দ্রকে সাধুবাদ জানাই।

কবি ওমর ফারুককে তিনি নিরলস লেখক হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং বলেন, পরিশ্রমী লেখকদের মৃত্যু নেই। কবি ওমর ফারুক পরিশ্রমী শিল্পী লেখক। তাঁর মূল্যায়ন না হয়ে পারে না।

আমি আমার আলোচনায় বলি, নজরুল-ফররুখ জনগণের কবি ছিলেন বলেই আধুনিকতার নামে জনগণের ভাষা পরিত্যাগ করেননি। কবি ওমর ফারুকও জনসাধারণের কবি, সুতরাং বোধগম্য ভাষার প্রতি প্রথমাধিই তাঁর শ্রদ্ধা ছিলো।

কবির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে আমি আরো বলি- এখন প্রয়োজন জাতীয় পত্র-পত্রিকায় তার ওপর লেখালেখি করা এবং কোনো গবেষকের উচিত, তার ওপর কোনো গ্রন্থ রচনায় অগ্রসর হওয়া।

‘জীবন্ত মৃত্যুর মত’ এবং ‘অনন্তের জাহ্নত অন্তর’ কাব্যদ্বয়ের কবি বলেন : আমি প্রকৃতির প্রতি এক গভীর মমতা অনুভব করি, ভালোবাসি মাটি-মানুষ-মানুষের প্রতিদিনের সংগ্রাম।

মানুষের দুর্দশায় আমি দুঃখ পাই, নানাবিধ অবক্ষয় এবং মূল্যবোধের বিপর্যয় আমাকে অস্থির করে তোলে।

আমি বেড়ে উঠেছি কষ্টের মধ্যে, জীবিকার তাগিদে বিচরণ করেছি অভিজ্ঞতার বিচিত্র উপত্যকায়। সুতরাং আমার কবিতায় আমি আমাকেই তুলে ধরেছি, তুলে ধরেছি আমারই মানুষ, আমারই দেশ, আমারই পৃথিবী।

আমার সাহিত্য-জীবনের শুরু কবিতার ভেতর দিয়ে। কবিতাকে আমি আমার সব কথা বলতে পারি, কবিতার কাছেই আজো আমি আমাকে উন্মুক্ত করি, কবিতা আমাকে পরিতৃপ্তি দেয়, দেয় সান্ত্বনা, কবিতা আমাকে জাহ্নত করে, করে উজ্জীবিত।

কবিতার মধ্য দিয়ে আমি আমার উদ্ভাপ ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে যাই- গ্রহণ বর্জনের ভার আমার নয়, আপনাদের, পাঠকদের। আমি শুধু আপনাদের দোয়া কামনা করি, আমৃত্যু যেন সুন্দরের পক্ষ অবলম্বন করতে পারি, প্রত্যয়ের পক্ষ অবলম্বন করতে পারি।

কবি সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেন সুঠাম দেহ এবং ভরাট কঠোর অধিকারী মানুষ। সমস্ত দর্শক- শ্রোতার অন্তিত্ব পর্যন্ত পৌছে গেলো তাঁর বাণী ও বক্তব্য।

সভাপতির বক্তব্যের আগে বাগেরহাট সংস্কৃতিকেন্দ্রের উপদেষ্টা অধ্যাপক আবদুল হামিদ সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন।

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং বাগেরহাট সাহিত্য পরিষদের সভাপতি তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণের এক পর্যায়ে বললেন, কবি ওমর ফারুক আমাদের গৌরব, তাঁর গ্রন্থ দুটির

প্রকাশনা-উৎসবে সকল মহলের উপস্থিতি সেই গৌরবেরই আনুষ্ঠানিক দলিল। কবির গবেষণাধর্মী গ্রন্থ ‘খানে আজম হযরত খানজাহান আলী’ প্রকাশিত হবার পর গবেষক লেখক হিসেবে তাঁর একটি পরিচিতি গড়ে উঠেছিল। ‘জীবন্ত মৃত্যুর মত’ এবং ‘অনন্তের জায়গা অনন্ত’ কাব্যগ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হবার পর কাব্যকর্মী হিসেবে অর্থাৎ কবি হিসেবে তাঁর পরিচিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরিশ্রমী গবেষক লেখক কবি ওমর ফারুককের অবজ্ঞান এখন বাংলা সাহিত্যের পরিব্যাপ্ত পরিসরে।

বাগেরহাট সংস্কৃতিকেন্দ্রের দু-দিনব্যাপী প্রথম সম্মেলনের সফল সমাপ্তি ঘটলো ‘খানজাহান শিল্পীগোষ্ঠী’ ও খুলনার ‘টাইফুন শিল্পীগোষ্ঠী’র মনমাতানো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।

অগণিত দর্শক শ্রোতাদের নিঃস্রবের গডালিকায় আমি এখন ভাসমান অস্তিত্ব শুধু। সম্মেলনের সাফল্যে আনন্দে উদ্বেলিত এই আমি তবুও বেদনায় বিষণ্ণ-আগামীকালই ঢাকায় ফিরতে হবে বলে।

প্রথম অডিও এ্যালবাম : প্রসঙ্গ কথা

আমি একটি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি। আমাদের পরিবারে আগে থেকেই একটি জারীর দল ছিলো। আমার আব্বা ঐ জারীর দলের জন্য বিশাল বিশাল জারী গান লিখে দিতেন। আর এই গান আমার ছোট চাচা আমাদের এলাকায় গেয়ে বেড়াতেন। দলের অন্যান্য সদস্যরা আমাদের আত্মীয়-স্বজন ছিলেন। আমার আব্বা কবিতা লিখতেন। সেই ব্রিটিশ আমলে আমার আব্বা ২/৩ মাইল দূরে গিয়ে পত্রিকা পড়ে আসতেন।

আমার বড় ভাই ছিলেন বড় মাপের একজন কবি। বাংলা ভাষার শিক্ষক হিসেবেও এলাকায় ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। রেডিওতে কবি ফররুখ আহমদ সাহেব যে কবিতা পাঠের আসর পরিচালনা করতেন, সে আসরে আমার ভাই কবিতা পাঠ করেছেন। যে কবিতা ফররুখ আহমদ সাহেব নিজে অনুমোদন করেছেন। বড় ভাইয়ের নাম কবি মল্লিক আহমেদ আলী। বাজারে তার কবিতার বইও পাওয়া যায়। ছোটবেলায় তাঁর রাত জেগে কাব্যচর্চার বা সাহিত্যচর্চার বিষয়টা আমাকে পাগল করে তুলেছিলো। পরবর্তী সময়ে আমিও তার দেখাদেখি সাহিত্যচর্চা শুরু করি এবং খুব ছোটবেলা থেকেই। গানেরও পাগল ছিলাম ছোটবেলা থেকেই। বাড়িতে আমাদের একটা ফিলিপ্স রেডিও ছিলো। এই রেডিওটা আমি রাতদিন শুনতাম। ফলে যৌবনে পদার্পণ করার আগেই প্রেমের গান লেখা শুরু করি। এই গানগুলো আমাদের এলাকার কলেজ/স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গাওয়া হত। এই গান শুনে শিক্ষকরা জিজ্ঞেস করতেন, কে লিখেছে এই গানগুলো? আমার বন্ধু-বান্ধব যখন আমার কথা বলতেন তখন সবাই অবাক হয়ে যেতেন যে, এতো অল্প বয়সের ছেলে এত ম্যাচিউড গান লেখে কীভাবে! শিক্ষক এবং অধ্যাপক সাহেবের এই মন্তব্য আমাকে খুব উজ্জীবিত করতো, দারুণভাবে উৎসাহবোধ

করতাম। পরবর্তীতে যখন ছাত্র আন্দোলনে যোগদান করলাম, তখন আমার লেখার মোড় ঘুরে যায়। ইসলামী আন্দোলনের জন্য গান লেখা শুরু করি। প্রেমের গান লেখার পর্ব চুকে গেলো। আমার কাঁচা হাতের লেখা ও সুর করা গান আমাদের এলাকার ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা খুব পছন্দ করতো। ঐ সময়ে শমসুদ্দীন কুরআন মাজিদ নামে যে কোরআনের বঙ্গানুবাদ পড়া হয় তার অনুবাদক মতিউর রহমান খান-ই ছিলেন আমার জেলা সভাপতি। তিনি আমার গান এতো বেশি পছন্দ করতেন যে, প্রত্যেকটি নতুন গান তিনি তার টেপরেকর্ডারে ধারণ করে রাখতেন এবং অবসর সময়ে শুনতেন। এ বিষয়টি আমাকে যার-পর-নাই বিগ্নিত করতো।

বাংলাদেশের ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের স্থপতি পরম শ্রদ্ধেয় মীর কাশেম আলী ভাই ১৯৭৬ সালে আমাকে বাসায় ডেকে পাঠান এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কাজ শুরু করতে বলেন। এ ব্যাপারে আমার সাংগঠনিক কোনো অভিজ্ঞতা ছিলো না। তবুও আমি পরম শ্রদ্ধেয় মীর কাশেম আলী ভাইয়ের নির্দেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করা শুরু করি। আজকাল যারা ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু করেছিলেন বলে দাবি করেন, তাদের অনেকের কাছেই আমি তখন সাংস্কৃতিক আন্দোলন বিষয়ক পরামর্শের জন্য গিয়েছিলাম।

প্রায় সবাই তখন আমাকে নিরাশ করেছিলেন। সে জন্যে সে সময় আমি আর তাদের কাছে যাইনি। ইতোমধ্যেই বেশ কিছু ইসলামী গান আমার লেখা হয়ে গেছে। ঐ গানগুলো সারাদেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আমি রেকর্ড করে দিতাম। তার মানে একটার পর একটা রেকর্ডার আসতো, আর প্রত্যেকটি রেকর্ডারের জন্য আমায় সবগুলো গান নতুন করে গাইতে হতো। দিন যতোই যেতে লাগলো-ততই এই কাজ বাড়তে থাকলো। শেষ পর্যন্ত আমি সিদ্দিক জামাল ভাইয়ের কাছে গেলাম। সিদ্দিক জামাল ভাই ছিলেন সাহিত্য-সাংস্কৃতিমনা এক দূরদর্শী সংগঠক। আমি তাকে গিয়ে বললাম, যেভাবে প্রতিদিন আমাকে বিভিন্ন গান টেপ-রেকর্ডারে রেকর্ড করে দিতে হচ্ছে তাতে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি।

রেডিওতে-তো বাজনা ছাড়া হামদ-নাত গাওয়া হয়ে থাকে, এগুলো তো আগেই রেকর্ড করা হয়। পরে প্রচার করা হয়। আমরা তো এভাবেই রেকর্ড করা ক্যাসেট বাজারে ছাড়তে পারি। আপনি একটু খোঁজ খবর নিয়ে দেখুন এ ব্যাপারে কোনো গুরাহা করা যায় কিনা। সিদ্দিক জামাল ভাই রাজি হলেন। খবর নিয়ে আমাকে বললেন গান রেকর্ড করা যাবে। তবে কিছু খরচ হবে। তুমি কি আমাকে ছয়-সাত শত টাকা জোগাড় করে দিতে পারবে? তখন স্টুডিও খরচ কম ছিলো। আমি শীর্ষ পর্যায়ে একজনের কাছে ছয়শত টাকা

চাইলাম- তিনি রাজি হলেন না এবং যখন রাজি হলেন না, তখন বললাম, অন্যকোনো মাধ্যমে আমি যদি এই ক্যাসেট করতে অগ্রসর হই- তাহলে কি আপনি অনুমতি দেবেন? বললেন যে, কোনোরকম খরচ দিতে পারবো না, অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে করে ফেলতে পারো।

এই বিষয়টা আবারো আমি সিদ্দিক জামাল ভাইকে জানালাম। বললেন, ঠিক আছে। ২/৩ দিন পরে আমি তোমাকে সব খবর জানাবো। ২/৩ দিন পর সিদ্দিক জামাল ভাই জানালেন যে, ক্যাসেট বের করার জন্য যতো খরচ লাগে সব খরচ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক এ.কে.এম নাজির আহমদ ভাই দেবেন, সেন্টারের পক্ষ থেকে। তবে তোমরা কোনো রকম সম্মানি পাবে না। তখন এমন সময় ছিলো যে, বলতে গেলে অর্থনৈতিক দিক থেকে আমরা সম্ভ্রষ্ট ছিলাম। ক্যাসেট বের করা বাবদ কিছু সম্মানি পাবো কি পাব না, এই চিন্তা আমার মাথায় ছিলো না। বরং আমি যার পর নাই আনন্দিত ছিলাম। আমাদের একটি নতুন ক্যাসেট বের হবে, এই ভাবনায়। এই সময় আরও একটি ভাবনা ছিলো, আমার মধ্যে যে, ক্যাসেট বের হবার পর বিপুল পরিমাণে বিক্রি শুরু হয়ে যাবে, তখন যে সব শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব টাকা দিতে চাননি, তারাই আমাকে ইসলামিক সেন্টারকে কেনো ফ্রী ক্যাসেট দিয়েছি সেই ব্যাপারে প্রশ্ন তুলবে এবং আমায় জবাবদিহি করতে হবে। ছয় মাসের মাথায় তাই হয়েছিলো। শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির আমাকে সাংঘাতিকভাবে ধরলেন এবং বললেন যে, আমি যা করেছি আপনাদের অনুমতি নিয়েই করেছি। এখন ইসলামিক সেন্টারের কর্মকর্তাদের সাথে আপনারাই যোগাযোগ করুন। ঠিক তারা বি.আই.সি পরিচালক নাজির আহমদ ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন এবং অধ্যাপক নাজির আহমদ ভাই পরবর্তী ক্যাসেট শুরুর জন্য তিন হাজার টাকা করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই সম্মানি পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত উঠেছিলো।

আমরা ঐ যে প্রথম ক্যাসেট করেছিলাম, ঐ ক্যাসেটের অধিকাংশ গান আমাদের সুর করা গান ছিল এবং ঐ যে প্রথম ক্যাসেট করেছিলাম, আমরা খুব পরিশ্রম করেছিলাম। কত দিন দেখেছিলাম সে সময়ে শিল্পীরা গানগুলো অনুশীলনের জন্য- অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করেছিলেন। ঐ প্রথম ক্যাসেটে যারা যারা কণ্ঠ দিয়েছিলেন তাদের সবার কথা হয়তোবা আমি বলতে পারবো না। কয়েকজনের কথা অবশ্যই বলতে পারবো। যেমন আব্দুল হালীম ভাই (ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বড় কর্মকর্তা), গিয়াস ভাই (জামালপুরের একটি কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ), ইজিনিয়ার রশিদুল হাসান তপন (বাংলাদেশ সরকারের একজন পদস্থ কর্মকর্তা), লোকমান ভাই (একজন প্রখ্যাত হিসাব কর্মকর্তা), তোফাজ্জল হোসাইন খান (ইসলামী ব্যাংকের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা), প্রখ্যাত গণসঙ্গীত শিল্পী আবুল

কাশেম, শিল্পী তারিক মুনাওয়ার, সাইফুল্লাহ মানছুরসহ আরও অনেক শিল্পী। আমাদের এইসব গান রেকর্ড করার উদ্যোগ নিয়েছিলো রিদম সাউন্ড সিস্টেমের স্বত্বাধিকারী জাফর ভাই। তার সাহসী ভূমিকার কথা আজও আমার মনে আছে। সে সময় রিহার্সেল করতে গিয়ে আমাদেরকে নানাভাবে বেগ পেতে হতো। নিজস্ব কোনো ভালো অফিস ছিলো না। নির্ভরযোগ্য ভালো জায়গাও ছিল না। ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তুদের মতো আমাদের আজকে এখানে তো কালকে অন্যখানে রিহার্সেল করার কথা ভাবতে হতো। আজকের নতুন শিল্পীদের যা কল্পনার বাইরে।

এই যে গান লেখা-সুর করা, গান ক্যাসেট করা আমরা যখন শুরু করেছিলাম, তখন দেশ ও জাতির খেদমত করা ছাড়া আমাদের আর অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না। ইসলামী ক্যাসেটের বাজার আজকে এতোটা শক্তিশালী হবে, সেদিন সে কল্পনাও আমরা করিনি।

স্মৃতির মানিক অখণ্ড সাইমুমের অখণ্ডাংশ কিছু কিছু

মীর কাশেম আলী ভাই ‘ফুল ফেপ কাগজের’ প্রায় দুই পৃষ্ঠার এক চিঠি পাঠালেন। পাঠালেন বাগেরহাটে। একেবারে আমার গ্রামের বাড়িতে। ঠিকানা পেলেন কোথায়? বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়!

চিঠির মর্মার্থ- ‘ঢাকায় চলে এসো, সাংস্কৃতিক কর্মসূচিকে একটি সমৃদ্ধ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিতে হবে।’

কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই প্রস্তুতি নিলাম। প্রস্তুতি নিলাম ঢাকায় আসার। কিন্তু নিজের দিকে তাকিয়ে ভীষণভাবে ভেঙে পড়লাম। ভেঙে পড়লাম নিজের অযোগ্যতার দিকে তাকিয়ে। তবু বড় ভাইকে ঢাকায় যাবার ব্যাপারে জানালাম। বড় ভাই কবি আহমদ আলী মল্লিক জানালেন : ‘ঢাকায় কেনো, বি.এল. কলেজে পড়ো, সুবিধে হবে, বি.এল.-এর বেশ কিছু শিক্ষকই আমাদের আত্মীয়।’

ঢাকায় পড়লে চোখ খুলবে আমি বললাম- ‘বাংলা অনার্স ঢাকায় পড়ায় সুবিধে বেশী’। ‘পুরনো রোগই তোমাকে পেয়েছে’ বড় ভাই বললেন- ‘আসলে রাজনীতিই তোমাকে খাবে।’

চট করে বলে বসলাম : ‘কেন্দ্রীয় সভাপতি যেতে বলেছেন, যেতেই হবে’।

‘তোমাদের কাছে কেন্দ্রীয় সভাপতি বড়- বড় ভাই বললেন- ‘তোমার কাছে তোমার কেন্দ্রীয় সভাপতি বড় না তোমার বড় ভাই’।

‘বড় হিসেবে বড় ভাই’- আমি বললাম জোরের সাথে- ‘কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসেবে কেন্দ্রীয় সভাপতি বড়’।

আমার এই জবাবে, খুব বেশী স্নেহ করতেন বলে, [আজ মনে হয়], দুঃখ পেয়েছিলেন বড় ভাই। দুঃখ পেয়েছিলেন- আমাকে এম.বি.বি.এস ডাক্তার বানাবার লালিত যে স্বপ্ন তার বহু আগেই চুরমার হয়ে গিয়েছিলো, সেখানে উচ্চশিক্ষিত বানাবার শেষ স্বপ্নটিও তার ধূলিসাৎ হয়ে যাবার সম্ভাবনা লক্ষ্য করে হয়তো।

‘কাজ শুরু করো’, মীর কাশেম আলী ভাই বললেন- ‘নিজে যা বোঝো, সামনে রেখে পথ চলো, সম্ভবত: এ-কাজে উপদেশ দেয়ার মতোও কাউকে পাবে না?’

‘আপনি দোয়া করুন’, আমি আবেগ তড়িত হয়ে বললাম- ‘আমার তো যোগ্যতাও নেই, অভিজ্ঞতাও নেই’।

‘অনেকেই তোমার জন্যে দোয়া করে’, মীর কাশেম আলী ভাই সোহাগ আর আদর মিশিয়ে বললেন- ‘সাংস্কৃতিক অঙ্গনও জেহাদের অঙ্গন, আল্লাহর সাহায্যই সফলতা এনে দেয়।

১৯৭৬ সালের এই যে স্মৃতি, এই স্মৃতি আজো আমাকে তড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, দুঃসহ বেদনার মরুভূমি পাড়ি দিতে সাহায্য করে।

দুই.

মুড়া পাড়া কলেজ। নারায়ণগঞ্জ জেলারই একটি কলেজ। কেন্দ্রীয় নেতা মাহমুদ হোসাইন আল মামুন সাহেব তখন ঐ কলেজেরই অধ্যাপক। কলেজের সংসদে এসেছে ইসলাম- পছন্দ ছাত্র- নেতৃত্ব। আল মামুন সাহেব এবং সে সময়ের বৃহত্তর ঢাকা জেলার প্রখ্যাত ছাত্রনেতা রেজাউল করিম শফিক ভাই, সংসদের অভিষেক অনুষ্ঠানে, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম সুসম্পন্ন করবার দায়-দায়িত্ব বর্তালেন আমাদের ওপর।

মিয়া মুহম্মদ আইয়ুব ভাইয়ের ‘সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী’ নামটি তারই দেয়া। তত্ত্বাবধানে নজরে মাওলা [বর্তমানে আমেরিকায় বসবাসরত], ফারুকী ভাই, রাশিদুল হাসান, গিয়াস ভাই [একটি মাদরাসার মুহাদ্দিস এখন] আমি এবং আরো কয়েকজন নতুন শিল্পী [অনেকের নাম আজ আর মনে নেই] মুড়া পাড়ায় হাজির হলাম। এবং ধুক পুক করা বুক নিয়ে, বাদ্যবিহীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু করলাম। ফারুকী ভাইয়ের ভরাট গলার গান উথরে গেলো। উথরে গেলো গিয়াস ভাইয়ের ‘কাদের গণি নামটি তোমার’। উথরে গেলো নজরে মাওলার দরাজ কণ্ঠের আবৃত্তি। কিন্তু সমবেতভাবে ইসলামী গান করতেই শুরু হয়ে গেল! বৃষ্টি মানে-কুচি কুচি ইটের টুকরো বৃষ্টি! বৃষ্টি মানে সংগৃহীত টমেটো এবং নানাবিধ অপাঙ্ক্বেয় দ্রব্যাদির বৃষ্টি।

আইয়ুব ভাইকে জড়িয়ে ধরে আমি খুব কঁদে ছিলাম সেদিন এবং কঁদেছিলাম সবাই- একটি সমবেত মোনাজাতের মধ্যস্থতায়। সে কান্না ছিলো পরাজয়ের এবং পরাভবের। কিন্তু একটি দৃঢ় অঙ্গীকারেরও। সেই অঙ্গীকার হচ্ছে- বাদ্যবিহীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে, ইসলামী গানের অনুষ্ঠানকে জনপ্রিয় করে তুলতেই হবে।

এখন যখন একটি বাদ্যবিহীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : হাজার হাজার জনতাকে উপভোগ করতে দেখি এবং উপভোগ করতে গিয়ে উদ্বেলিত হতে দেখি, ঠিক তখনই মুড়া পাড়ার সেই প্রকম্পিত স্মৃতিটি এক খণ্ড বিতাড়িত মেঘের মতো আচ্ছন্ন করতেই যেনো ধেয়ে আসে এই আমারই দিকে।

তারপর? তারপর কঁদে ফেলি, তারপর প্রচণ্ড অঙ্গীকারে আবারও উজ্জীবিত হই।

তিন.

‘৮২-র, ডাকসু-নির্বাচন তুঙ্গে। আমাদের প্যানেল ‘ইনাম-কাদের’ প্যানেল। যোগ্য প্যানেল। মিছিলে মিছিলে ভার্শিটির দিন-রাত্রি চূর্ণ-বিচূর্ণ। আমাদের খালি গলার মিলিত সঙ্গীতও তরঙ্গ-বিক্ষোভে উদ্বেলিত করতো ক্যাম্পাসের সার্বত্রিক দিগন্তকে।

মিছিলের অগ্রভাগের গানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাফাজ্জল ভাই (গাজীপুর ইসলামী ব্যাংকের বর্তমান ম্যানেজার)। পেছনের দিকে কাশেম ভাই, আমরা।

হঠাৎ প্রচণ্ড আওয়াজ। বোমা ফাটার শব্দ। এফ. রহমান হলের সামনের রাজপথ ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঢেকে গেলো। এক করুণ কাতরানির বর্ণমালা চতুর্দিকে। স্তম্ভিত আমি রাজপথের মধ্যখানে পড়ে থাকা কারোর লক্ষ্যে এগিয়ে যাই।

পায়ের অর্ধেকটা তাঁর পড়ে আছে সামনে। আধো-উচ্চ-স্বরে কষ্ট থেকে, তাঁর বারে পড়ছে- ‘আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ’। ইশারায় তিনি কাছে ডাকলেন আমাকে। চিনলাম এবং হতবিস্মল হলাম।

মাত্র এক সপ্তাহ আগেই ঐ মানুষটি আমাকে বলেছিলেন : ‘লিবিয়া থেকে আমার এক বন্ধু এসেছেন, ছোট বেলার বন্ধু, বিরাট ব্যবসায়ী, ফার্ম চালাবার জন্যে আমাকে নিয়ে যেতে চান, যাবো মল্লিক ভাই?’

‘ঠিক আছে, আপনি লিবিয়ায় যান’- আমি খানিকটা অভিমান করেই বললাম- ‘আর আমি চলে যাই বাগেরহাটে, ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন করে কী হবে?’

‘ঠিক আছে, যাবো না’- দৃঢ়তার সাথেই বলে উঠলেন মানুষটি। ‘আপনি না বললে যাবোই না’। সেই মানুষটি এক সপ্তাহ পরে এখন আমার সামনে বিচ্ছিন্ন একটি পা নিয়ে বসে আছেন।

আমি বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলাম- ‘ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের স্বার্থে যিনি একটি শোভনীয় চাকরী অগ্রাহ্য করতে পারেন, রবুল আলামীন, তাঁর পা ছাড়া আর কার পা কবুল করবেন? হ্যাঁ, এই পা-হারানো প্রতিভাবান শিল্পী ও গীতিকার তাফজ্জল হোসাইন ভাইয়ের সৌভাগ্যে সেদিন সত্যিই আমি ঈর্ষা অনুভব করেছিলাম।

সেদিন আমি ঈর্ষা অনুভব করেছিলাম আজীজ সাইফুল্লাহ ভাইয়ের সৌভাগ্যেও। যখন শুনেছিলাম-ভার্সিটিতে ভর্তি হতে এসে তিনিও তাঁর পা হারিয়েছেন। পা হারিয়েছেন আমাদের সাথে গান গাইতে গাইতে।

১৯৮২ সালের ২১ জানুয়ারিতেই মূলত সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো শিল্পীদের রক্ত আর ঘামের সন্নিহিত ঐশ্বর্যে।

চার.

একবার আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম- যে করেই হোক আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে শেষাবধি একটি আন্তর্জাতিক সম্মানে উন্নীত করবো। ফলে, আরবি-ফারসি এবং ইংরেজি গান শিখবার প্রয়োজনীয়তাকে স্বাগত জানানো হলো। পুরো রমজান মাসটাকে কাজে লাগাতে শুরু করলাম। একেবারে সেহরী খেয়ে ক্লাস। নিউ এলিফ্যান্ট রোডে।

একদিন তারিক মুনাওয়ারের কোনো খোঁজ নেই, খোঁজ নেই মুজাহিদেরও। ব্যাপার কি! এরা তো দেরী করে না।

মন ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠলো। বারান্দার রেলিং ধরে পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ দেখি- তারিক রক্তাক্ত। কিন্তু ঐ অবস্থায়ই দূর থেকে সালাম জানালো। হাসলো। কাছে এলো। জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলাম।

জানলাম তারিকদের হাইজ্যাকররা ছুরি মেরেছে। দুই ভাই-ই [তারিক-মুজাহিদ] কুংফু জানে বলে পেরে ওঠেনি হাইজ্যাকররা। ছুরি মেরেই পাশিয়ে গেছে।

এতোবড় ঘটনা ঘটে যাবার পরও ক্লাস আমাদের বন্ধ হয়নি। একটু সুস্থ হয়ে তারিকও ক্লাসে এসেছে। তারিক মুনাওয়ার এখন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী গণ-সঙ্গীত-শিল্পী, প্রখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন। আল্লাহ তার রক্ত কবুল করেছেন বলে মনে হয়।

পাঁচ.

একদা, আমার মাথায় ঢুকলো ইসলামী আন্দোলনের সর্বোচ্চ পরিবারগুলো থেকে প্রতিভা সংগ্রহ করতে হবে।

কয়েকটি লাভ হবে তাতে :

ক. প্রচুর সময় দিতে পারবে।

খ. নেতৃত্ব দিতে পারবে।

গ. মুসলিম-লীগ নেতাদের ছেশেমেয়েদের মতো হারিয়ে যাবে না।

ঘ. ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ব্যাপারে, ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বদ
পারিবারিকভাবেই মমত্ব অনুভব করবেন।

এইসব স্বপ্ন এবং সম্ভাবনাকে সামনে রেখে নোমান-সালমান, নিয়াজ-মানছুর,
তারিক-মুজাহিদ- কে 'সাইমুম পরিবারের' সঙ্গে যুক্ত করলাম।

ওদেরকে সত্যি সত্যিই গড়ে তুলতে চাইলাম মনের মতো করে। গড়ে তুলতে
চাইলাম ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের যথার্থ নেতৃত্ব হিসেবে।

আমার তখনও ধারণা ছিলো-মাটির মানুষ না হলে, মাটির মানুষের নেতৃত্বও
দেয়া যায় না। সুতরাং ওদেরকে নিয়েই আমি আমার পরিকল্পনামতো কাজ শুরু
করলাম। কাজ শুরু করলাম মাটির মানুষ বানাবার কাজ।

একদিন নোমানকে বললাম : 'নোমান, সমস্ত শিল্পীদের জুতোগুলো এলোমেলো
হয়ে আছে, সাজিয়ে রাখো।' নোমান কোনো রকম আপত্তি ছাড়াই ঝটপট
জুতোগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে রাখলো।

এই কাজ আমি, মাঝে-মধ্যেই ওদের প্রায় সবাইকে দিয়ে করিয়েছি একটি মাত্র
লক্ষ্যে-অহংকারের লেশমাত্রও যেনো ওদের মধ্যে না থাকে। ওদের এই ঔদার্য
দেখে অন্যরাও উদার হোক, অনুপ্রাণিত হোক।

শুধু যে জুতো সাজানোর কাজ ওদেরকে করিয়েছি তা নয়, শিল্পীগোষ্ঠীর জন্যে
প্রয়োজনীয় সব কাজই আমি ওদেরকে দিয়ে করিয়েছি- এমনকি পায়খানা-
পেশাবখানাও কাউকে কাউকে দিয়ে পরিষ্কার করিয়েছি। না করেনি। হাসি মুখে
মেনে নিয়েছে আমার সমস্ত কথাই।

নোমান এখন লন্ডনে, নিয়াজ আমেরিকায়, তারিক বুদ্ধিজীবী আলেমে দ্বীন,
মানছুর অধ্যাপক, সালমান আলীগড় থেকে এম.এ-তে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে,
'গোল্ড মেডেল' পেয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হতে যাচ্ছে, মুজাহিদ
গুরুতর ব্যাপার স্যাপার নিয়ে আজ কোরিয়ায় তো কাল সিঙ্গাপুরে।

ওদের কথা মনে পড়ে গেলে- কি এক পরিতৃপ্তিতে আজো আমার বুকের গভীরে
সমুদ্রে ঝড় ওঠে, আজো আমার বুকের গভীরে আছড়ে পড়ে উথাল-পাখাল
আবেগের তরঙ্গমালা।

ছয়.

এক সময় মনে হলো : ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমি আর একা নই। তাফাজ্জল ভাই, কাশেম ভাই, [সাণ্ডাহিক সমাজচিত্র সম্পাদক] হাসান আখতার ভাই, [এখন আখতার চাচা] রাশিদুল হাসান ওস্তাদ, অভিভাবক এবং অগ্রপথিক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। এদের ছিলো অতলান্ত হৃদয়। সব সংকটের এবং সকল সড়কে আমি এদেরকে পেয়েছি আপন বড় ভাইয়ের ভূমিকায়। এরা এদের সমস্ত প্রতিভা এবং বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়েছিলেন ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে সুসংগঠিত করবার জন্যে। শ্রম দিয়েছেন এরাই। খ্যাতি বেড়েছে আমার। কী বিচিত্র দুনিয়া। ফসল করার সবটুকু কষ্ট মুখ বুজে সয়ে গেলেন ওরা, আর ফসল উঠলো গিয়ে আমার ঘরে।

হ্যাঁ, এক সময় আরো মনে হলো : নাটকের ক্ষেত্রে এবং অনুষ্ঠানের উৎকর্ষের ক্ষেত্রে ঢাকার সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে আরো এগিয়ে নিতে হবে। চট্টগ্রামের পাঞ্জেরী শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক স.ম. রফিক ভাইয়ের কথা তাই সর্বাত্মে মনে পড়লো।

কেন্দ্রীয় সভাপতি এনামুল হক মঞ্জু ভাইকে ধরলাম, রাজি হলেন। মীর কাশেম আলী ভাইকে অনুরোধ করা হলো। রফিক ভাইকে রাবেতার ডাক্তার করে নেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন দ্বিরুক্তি ছাড়াই। এখন রফিক ভাইকে রাজি করানোর পালা। চট্টগ্রাম গেলাম। ডাক্তারি পেশায় আত্মনিয়োগ করবার সমস্ত আয়োজন তার প্রায় সম্পন্ন। কোথায় চেয়ার করবেন, কোথায় বাসা করবেন মোটামুটি একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। সোজাসুজি বললাম : ঢাকায় আপনাকে দরকার, একটি সম্মানজনক অবস্থায় ইসলামী সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে এগিয়ে নেবার জন্যে; সারা দেশে তা ছড়িয়ে দেবার জন্যে, কেন্দ্রীয়ভাবে আমাদের একই সাথে কাজ করতে হবে। রফিক ভাই একজন এম.বি.বি.এস ডাক্তার হিসেবে চট্টগ্রামে সহজেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন। চট্টগ্রামেই তার বাড়ি বলে। কিন্তু সব সম্ভাবনাকে ধূলিসাৎ করে ঢাকায় চলে এসেছিলেন তিনি এক মহান কর্তব্যের আহ্বানে। সবাই কি এরকম আসে?

সাত.

আসলে কাজ করতে করতে কাজের আরো রাস্তা খুলে যায়: তৈরী হয়ে যায় কাজের নতুন দিগন্ত। এক সময়, একটি নতুন গান লিখলেই রেকর্ড করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। রেকর্ড করতাম রেকর্ড প্লয়ারে একেবারে সাদামাটাভাবে।

সমাধান খুঁজতে লাগলাম। দুয়ার খুলে গেল। ভাবলাম কেরাত-হামদ-না'ত তো স্টুডিওতে রেকর্ড করা হয়ে থাকে। ঐ পদ্ধতিতে আমরাও তো রেকর্ড করতে পারি এবং একটি ক্যাসেট এ-ভাবে রেকর্ড করতে পারলে অবশ্যই কষ্ট কমে যাবে। যারই দরকার হবে সম্পাদিত ক্যাসেট থেকে কপি করে নেবে।

স্টুডিও থেকে রেকর্ড করার কিছু টাকা চাইলাম। ৬০০/৭০০ টাকার মতো। মূল দায়িত্বশীলরা গুরুত্ব দিলেন না। ধরলাম সিদ্দিক জামাল ভাইকে। ক'দিন পরে বললেন 'মাস্টার ক্যাসেটের সব খরচ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার বহন করবে, কিন্তু কোনো সম্মানী দেয়া যাবে না, অতোটা পারগতা এখনও সেন্টারের আসেনি।' বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেদিনের সেই ঔদার্য এবং সিদ্দিক জামাল ভাইয়ের সেদিনের সেই আন্তরিকতাকে আজো আমি ভুলতে পারিনি।

মূলত বাদ্যবিহীন ক্যাসেট বিপ্লবের সূচনা এ-ভাবেই হয়েছিলো। আজ তা কেউ স্বীকার করুন আর না করুন।

আট.

তালগাছের আড়াই হাত পাড়ি না দিয়ে নেমে আসার মতো ছাত্র-জীবন শেষ করলাম বি.এ. অনার্সের [বাংলা] ফর্ম ফিলাপ করেও অসুস্থতা ও আতঙ্কের কারণে পরীক্ষা দেয়া হলো না। সূতো-ছেঁড়া ঘুড়ির মত ইতি-উতি ঘুরে বেড়াই। হঠাৎ এ-দেশের তৌহিদী জনতার উজ্জ্বলতম নেতৃত্ব অধ্যাপক সাহেব আমাকে ডেকে বললেন 'তোমার সঙ্গী-শিল্পীদের ব্যাপারে কি ভাবছো? এক কাজ করো, তোমরা যারা বৃহত্তর আন্দোলনে এলে, সবাইকে নিয়ে সাইমুমের আরো একটি শাখা গঠন করো, এতোকাল বসে যারা তৈরী হয়েছে হারাবে না তাহলে তারা, নতুন উদ্যমে কাজ করতে পারবে। শাখা করবার দরকার কি?' আমি কোনোরকম অস্পষ্টতা ছাড়াই বলে ফেললাম 'সাইমুমের হয়েই আমরা কাজ করবো, অসুবিধে হবে না।'

সেদিনের সেই পরামর্শ কেনো যে গ্রহণ করিনি, এতো বড় বোকামী কেনো যে করলাম আজো আমার বুঝে আসে না।

নয়.

সাইমুমের প্রেম ও প্রতিষ্ঠা মানেই মিন্টু ভাই, প্রত্যয় ও প্রেরণা মানেই নাসের ভাই, মুজাহিদ ভাই, মাসুদ আলী ভাই, মাসুম ভাই, তাহের ভাই, মঞ্জু ভাই, বাচ্চু ভাই, মজুমদার ভাই, তাসনীম ভাই, আজহার ভাই। সাইমুমের আবেগ ও আনন্দ মানেই সিদ্দিক, সিরাজ, শহীদ, মঞ্জু। সাইমুমের ফেলে আসা দিনান্ত মানেই

হালীম ভাই, লোকমান ভাই, জাহিদ ভাই, আমজাদ ভাই, অন্তত আমার সময়ে।

‘অতীত দিনের স্মৃতি

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে

কেউ কমল মৃণালে হেরে অশনির জ্বালা

কেউ মজুরিয়া তোলে তার শুধু কুপ্তবীথি

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে....’- কাজী নজরুল ইসলাম

দশ.

সাইমুমের এতো স্মৃতি, এতো জ্বালা, এতো আনন্দ কি এক টানেই লিখে ফেলা
সম্ভব!

ফ্রান্স সফরের টুকরো স্মৃতি

এক.

জানুয়ারি [২০০২] শেষের দিকেই হবে, অথবা ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে হবে, আবু নাসের মোহাম্মদ আবদুজজাহের ভাইয়ের অফিসে গিয়েছি একুশে ফেব্রুয়ারি-ভাষা দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে সেমিনারের বাজেট পাশ করাতে এবং মীর কাশেম আলী ভাইয়ের নিকটে।

জাহের ভাইয়ের পিএস হুমায়ুন ভাইয়ের কাছে ভেতরে ঢোকবার অনুমতি চাইতেই, হেসে দিয়ে বললেন: যান দুই বসই ভেতরে আছেন, অন্য কেউ নেই।

হুমায়ুন ভাই সবসময়ই আমাকে, নাসের ভাইয়ের সাথে দেখা করার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন, আজও দিলেন; এই দেয়াটা আসলে ইসলামী আন্দোলনের একজন নগণ্য কবির প্রতি এক ধরনের গভীর ভালোবাসা এক ধরনের হৃদয়ময়তার পক্ষপাত।

এই এতোটুকু ভালোবাসা কবিদের কাছে অনেক ভালোবাসা। সুতরাং আবেগ আপুত চিন্তেই ভেতরে ঢোকলাম। সালাম পেশ করলাম এবং সালামের উত্তর দিয়েই চিরকালের স্নেহের ভাষায় বললেন :

কবি, তোমার জন্যে এক খোশখবর আছে, আমাদের ফ্রান্সের ভাইয়েরা তোমাকে ফ্রান্সে যাবার জন্যে দাওয়াত দিয়েছে, যাবে? আল মাহমুদ ভাই, কবি আল মাহমুদ ভাইকেও তারা দাওয়াত দিয়েছে।

আমি সরাসরি হ্যাঁ অথবা না বলে বললাম :

আমি কোরানে কারীমের স্তূত তিন জায়গায় পেয়েছি শিক্ষার জন্যে সফর করো, অভিজ্ঞতার জন্যে সফর করো এবং ইতিহাসের জন্যে সফর করো।

আমার কথা শেষ হতে-না-হতেই মীর কাশেম আলী ভাই মৃদু হেসে বললেন :
যাওয়া উচিত।

আমি মূলত সরাসরি উত্তর দেইনি এই জন্যে যে, তখনও আমার মধ্যে বিপুল পরিমাণের সংশয় কাজ করে যাচ্ছে।

সংশয়টা হচ্ছে- হয়তো শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সে যাওয়া হবে না। যেমন- যাওয়া হয়নি ইতালি, আমেরিকা এবং হচ্ছে। ক'বছর আগে থেকে এসব জায়গায় যাবার জন্যে একাধিকবার দাওয়াত পেয়েও কী এক অজ্ঞাত কারণে যেনো যাওয়া হয়ে ওঠে না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো- বছরের পর বছর চলে যায়, কিন্তু কেনো যে যাওয়া হলো না, তার কোনো কারণও কোনোভাবে উদ্ধার করতে পারি না। নাসের ভাই আবারও গভীর আন্তরিকতা নিয়ে বললেন : তুমি কেন্দ্রীয় অফিসের মাজহার ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ রাখো, সব খবরাখবর তাঁর কাছ থেকেই পাবে।

দুই.

মাজহার ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে না করতেই একদিন কবি আল মাহমুদ ভাই ফোনে জানালেন :

প্যারিস থেকে তোমার জন্যে একটা দাওয়াত এসছে, দাওয়াত পত্রটা মানছুরের কাছে আছে, আমিই ওর কাছে দিয়েছি, দৈনিক সংগ্রামের ঠিকানায় এসেছে, আমিও পেয়েছি দাওয়াতপত্র।

এই পর্যন্ত বলে, মাহমুদ ভাই উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন এবং আবারও বললেন :

এই যে কবি সাহেব, এ-দাওয়াত ইতালির দাওয়াতের মতো নয় তো?

আসলে আল মাহমুদ ভাই ইতালির দাওয়াতটা পেয়েছিলেন সরাসরি এবং প্রস্তুতিও নিয়েছিলেন, কিন্তু কেনো যে ভুল হয়ে গেলো সফরটা, আজো তিনি জানতে পারেননি- সেই কারণেই ঐ রসিকতা। সে যাই হোক, আমি কোনো প্রত্যক্ষ জবাব না দিয়ে মাহমুদ ভাইকে শুধু বললাম :

আগামীকালই আপনার সাথে সংগ্রামে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। আপনার সঙ্গে তখন কথা হবে।

তারপর মাহমুদ ভাই রিসিভার রেখে দিলেন এই বলে : তুমি মিয়া কথা ঠিক রাখবে তো? ঠিক আছে এসো।

তিন.

মাহমুদ ভাইয়ের সাথে কথা হবার দু-এক দিন পরেই মানছুরের সাথে যোগাযোগ করে জানতে পারলাম- হ্যাঁ- দাওয়াতপত্রটা তার কাছে আছে এবং আমি নিজে গিয়ে নিয়ে এলাম। চিঠিটা খাম থেকে বের করে পড়লাম এবং খুব গভীরভাবে :

বরাবর,
মুহতারাম কবি মতিউর রহমান মল্লিক
ঢাকা
বাংলাদেশ
শ্রদ্ধাভাজনেষু,
আসসালামু আলাইকুম।

আশা রাখি সুস্থ শরীরে কুশলেই দিনাতিপাত করছেন। আপনি শুনে খুশি হবেন যে, আমরা এক ঝাঁক তরুণ কবি-সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী মিলে গত একবছর পূর্বে বাংলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিষদ ফ্রান্স নামে একটি সংগঠন করেছি। আমাদের উদ্দেশ্য অপসংস্কৃতির মোকাবেলায় সুস্থ সাহিত্য সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা। এই লক্ষ্যে আমরা নিয়মিত সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি বার্ষিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই উপলক্ষে একটি শক্তিশালী সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রস্তুতি কমিটি আমাদের প্রথম বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলনে আপনাকে বিশেষ অতিথি হিসেবে দাওয়াত এবং বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদ প্যারিস পুরস্কারে ভূষিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আপনি শুনে খুশি হবেন যে, উক্ত সম্মেলন উপলক্ষে আমরা ‘প্রবাস কণ্ঠ’ নামে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর বাণী সম্বলিত একটি আকর্ষণীয় স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছি। উক্ত স্মরণিকায় প্রকাশের জন্য আপনার এক কপি ফটো এবং সেই সাথে আপনার একটি জীবন বৃত্তান্ত পাঠালে খুশি হব। এ ছাড়া আপনার নির্বাচিত কিছু শ্রেষ্ঠ কবিতা/ছড়া পাঠালে আমরা কৃতার্থ থাকব।

ভিসার জন্য আমরা একটি অফিসিয়াল আমন্ত্রণপত্র পাঠাচ্ছি। এর অনুলিপি ঢাকাস্থ ফ্রান্স দূতাবাসে পাঠানো হয়েছে।

আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করে শেষ করছি।

আপনার প্রিয়ভাজন
আব্দুল মান্নান আজাদ
সম্পাদক
সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি

তিনি আর উত্তর দেবেন না

আমার কাছে পৃথিবীটা যখন খুব অসঙ্গ হয়ে ওঠে তখন হৃদয়ের কাছাকাছি (শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, ভক্তি ও আবেগে) কারুর কাছে ছুটে যাই। সেদিন ছুটে গিয়েছিলাম প্রেম, প্রকৃতি ও আদর্শের কবি আল মাহমুদ ভাইয়ের কাছে। ভেবেছিলাম তাঁর কাছ থেকে কিছু প্রশান্তি নিয়েই চলে যাবো সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে। ক’দিন ধরে যাবো যাবো করছি অথচ যাওয়া হচ্ছে না-নানান ঝামেলায়। না যাওয়ার অপরাধ যদিও ছড়িয়ে ছিলো আমার সমস্ত অস্তিত্বে। যাই হোক শিল্পকলা একাডেমিতে আল মাহমুদ ভাইয়ের কাছে যাবার পর, তাঁর এমন একটা জরুরি কাজ নিয়ে সূর্যসেন হলে যেতে হলো যে, সরাসরি হাসপাতালে আর যাওয়া হলো না। হলের কাজ সেরে ফিরতে যাচ্ছি এমন সময় হাফেজ সুলতান ভাই বললেন, জানাজায় যাবেন নাকি? আমি খানিকটা অবাক হয়ে বললাম, কার জানাজায়? বললেন, হাসানুল করিম সাহেবের। দুপুরের খবরে রেডিও বলেছে। খবরটা শোনার সাথে সাথেই আমার পরিচিত পৃথিবীটা যেনো মুহূর্তেই রং বদলালো (এ রং ঝাপসা আর বিষয়, আধো চেনা, আধো অচেনা)। তাহলে হাসানুল করিম ভাই নেই! আমার মধ্যে তখন প্রচণ্ড অপরাধ আর অব্যক্ত বেদনার অনুভূতি! হায়রে! একদিন আগেও যদি হাসপাতালে যেতাম তাহলে আজকের এই হাহাকারটা এমন করে মোচড় দিয়ে উঠতো না।

জানাজায় গিয়েছিলাম কিন্তু শেষবারের মতো তাঁর মুখ দেখবার সাহস আর আমার হয়নি। না জানি তিনি বলে ওঠেন- এখন কেনো? আগে কোথায় ছিলে? এই ভয়ে।

হাসানুল করিম ভাইয়ের সাথে পরিচয় খুব সুদীর্ঘ সময়ের না হলেও একেবারে কম দিনের নয়। যতোটুকু জানবার আমার সুযোগ হয়েছে তাঁকে ততোটুকুই আমার কাছে এখন অনেক পাওয়ার মত মূল্যবান। তাঁর কথা মনে হলেই সেই সব টুকরো টুকরো স্মৃতি আমার মধ্যে ঝড় তোলে। কি এক অজানা ব্যথায় কঁকিয়ে উঠি বারবার।

পাঁচ-ছ' বছর আগে আমি রাজধানীতে আসি। অপরাধের বোঝা বয়ে ফিরি একা একা। কারুর সাথেই তেমন একটা জানাশোনা নেই। সবাই এড়িয়ে চলেন- দু'এক জন জানা শোনা যারা তারাও। রাজধানীতে টিকে থাকবার মতো একটা অবলম্বন খুঁজছি দারুণভাবে। হঠাৎ পত্রিকায় দেখলাম স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উপলক্ষে স্বরচিত কবিতা প্রতিযোগিতার খবর। কবিতা পাঠালাম। রাজধানীর প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পাবো এমন আশা না করাটাই আমার জন্য স্বাভাবিক ছিলো। কোনো খোঁজ-খবরই আর নেইনি। বেশ কিছুদিন পর একটি দৈনিকে সেই পাঠানো কবিতাটি ছাপার অক্ষরে দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম। আরো বিস্মিত হলাম কবিতাটির নীচে পুরস্কারপ্রাপ্ত কথাটা লেখা দেখে।

কবিতা প্রতিযোগিতায় ১ম হবার আনন্দে ক'দিন পরেই পুরস্কার আনতে গিয়েই স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদের সাহিত্য সভার সাথে জড়িয়ে পড়লাম। সপ্তাহের ছ'দিনই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম সাহিত্য সভার জন্যে। মাঝে মাঝে চিঠি পেয়ে আরো বেশী উত্তলা হয়ে পড়তাম। অবশ্য সব সময় যাওয়া সম্ভব হয়ে উঠতো না। কিন্তু একটি মানুষের প্রতি আমার আকর্ষণ বেড়ে যাচ্ছিল যেনো। সাহিত্য সভায় তাঁর আলোচনা সবচেয়ে বেশী আমাকে মুগ্ধ করতো। ভুল-ত্রুটি এতো মার্জিত ভাষায় ধরিয়ে দিতেন যে শ্রদ্ধায় আপুত হয়ে পড়তাম। সেই সাথে তাঁর প্রাণ-খোলা উচ্চহাসি আমার মধ্যে আরো বেশী হৃদয়াবেগের সৃষ্টি করতো। কিন্তু সংকোচে কাছে যেতাম না। যদিও ব্যক্তিত্বটি ইতিমধ্যে নাম ধরে অর্থাৎ নামের শেষাংশ ধরে আমাকে ডাকতে শুরু করেছেন। একটি ব্যাপার আমাকে খুবই আলোড়িত করতো, তা হলো তাঁর 'তাবাসুসুম' 'তাবাসুসুম' হাসি। তাঁর এ হাসিটি কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে অবিরল ধারায় বরতো আর বরতো।

আন্তে আন্তে সেই ব্যক্তিত্ব, এই হাসানুল করিম ভাইকে আরো জানার সুযোগ হলো। স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদকে জানার সুযোগ হলো- রাজধানীতে টিকে থাকবার একটা অন্তর-সিন্ত অবলম্বন যেনো পেয়ে গেলাম।

এক সময় ঢাকা ডাইজেষ্টের ধারে কাছে থাকবার জায়গা পেয়ে যাই। ভয়ে সম্পাদক সাহেবের টেবিলে যাই না। আবার পত্র-পত্রিকার লোভও সামলাতে পারি না, কি মুসকিল। এ আঁধার বেশী দিন থাকলো না। হাসানুল করিম ভাইকে পেয়ে গেলাম ঐ অফিসেই। ব্যাপার কি? এখানে কেনো? পরে জেনেছিলাম ডাইজেষ্টের একজন কর্মকর্তা লেখক তিনি। একরায়ুল মাওলা ছদ্মনামে চলচ্চিত্র সমালোচনা করেন। সমালোচনাটি আমি নিয়মিতই পড়তাম। সত্যি বলতে কি, এই বিষয়ের উপর অন্য কোনো লেখা আমি আদৌ পড়তাম না। ভালো লাগতো না। সম্ভবত: অন্য কোনো লেখায় আমি আমার হৃদয়ের প্রতিফলন দেখতে পেতাম না।

অনেকেই শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন। কথা উঠলে বলতে শুরু করেন, ঐ সব ন্যাকামী দেখলে গা জ্বলে যায়, সমাজের কোন কচুটা হবে ও দিয়ে। এ ধরনের কথা শুধু সংকীর্ণমনারাই বলেন না, অনেক বিদগ্ধজন, নেতারাও চিড়িং বিড়িং করে বলে থাকেন। কিন্তু একথা অবধারিত সত্য যে, শিল্প এবং সংস্কৃতির চর্চা যে জাতির মধ্যে নেই, সে জাতি রাজনৈতিক দিক থেকে ক্ষমতা লাভ করলেও অচিরেই দেউলিয়া হয়ে পড়তে বাধ্য। এ উপলব্ধি হাসানুল করিম ভাইয়ের মধ্যে পুরোপুরিই ছিলো। সেই জন্য গল্প, প্রবন্ধ, কবিতায় হাত না দিয়ে হাত দিলেন নাটক, রম্যরচনা ও চিত্র সমালোচনায়। একরামুল মাওলা আর লিখবেন না। কে আর আমাদেরকে আশাব্যিত করবে এখন? কে আর তুলে ধরবে চলচ্চিত্রে অকল্যাণকর দিকটি?

ডাইজেষ্টের কি এক কাজে তাঁর একদিন অনেক রাত হয়ে গেলো। বাসায় ফিরতে পারলেন না। জানালেন আমার কাছেই থাকবেন। সারারাত শিশুর মতো ঘুমোলেন। সে কি ঘুম! আমার ছেঁড়া আর ময়লা লুঙ্গি পরতে তাঁর মধ্যে এতোটুকু সংকোচও লক্ষ্য করিনি সেদিন। তাঁর জানাজায় হাজার হাজার মানুষ এসেছিল দূর-দূরান্ত থেকে—সাংবাদিক মান্নান ভাই বলেছেন। কেনো এসেছিলো অন্য কারো বুঝতে কষ্ট হলেও আমার হয়নি।

হাসানুল করিম ভাই অনেক অনেক গুণের অধিকারী মানুষ ছিলেন। মজলিসী আলোচনায় অমন দক্ষ লোক বিরল। কি যুক্তিতে, কি উচ্চারণের বলিষ্ঠতায়, কি বক্তব্যের মোহময়তায় তিনি এক পারঙ্গম যেনো। তাঁর কথাবার্তার একটা বিশেষ ফর্ম ছিলো। যেখানে উপমা-উৎপ্রেক্ষা থাকতো, থাকতো অলঙ্কারের প্রাবল্য যা একজন শ্রোতাকে খুব সহজেই জড়িয়ে নিতে সক্ষম হতো। এ জন্যে একজন সুনির্দিষ্ট আদর্শের ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত হবার পরও তাঁকে কেউ দূরে ঠেলেতে পারতো না। মূলত: নিজের পরিচয় দিতে তাঁর কোনো সংকোচও ছিলো না আদৌ।

হাসানুল করিম ভাইয়ের ছিলো নাদুস নুদুস শরীর, ছিলো ডাগর ডাগর চোখ আর একমুখ ঘনকালো দাড়ি, সবমিলিয়ে সুঠাম দেহের অধিকারী ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্বটির ভোজন বিলাসও ছিলো উল্লেখযোগ্য। অন্যকে খাওয়ানোর ব্যাপারে তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিলো না। পকেট গড়ের মাঠ, অন্তর ডাকাতিয়ার বিশাল বিস্তৃত বিল যেনো। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা এ কথার স্বীকৃতি বহুবার দিয়েছেন।

সুর সম্পর্কে, গান সম্পর্কে তাঁর গুস্তাদী জ্ঞান ছিলো। অনেকেই এ সম্পর্কে হয়তো তাঁকে জানতেন না। মেহদী হাসানের গজল তাঁর কণ্ঠে যিনি শুনেছেন তিনি নিশ্চয়ই আমার ঐ কথার সাথে একমত হবেন। অসংখ্য বাংলা গানের সুর জানতেন হাসানুল করিম ভাই। অথচ জটিল অর্থ শাস্ত্রের ছাত্র ছিলেন তিনি।

এককথায় জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর কমবেশী পদচারণা ছিলো।

ঢাকা ডাইজেস্ট এর যারা পাঠক তাঁদের কাছে ‘উত্তর দিচ্ছি’ বিভাগটি খুব প্রিয়তো বটেই: জানা-অজানা অনেক কথাই রসালো ভঙ্গীতে বলা হতো বলে আকর্ষণীয়ও। এ বিভাগটিও হাসানুল করিম ভাই পরিচালনা করতেন। চতুর্মুখী জ্ঞান ছিলো বলেই খুব সহজেই, এ কাজটি তিনি করে যেতে পেরেছেন। “উত্তর দিচ্ছি” বলে কখনো তিনি আর উত্তর দিবেন না। লক্ষ ডাকাডাকির ভিড়ে কখনো তিনি আর কথা বলে উঠবেন না।

মাসাধিককাল রোগাক্রান্ত ছিলেন হাসানুল করিম ভাই। ‘পেরিকারডিয়াল এফিউসন’ রোগের আক্রমণে তিনি গত অক্টোবর মাসের ২২ তারিখ, বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে পাঁচটায় শেরে বাংলা নগরস্থ শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। রেখে গেছেন মা, তিন ভাই ও ৪ বছরের একটি পুত্র সন্তান। ওরা সবাই তাঁর জন্যে কাঁদবে। তাঁর অসংখ্য বন্ধুরাও কাঁদবে কিন্তু কখনও হাসানুল করিম ভাই আর উত্তর দেবেন না কারুর। লিখবেন না রেডিও বাংলাদেশ ঢাকার জন্য কথিকা, আমাদের জন্য নাটক, রম্যরচনা, চলচ্চিত্র সমালোচনা, আর বলরাজ ছদ্মনামে সংলাপ কার্টুন- না, কিছুই না।

অনূদিত প্রবন্ধ

[অগ্রস্থিত]

প্রসঙ্গ কথা

কবিতা ও গানের পাশাপাশি অনুবাদের ক্ষেত্রে কবি মতিউর রহমান মল্লিক ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এখানে দুটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। ১. কোরআনের আলোকে মুসলিম জাহাতিচিন্ত ও আলোকিত দৃষ্টির অধিকারী। ২. হাদীসের আলোকে নিজের পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে জবাবদিহির অনুভূতি। প্রথম প্রবন্ধটির মূল লেখকের পরিচয় আমরা উদ্ধার করতে পারিনি। দ্বিতীয় লেখাটির মূল লেখক মুহম্মদ আলী হাশমী।

সূচিপত্র

কোরানের আলোকে: মুসলমান জাতিতচিস্ত ও আলোকিত দৃষ্টির অধিকারী
হয়ে থাকে/ ২৭১

হাদীসের আলোকে: নিজের পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে জবাবদিহির
অনুভূতি/ ২৭৩

কোরানের আলোকে : মুসলমান জাতিতচিহ্ন ও আলোকিত দৃষ্টির অধিকারী হয়ে থাকে

ইসলাম সর্বপ্রথম একজন মুসলমানের কাছে যে বিষয়টা দাবী করে, তা হচ্ছে- সে আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে ঠিক যেভাবে তাঁর ওপর ঈমান আনা কর্তব্য। তাঁর সাথে নিজের সম্পর্ক করবে গভীর এবং সুদৃঢ়, সর্বক্ষণ তাঁর স্মরণে থাকবে মশগুল এবং ভরসা করবে তাঁরই ওপর। কোনো না কোনো উপায় অবলম্বন করার সাথে সাথে তাঁর সাহায্যেরই আকাঙ্ক্ষী থাকবে এবং অন্তরের অন্তস্তল থেকে এই ধারণাই পোষণ করবে যে, যতোই প্রচেষ্টা সে চালাক না কেনো এবং যতো রকমের উপায় অবলম্বন করুক না কেনো, সে সবসময়ই আল্লাহর শক্তি-সাহায্য এবং পৃষ্ঠপোষকতার মুখাপেক্ষী।

একজন সত্যপন্থী এবং সত্যিকারের মুসলমান হয় জাতিত চিহ্ন এবং আলোকিত দৃষ্টির অধিকারী। দুনিয়াতে আল্লাহর আজব ও দুর্লভ সৃষ্টি শিল্পের সে হয় পর্যবেক্ষক এবং সে এই বিশ্বাস রাখে যে, পার্থিব বিষয়াদি এবং মানুষের কর্মকাণ্ডের অন্তরালে আছে আল্লাহর গোপন ও স্বর্গীয় হাতের নির্দেশাবলী। এই কারণে সে সর্বদা আল্লাহর জিকিরে ডুবে থাকে। সে জীবনের প্রতিটি চমকের মধ্যে এবং দুনিয়ার প্রতিটি দৃশ্যের ভেতরে খোদার কুদরতের সীমাহীন প্রভাব অবলোকন করে। যার ফলে তার ঈমান আল্লাহর জিকিরে এবং তাঁর ভরসায় আরো প্রবৃদ্ধি লাভ করে। সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে :

পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের পালাক্রমে যাওয়া-আসার মধ্যে যে সমস্ত বুদ্ধিমান লোক উঠতে, বসতে ও শয়নে সব অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর গঠনাকৃতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তাদের জন্য রয়েছে বহুতর নির্দশন। [তারা আপনা আপনি বলে ওঠে] হে আমাদের প্রভু! এসব তুমি অনর্থক ও উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করোনি। বাজে এবং নিরর্থক কাজ করা থেকে তুমি পাক ও পবিত্র। [১৯০-১৯১]

দুই.

এই জন্যে এটা কোনো বিস্ময়কর কথা নয় যে, একজন সত্যিকারের মুসলমান আল্লাহ তাঁলার সমস্ত নির্দেশ পালনকারী, তাঁর সামনে বিনয় অবলম্বনকারী, আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমার সংরক্ষণকারী, তাঁর হুকুমের বাস্তবায়নকারী [ঐ হুকুম তার ইচ্ছার বিপরীত হলেও], তাঁর নির্দেশিত পন্থা অবলম্বনকারী তা তার স্বভাববিরুদ্ধ হলেও] হবে। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানের ঈমানের পরীক্ষা হলো : প্রত্যেকটি ব্যাপারে- ছোট হোক বা বড়-দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই আল্লাহ এবং রসূলের হুকুমের আনুগত্য করবে। নবী [সা.] বলেন :

ততোক্শণ পর্যন্ত তোমাদের ভেতর থেকে কেউ-ই মোমিন হতে পারবে না, যতোক্শণ না তার কামনা-বাসনা-ইচ্ছা আমার আনীত শরীয়ত অনুযায়ী না হবে।

সূরা আননেসায় বলা হয়েছে :

না, হে মুহাম্মদ, তোমার রবের কসম: এরা কখনোই মোমিন হতে পারবে না। যতোক্শণ পর্যন্ত নিজেরা পারস্পরিক অনৈক্য দূরীকরণে এরা তোমাকে বিচারকর্তা না মানবে। তারপর যা কিছু তুমি বিচার করবে, তাতে নিজেরদের অন্তরে যেনো কোনো রকম কমতি অনুভব না করে। বরং হুবহু যেনো মেনে নেয়।

এটাই আল্লাহ এবং রসূলের পূর্ণ আনুগত্য। যেটা না হলে না ঈমানের সত্যতা প্রমাণিত হয়, না ইসলামের। এই প্রেক্ষাপটে অসম্ভব যে, মুসলমানের জীবনে আল্লাহর পথের প্রতি অবাধ্যতা এবং রসূলের নির্দেশের প্রতি উদাসীনতা থাকবে। এরকমটি না তার ব্যক্তিগত জীবনে হবে, না তার পরিবারের লোকদের জীবনে হবে, না তার আত্মীয়দের জীবনে হবে- যারা তার প্রশিক্ষণের আওতায় এবং তত্ত্বাবধানের আওতায় রয়েছে; যাদের ওপর তার দায়-দায়িত্ব রয়েছে এবং যাদের ওপর তার কর্তৃত্ব রয়েছে।

আল হাদীসের আলোকে

নিজের পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে জবাবদিহির অনুভূতি

কোন মুসলমানের পরিবারের কোন সদস্য যদি আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের বিচারালয়ে কোনো বিচ্যুতি, কর্মবিমুখতা এবং উদাসীনতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়, তাহলে সে দায় ঐ মুসলমানেরই বহন করতে হবে। এবং সে ব্যাপারে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। হাদীসে রয়েছে :

তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল; আর তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। [বুখারী-মুসলিম: ৬৬৫৩]

এই জিম্মাদারীর অনুভূতি সত্যিকারের কোনো মুসলমানকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। এই ব্যাপারে সে ধৈর্য ও ধারণ করতে পারে না। পরিণাম তাই যাই হোক না কেন! এই জিম্মাদারীর অনুভূতি তাকে তার সমস্ত উপায়-উপকরণ ব্যবহারে প্রাণান্ত করে ছাড়ে।

ওই দায়দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে ঐ ব্যক্তিই চূপচাপ থাকতে পারে- যার ঈমান দুর্বল, প্রাণহীন যার দ্বীন অনুভূতি এবং যার পৌরুষও স্তিমিত।

দুই.

সত্যিকারের মুসলমান আল্লাহর বিচার এবং নিজের তাকদীরের ওপর আস্থা রাখে। সে রসূলের [সা.] ঐ হাদীসকে গুরুত্ব প্রদান করে চলে :

মুসলমানের ব্যবসায়- লেনদেনই বিশ্বয়কর এবং অদ্ভুত। তার প্রত্যেকটি কাজেই রয়েছে মঙ্গল। যদি তার কোনো আনন্দ অর্জিত হয় তো গুরুরিয়া আদায় করে।

এটাই তার জন্যে উত্তম হয়। আর যদি সে কষ্টে পড়ে তো ধৈর্য ধারণ করে।
এতেও তার জন্যে মঙ্গল থাকে। [বুখারী]

সত্যিকারের মুসলমান নিজের অন্তরে এ আকিদাই পোষণ করে যে, তাকদীরের
ওপরে বিশ্বাস রাখা ঈমানেরই একটা স্তম্ভ- রোকন। এই জীবনে তার যা পাওয়ার
আছে, সে ব্যাপারে কোনো ভুল হবার নয়। কেননা তাতো তার ভাগ্য লিখন।
যা নির্মূল করার শক্তি তার নেই। তেমনিভাবে সে এ-আকীদাও পোষণ করে যে,
আল্লাহ্‌ তালার নির্ধারিত তাকদীরের ওপরে সম্ভ্রষ্ট থাকায় আল্লাহরই পক্ষ থেকে
অধিকতর সওয়াব মিলবে, আর সে তালিকাভুক্ত হবে- আল্লাহর ওপর ঈমান
আনায়নকারী এবং তাঁর আনুগত্যকারী, এবং সাফল্য লাভকারীদের।

এই জন্যে তার প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে থাকে কল্যাণ। যদি তার কোনো আনন্দ
অর্জিত হয় তো সে আল্লাহ তালার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তাঁরই কৃতজ্ঞতা যিনি
তাকে ঐ নেয়ামতে ভূষিত করেছেন, তার ওপর ককুণা করেছেন। আর যদি সে
কোন কষ্টের মুখোমুখি হয়ে গিয়ে থাকে তো আল্লাহর নির্দেশে হয়েছে বলে- সবর
করে। তার তাকদীরের ওপরে সম্ভ্রষ্টি প্রকাশ করে। এই দুই অবস্থাতেই তার
জন্যে রয়েছে সম্মান।

মহানায়ক

প্রসঙ্গ কথা

‘মহানায়ক’ কবি মতিউর রহমান মল্লিকের অনূদিত একটি উপন্যাস। পাক্ষিক পালাবদলে এটির ধারাবাহিক পর্ব ছাপার একটি তথ্য পাওয়া গেলেও সেটি উদ্ধার করা যায়নি। কবি আফসার নিজামের কাছে সংরক্ষিত কবির ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ ‘মহানায়ক’ উপন্যাসের কিয়দাংশ পাওয়া যায়। সেই অংশ বিশেষ এখানে উল্লেখ করা হলো। তবে সেখানে মূল লেখকের নাম পাওয়া যায়নি।

মহানায়ক

“আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস রয়েছে যে, আমরা শত্রুদের প্রতিরোধ করতে পারবো, প্রতিরোধ করতে পারবো সমস্ত বেঈমানদের। সম্মানিত সুলতান, আমরা নিরাশাবাদী নই”- বললো কমান্ডার।

“প্রিয় বন্ধুগণ, দুটি ব্যাপার থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখবে” বললেন সুলতান আইউবী- “এক. নৈরাশ্য; দুই. মানসিক বৈকল্য। মানুষ প্রথমত নিরাশ হয়, তারপর তাকে পেয়ে বসে মানসিক বিলাসিতায়, মানসিক বৈকল্যে। ফলে, সে হয়ে পড়ে দায়িত্বমুক্ত এক অর্থব মানুষ।”

আপাতত আলী বিন সুফিয়ান বেরিয়ে পড়লেন। বেরিয়ে পড়লেন এক দ্রুতগামী ঘোড়াসাওয়ারকে এই নির্দেশ দিয়ে যে, “রবিন এবং তার চার সঙ্গীকে ঐ মেয়েগুলোসহ রাজধানীতে পাকড়াও করে নিয়ে আসতে হবে; নিয়ে আসতে হবে ঘোড়ায় অথবা উটে চড়িয়ে; নিয়ে আসতে হবে সেনা প্রহরায়।”

হ্যাঁ, আলী বিন সুফিয়ান ছয়-সাতজন সৈনিক নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বালিয়ানের তালাশে বেরিয়ে পড়ার সময় সুদানী কমান্ডারদের সাথে কথা বললেন, হেড কোয়ার্টারের বাইরে অপেক্ষমাণ সুদানী কমান্ডাররা বালিয়ান সম্পর্কে আলী বিন সুফিয়ানকে জানালো যে, “বালিয়ান যুদ্ধের ময়দানেও যায়নি, যায়নি রোম-উপসাগরের ছাউনির দিকেও। শেষ অবধি আলী পৌঁছে গেলেন একেবারে বালিয়ানের বাড়িতে। যেখানে দু’জন বয়সী চাকরানী ছাড়া এখন আর কেউ নেই। বালিয়ান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেই এই বৃদ্ধারা বললো, “এ- বাড়িতে থাকতো পাঁচজন যুবতী এবং নিয়মিত। এর মধ্যের কারো রূপ-লাবণ্য একটুখানি স্নান হয়ে এলেই বালিয়ান তাকে বিদায় করে দিয়ে নিয়ে আসতো অন্য আর একজন রূপ-লাবণ্যময়ী যুবতীকে। এই প্রক্রিয়ায় এক ফিরিস্তী রূপসী এসেছিলো বিদ্রোহের আগে। মেয়েটি ছিলো সত্যিই অপূর্ব এবং অত্যন্ত চতুর। খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের মালিক হয়ে পড়েছিলো তার হাতের পুতুল। বিদ্রোহ সংঘটিত হবার পর সুদানীরা আত্মসমর্পণ করলো যখন, আমাদের মালিক তখন সাতজন ঘোড়াসাওয়ারসহ রাতের অন্ধকারে, ঐ মেয়েটিকে নিয়ে চলে গেলেন। মালিকের চলে যাবার পর, হাতের কাছে যে যা পেলো, তাই নিয়ে ভেগে গেলো হারেমের অন্যান্য যুবতীরা।”

আলী বালিয়ানের বাড়ি থেকে বেরোবার মুহূর্তেই ঘোড়া থেকে তার সামনেই লাফিয়ে পড়লো আর এক ঘোড়সওয়ার। নাম ফখরুল মিসরী।

ফখরুল মিসরী হাঁফাতে-হাঁফাতে বললো, “আপনাকে খুঁজে-খুঁজে হয়রান হয়ে এখানে এসেছি। আমি বালিয়ান এবং তার সঙ্গী মেয়েটির সন্ধান পেয়ে গেছি। আমি পিছু নিয়েছিলাম ওদের। সুতরাং ওরা কোন্ দিকে গেছে তা আমার জানা হয়ে গেছে। ওদের সাথে আছে সাতজনের মত প্রহরী। অন্য দিকে আমি একা বলে ওদের ওপর আক্রমণ চালাতে পারিনি, ফিরে এসেছি। অথচ আমি ওদের নিজের হাতে হত্যা করতে চাই। নিজের হাতে হত্যা করে প্রতিশোধ নিতে চাই। ওদেরকে নিজের হাতে হত্যা না-করা পর্যন্ত আমার আরাম হারাম”- ফখরুল মিসরী উত্তেজনায় আলী বিন সুফিয়ানের হাত জড়িয়ে ধরে বললো- “আল্লাহ ওয়াল্লে আমাকে মাত্র চারজন সৈনিক দিন। আমি এই মুহূর্তে আবারও ওদের পিছু ধাওয়া করবো এবং হত্যা করেই তবে ফিরে আসবো।”

“ওরা কোথায়”- জিজ্ঞেস করলেন আলী।

“ওরা যাচ্ছে রোম-উপসাগরের দিকে। যাচ্ছে প্রধান সড়ক এড়িয়ে এবং খুব সাবধানতার সঙ্গে।”

“চার জন নয়, বিশজন ঘোড়সওয়ারই আমরা দিছি তোমাকে। না, এতো তাড়াতাড়ি ওরা ওদের গন্তব্যে পৌঁছতে পারেনি”- ফখরুল মিসরীকে আলী সান্ত্বনা দিলেন- “আমিও থাকছি সাথে”।

এদিকে বালিয়ান এবং সুন্দরী-রূপসী অনন্যা মুবী অনেক পথ অতিক্রম করেছে, পাড়ি দিয়ে গেছে অনেক-অনেক দূর। কিন্তু সোজা পথে নয়, প্রধান সড়ক এড়িয়ে, বিকল্প পথে। এইসব পথ বালিয়ানের চেনা-জানা ছিলো আগে থেকেই। ফলে তেমন কোনো অসুবিধা হয়নি তাদের।

বালিয়ান পালিয়ে যাচ্ছে। সালাউদ্দীন আইউবীর ভয়ে সে দিশেহারা। ফলে সে জানতেই পারেনি যে, সালাহউদ্দীন আইউবী সুদানীদের ব্যাপারে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন।

বালিয়ান মুবীর মতো সুন্দরীকে হাত ছাড়া করতে চাচ্ছে না। সবকিছু হারিয়ে আজ সে ফেরারী। এই ফেরারী জীবনে মুবীর স্বাদ আনন্দনই তার কাম্য। কাম্য ওকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে বাঁচার সুযোগের সন্ধান।

বালিয়ানের চোখে এখন মুবী অপূর্ব, অভূতপূর্ব। এর আগে বালিয়ানের ধারণা ছিলো- মিশরী মেয়েরা এবং সুদানী মেয়েরাই পৃথিবী শ্রেষ্ঠা। কিন্তু ইটালীর মেয়েরা যে এতো সুন্দরী বালিয়ান তা বুঝতে পেরেছে মুবীকে দেখা মাত্রই, ছোঁয়া মাত্রই।

বালিয়ান তাই মুবীর রূপে অঙ্ক হয়ে বর্জন করেছে তার নিজের দীন, নিজের দেশ। সে অকুণ্ঠিত তার পদ, তার মর্যাদা বিসর্জনেও।

এদিকে মুবীর মনে অন্য ভাবনা। সে এখন পালিয়ে যাবার চেষ্টায়ই ব্যস্ত। কেননা যে-মূল লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে সে- এক বয়স্ক লোকের কাছে- বিকিয়ে দিয়েছে তার যৌবন, তার ইজ্জত, সেই লক্ষ্য অর্জন করা তার সম্ভব হলো না। সম্পূর্ণ ব্যর্থ এখন সে।

বালিয়ানের মোটা মাথায় ধরছেই না যে, মুবী এখন তাকে ঘৃণার চোখেই দেখছে। অথচ সেই মুবীর কাছেই বালিয়ান খুঁজছে অতৃপ্ত হৃদয়ের চূড়ান্ত পাওয়ার অভিপ্রায়।

যেভাবেই হোক রবিনকে খুঁজে বের করাই এখন মুবীর প্রধান কাজ। এ কাজে, এ-অভিয়ানে- যেহেতু মুবী নারী, সেহেতু তার একজন পুরুষ-সঙ্গীর একান্ত প্রয়োজন। বালিয়ান সেই কারণে, মুবীর কাছে একজন সঙ্গীর উর্ধ্বে কিছুই নয়। রবিনকে পেলে সে ছুঁড়ে ফেলে দেবে বালিয়ানকে অথবা নতুন খেলা খেলবে তাকে নিয়ে। আর রবিনকে না পেলে, ফিরে যাবে সাগরের অন্য পারে।

বালিয়ানকে মুবীর খানিকটা প্রয়োজন এখনো। তাই মুবীকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এখনও খানিকটা ভোগের বস্তু হতে হচ্ছে। সুতরাং পথ চলতে-চলতে বালিয়ান উদ্দেশ্য করে মুবী বলেছে- “এতো বিশ্রামের কী দরকার, বিশ্রাম কম করো, দ্রুত এগিয়ে চলো।” কিন্তু বালিয়ানের অন্য মতলব- জুতসই জায়গা পেলেই থেমে যাওয়া এবং বিশ্রামের বাহানায় মুবীকে ভোগ করা।

একরাতে- ইচ্ছে করেই- খুব বেশী পরিমাণে বালিয়ানকে মদ খাওয়ালো মুবী। মদ খেতে-খেতে নেশায়-নেশায় বৃন্দ হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো বালিয়ান। ঘুমিয়ে পড়েছিলো প্রহরীরাও।

মুবী পা টিপে-টিপে অপেক্ষাকৃত এক তরতাজা যুবক প্রহরীকে জাগিয়ে তুললো এবং খানিকটা দূরে নিয়ে তাকে বললো- “আমি কে, তা তোমার নিশ্চয়ই জানা আছে, কেনো এসেছি তাও তুমি জানো।”

মুবীর কথার পিঠে যুবক কোনো কথা না বলে শুধু মাথা নাড়ালো।

মুবী আবারো বললো- “এসেছিলাম তোমাদের সাহায্য করার জন্য। চেয়েছিলাম সালাহউদ্দীনকে উৎখাত করবো, ক্ষমতায় বসাবো তোমাদেরকে। কিন্তু তোমাদের ঐ যে কমান্ডার-পড়ে আছে মাতাল হয়ে ঐ কমান্ডার বিদ্রোহের মহাপরিকল্পনা করবে কি, পড়ে থাকলো আমাকে নিয়ে মদের পেয়ালা নিয়ে এবং প্রতি রাতে। আমি হলাম হারেমের বন্দী। ভোগের এক পণ্য কোনো চিন্তা-ভাবনা না করে,

ফৌজকে দুই ভাগে ভাগ করে ফেললো তোমাদের ঐ, ও-ই কমান্ডার। আক্রমণ করলো বোকার মতো। যার ফলে, তোমাদের বিশাল যে বাহিনী তা দেখতে না দেখতেই ধ্বংস হয়ে গেলো। যেখানে জয়ী হবার কথা তোমাদেরই, সেখানে পরাজিত হলে তোমরাই। মূলত তোমাদের পরাজয়ের পেছনে সম্পূর্ণভাবে ঐ কমান্ডারই দায়ী। অথচ এই লোকটা, এই বদবখ্ত কমান্ডার এখনো আমাকে ভোগ করে চলেছে। বলছে- আমাকে নাকি বিয়ে করবে। থুহ, লোকটাকে আমি একেবারে দেখতেই পারি না। ঘৃণা করি প্রচণ্ডভাবে। সত্যিকারভাবে বিয়ে করবো তো আমি। সুতরাং কাকে বিয়ে করবো, কাকে বিয়ে করবো না, সেটা তো আমার ব্যাপার। দেখো, যুবক, প্রথম যেদিন তোমাকে দেখি, ঠিক সেদিন থেকে গোপনে-গোপনে আমি তোমাকেই ভালোবেসে ফেলেছি। আমি তোমাকেই বিয়ে করতে চাই। একমাত্র তোমাকেই আমার ভালো লাগে। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবোই না। এই বুড়োটার হাত থেকে তুমিই আমাকে রক্ষা করতে পারো। এখনই ও-ই, ও-ই বুড়োটাকে হত্যা করো। ওকে হত্যা করতে পারলে তুমি হবে পদ এবং সম্পদের অধিকারী। আমি তোমাকে নিয়ে তারপর পাড়ি জমাবো সমুদ্রের ওপারে।”

সৈনিকটির বুকে মাথা রাখলো মুবী। তারপর জড়িয়ে ধরলো তাকে। কিছুক্ষণ কেটে গেলো এভাবে। এক সময় মুবী তার কাছ থেকে একটুখানি সরে বসলো। হঠাৎ একটি বর্ষা এসে বিদ্ধ হলো যুবকটির বুকে। চিৎকার করে লুটিয়ে পড়লো যুবকটি।

বর্ষাটি টেনে বের করতে করতে অন্য এক সৈনিক গর্জন করে উঠলো- “গান্ধার, মৃত্যুই তোমার এক মাত্র শান্তি, তোমার বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই।”

এ-সময় মুবীর কণ্ঠ থেকেও, উদ্ভিত হলো আতর্জন- “লোকটাকে বাঁচতে দিলো না।”

মুবীর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই তাকে হ্যাচডাতে-হ্যাচডাতে বালিয়ানের কাছে নিয়ে চললো এক সৈনিক।

ଅଭିଭାଷଣ

[ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ]

প্রসঙ্গ কথা

কবি মতিউর রহমান মল্লিক সাহিত্য সংস্কৃতির কাজে সারাদেশ চেষ্টে বেড়িয়েছেন। বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও উৎসবে যোগ দিতেন। কথা বলতে হতো তাকে। তবে কোন কথার স্ক্রিপ্ট কিংবা রেকর্ড তিনি সংরক্ষণ করেননি। কিছু সহৃদয়বান ব্যক্তি তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথামালা লিখিতরূপ দান করে বিভিন্ন আরক সংকলনে ছেপেছেন। কবির সব অভিভাষণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এখানে ৫টি প্রকাশিত ও ৪টি অপ্রকাশিত অভিভাষণ সন্নিবেশিত করা হলো।

সূচিপত্র

- ১৯৯৭ সালে বঙ্গ বিজয়ের ৭৯৩তম বার্ষিকীতে প্রদত্ত ভাষণ/ ২৮৫
বাংলাদেশের কবিদের মধ্যে ঐক্যের সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করতে চাই/ ২৮৭
কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সম্মেলন'৯৭ প্রদত্ত ভাষণ/ ২৯১
মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বাংলা ভাষার সংস্কৃতি/ ২৯৮
রাবিতে শিক্ষা সেমিনারে প্রদত্ত ভাষণ/ ২৯৯
কবি মতিউর রহমান মল্লিক-এর অপ্রকাশিত ৪টি অভিভাষণ/ ৩০৪

১৯৯৭ সালে বঙ্গ বিজয়ের ৭৯তম বার্ষিকীতে প্রদত্ত ভাষণ

সুধী বন্ধুগণ, আমরা আমাদের অতীত ইতিহাসের দিকে তাকাইনি। আমরা ইতিহাসের সংকটের দিকে তাকাইনি। যারা ইতিহাসের দিকে তাকায় না, ইতিহাসের সংকটের প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করে না তারা সম্মানিত হতে পারে না। আমরা আমাদের ইতিহাসের দিকে তাকাইনি বলে আমাদের সম্ভাবনাময় দিকগুলো ইতিহাসের আলোকে পর্যালোচনা করতে পারিনি। আমাদের সম্ভাবনাগুলো, আমাদের সম্মানের সবগুলো পরিধি আজকে সংকুচিত হতে চলেছে। আমার একবার সৌভাগ্য হয়েছিলো ১৯৮৫ সালে লন্ডনে যাওয়ার। আমি লন্ডনের যাদুঘরে গিয়েছিলাম। সেখানে আমার সঙ্গে ছিলো আমার বন্ধুবান্ধবরা। সে দেশের রাজকীয় যাদুঘরে গিয়ে আমি হাতির সামনে দাঁড়িয়ে হতবাক হয়ে গেলাম। এ হাতিটি হচ্ছে সেই হাতি, যে হাতির পিঠে সওয়ার হয়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলা যুদ্ধ করতেন। ক্লাইভ অত্যন্ত সচেতন ছিলো বলে এ হাতিটিকে তিনি ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং পরে সেটা রাসায়নিক উপায়ে সংরক্ষণ করা হয়েছিলো। তিনি দেখাতে চেয়েছেন তার জাতিকে যে দেখো, এই জাতির দিকে তাকাও। এই হাতিতে চড়ে যে বীর তার দেশ শাসন করতো, তাকে এবং সে জাতিকে আমরা পরাজিত করেছি, অতএব, তোমাদেরও ছড়িয়ে পড়তে হবে সমস্ত দুনিয়াকে পদানত করার জন্যে এখানে বিস্ময়ের কিছু নেই, কিন্তু বিস্মিত হলাম তখন যখন দেখলাম একটি তুর্কী পরিবার সে হাতিটির সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন। তার স্ত্রী তার সাথে আছে, তার পুত্র-কন্যা পাশে দাঁড়ানো। দাঁড়িয়ে মোনাজাত করছে। আমরা কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, তাদের ভাষা বুঝলাম না। ইংরেজিতে তাদেরকে প্রশ্ন করা হলে বললো, একজন মুসলমান বীর তার দেশের স্বাধীনতার জন্যে শহীদ হয়েছে। সে মুসলমান যে দেশেরই হোক না কেনো, সে আমাদের ভাই। আমাদের দেশেও অনেক বীর মৃত্যুবরণ করেছে। আমাদের দেশের বীরদের সঙ্গে এ বীরের কোনো তুলনা নাই। কাজেই, আমাদের দেশের বীরদের মতো তিনি আমাদের কাছে সম্মানীয় হবেন।

আমরা দেখলাম, হাতির পায়ের কাছে লেখা আছে ‘এ হচ্ছে তার হাতি যে ব্যক্তি ফরাসীদের সাথে মিলিত হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে।’ ইতিহাস বিকৃতির ও মিথ্যাচারের ছোঁয়া সেখানেও আমরা দেখলাম। আমরা জিজ্ঞেস করলাম তাদের কাছে ‘তোমাদের তো মীরজাফরকে সম্মান করা উচিত, কেননা, মীরজাফর তোমাদেরকে সহায়তা করেছে। তখন কিছু ইংরেজ বললো দেখো আমরা বীরদের সম্মান করি, গাদ্দারদের নয়। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে গাদ্দাররা

সম্মানিত হয় না। সম্মানিত হয় ঈমানদারেরা। ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী ঈমান নিয়ে এসেছিলেন।

একজন মহামনীষী বলেছিলেন, জ্ঞানীদের কোনো পর দেশ নেই, আর মূর্খদের কোনো স্বদেশ নেই। যারা জ্ঞান গরিমা নিয়ে গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন, সমস্ত দুনিয়ার নির্ধাতিত মানুষকে তারা ভালোবেসেছিলেন।

আমরা চেণ্ডয়েভারাকে ভালোবাসি আর না বাসি কিন্তু তিনি একজন বিপ্লবী ছিলেন। তিনি বিপ্লবী ছিলেন বলেই নির্ধাতিত মানুষকে ভালোবেসেছিলেন। সে কারণে তিনি তাঁর স্বদেশ ছেড়ে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন জঙ্গলে। তার আদর্শ কি ছিলো সেটা আমাদের জন্যে বিবেচ্য বিষয় নয়, তিনি নির্ধাতিত মানুষকে ভালোবেসে তার দেশকে ভালোবেসে অমর হয়েছেন। নির্ধাতিত মানুষ এবং তার দেশের জন্যে যে আদর্শ তিনি ভালোবেসেছিলেন, সেটা তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। সে জন্যে তাকে সম্মান করা উচিত। লর্ড ক্রোমার নামক একজন শাসক মিসরকে শাসন করেছিলেন দীর্ঘ তেইশ বছর। এই দীর্ঘ তেইশ বছর তিনি বৃটিশ প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তিনি একটি বিখ্যাত গ্রন্থ লিখেছিলেন, তার নাম ছিলো ‘মডার্ন ইজিপ্ট’। সে গ্রন্থে তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন, ‘রাজনৈতিক আধিপত্যের চেয়ে সাংস্কৃতিক আধিপত্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ।’ পৃথিবীর পরিবর্তন ঘটেছে। পৃথিবীতে কর্তৃত্ব স্থাপনের টেকনিকে পরিবর্তন এসেছে। আজকে সরাসরি লড়াই হচ্ছে না। গোটা দুনিয়াকে কজা করার জন্যে একটা অপ্রত্যক্ষ লড়াই শুরু হয়েছে দীর্ঘকাল থেকে। সে লড়াইয়ের নাম হচ্ছে সাংস্কৃতিক সংগ্রাম, সাংস্কৃতিক বিপ্লব। আমাদের দেশকে সরাসরি গ্রাস করতে যারা ভয় পায়, তারা সাংস্কৃতিক গ্রাসের পন্থা অবলম্বন করেছে। শুধুমাত্র সে কারণেই তারা ষড়যন্ত্র করছে, তারা চায় আমাদের সংস্কৃতি থেকে দূরে সরিয়ে দিতে। তারা চায় আমাদের ইতিহাস থেকে দূরে সরিয়ে দিতে। তারা চায় আমাদের অশিক্ষিত রাখতে। প্রজ্ঞা জগতের যাবতীয় বিষয় থেকে দূরে সরিয়ে দিতে। তারা চায় আমাদের জ্ঞান থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিতে। সে কারণেই যেখানে জ্ঞান চর্চা হচ্ছে, সেখানে তারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। তারা বাধা দিয়ে চলেছে। এই ধরনের দুঃখ এবং এই ধরনের প্রতিবন্ধকতা তারা প্রতিদিনই সৃষ্টি করে চলেছে।

ঈমান মানেই স্বাধীনতা। ঈমান মানেই মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো, ঈমান মানেই নিজেদের ঐতিহ্যের দিকে তাকানো। যতোদিন আমরা ঈমানের সম্পদের উপর সম্পূর্ণ থাকবো ততোদিন কেউ আমাদেরকে ধ্বংস করতে পারবে না।

[১৯৯৭ সালে বঙ্গবিজয়ের ৭৯৩তম বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ]

অনুলিখন : আমিন আল আসাদ

বাংলাদেশের কবিদের মধ্যে ঐক্যের সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করতে চাই

বর্ষাকালীন জাতীয় কবিতা উৎসব ২০০৩ এর পরম শ্রদ্ধেয় সভাপতি, কবিতা বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সভাপতি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবি আল মাহমুদ, বর্ষাকালীন কবিতা উৎসবের পরম শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. এস এম এ ফায়েজ, মধ্যে আসীন বিশেষ অতিথিবৃন্দ, সম্মানিয়া জাহানারা আরজু, বাংলাদেশের খ্যাতিমান কবি, সর্বজন শ্রদ্ধেয় কবি, কবি ওমর আলী, বাংলাদেশের খ্যাতিমান কবি, কবি আফজাল চৌধুরী, এদেশের সাহিত্য আন্দোলনের প্রখ্যাত গবেষক জনাব শাহাবুদ্দীন আহমদ, বাংলাদেশের অন্যতম খ্যাতিমান কবি, কবি জহুর-উস-শহীদ, কবিতা বাংলাদেশের পৃষ্ঠপোষক জনাব মীর কাশেম আলী, বর্ষাকালীন কবিতা উৎসবের সম্মানীয় সদস্যসচিব অধ্যাপক তাসনীম আলম, সুধীমণ্ডলী, সারাদেশ থেকে আগত কবিবৃন্দ এবং এই সময়ের শ্রেষ্ঠতম কবিবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

নোবেল বিজয়ী কবি অক্টোভিও পাজ কবিতার একটি চমৎকার সংজ্ঞা দিয়ে ছিলেন। যেভাবে কবিতার সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এর কোনো পরিসীমা নেই। ইসলামেও কবিতার সংজ্ঞা এসেছে কিন্তু কোন সংজ্ঞাকেই চূড়ান্তভাবে বেঁধে দেয়া হয়নি। রসূলে কারীম (সা.) কবিতার ওপরে কথা বলেছেন যত বেশী তার চেয়ে বেশি কথা বলেছেন কবিদের দায়িত্ব সম্পর্কে, কবিদের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে। রসূলে কারীম (সা.) আয়েশা (রা.) এর ঘরে জুতা সেলাই করছেন, আয়েশা (রা.) কবিতা পড়া শুরু করলেন, যে কবিতা তিনি পড়লেন তার অর্থ হলো 'প্রেমিকের কপোলে যে ঘাম সে ঘাম উজ্জ্বল মুক্তার মতো জ্বলজ্বল করছে।' প্রথমবার পড়লেন, রসূল (সা.) মাথা তুললেন, মাথা তুলে বললেন, আবার পড়। আয়েশা (রা.) হেসে দিয়ে বললেন, 'যে কবি তার প্রেমের প্রধান

অবলম্বনকে লক্ষ্য করে এই কবিতাটি লেখেছে, মুখ মণ্ডলে রোদ এসে পড়েছে, রোদে চক চক করছে, আজকে যদি সেই কবি আপনাকে দেখতো তাহলে তার কবিতা সার্থক হতো।' আয়েশা (রা.) এর কবিতা শুনে রসূল (সা.) উঠে দাঁড়ালেন, দাঁড়িয়ে আয়েশা (রা.) এর দুই জ্বর মাঝখানে চুমু খেলেন।

রসূলে কারীম (সা.) এর সামনে কবিতা পড়া হচ্ছে কবিতার অর্থ 'আমি সারা রাত ধরে জেগে জেগে আমার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে আমার যে রোজগার সে রোজগারকে হালাল করার জন্য পরিশ্রম করছি।' রসূলে কারীম (সা.) কবিতা শুনে জিজ্ঞেস করলেন 'এই কবিতা কে লিখেছেন' বলা হলো কবি আনতারা লিখেছেন রসূলে কারীম (সা.) তখন বললেন, 'আমি কবি আনতারাকে দেখতে চাই।' ড. ইকবাল এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বলেছেন, ইতিহাস খুঁজলে কোথাও পাওয়া যায় না যে, রসূলে কারীম (সা.) কোন রাজা বাদশাকে দেখতে চেয়েছেন, কখনো কোনো কাউকে দেখতে চেয়েছেন, কিন্তু একজন সার্থক কবির দুটি লাইন, সার্থক কবিতার দুটি লাইন শুনে সারা জীবনে একজন কবিকেই দেখতে চেয়েছেন। রসূলে কারীম (সা.) বলেছেন 'আব্বা এবং আন্নার সাথে সদ্যবহারের যে সওয়াব সেই একই সওয়াব হচ্ছে একজন কবিকে বা কবিদেরকে সহযোগিতা করা।' জেহাদের সঙ্গে তিনি সমাজকল্যাণের তুলনা করেছেন, জেহাদের সঙ্গে তিনি এবাদতের তুলনা করেছেন আবার কবিতার সঙ্গে কবির সঙ্গে তিনি উত্তম ব্যবহারের তুলনা করেছেন তার আব্বা আন্নার সঙ্গে ভালো ব্যবহারের তুলনা করেছেন।

রসূলে কারীম (সা.) কে জিজ্ঞেস করা হলো কবিতা সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? রসূল (সা.) স্পষ্ট করে বললেন, একজন ঈমানদার সে লড়াই করে হাতিয়ার দিয়ে আর ভাষার মধ্য দিয়ে। একজন মুমিনের লড়াই করার দুটি হাতিয়ার। একটি হাতিয়ার হলো নানা ধরনের যুদ্ধ হাতিয়ার যা যুদ্ধ করতে লাগে। আর একটি ভাষা।'

আমরা বাংলাদেশের মানুষ কবিতাকে ভালোবেসেছি। আমি নিজে ছোটবেলা থেকেই কবিতাকে ভালোবেসেছিলাম। কিন্তু যখন দেখেছি রাসূলে কারীম (সা.) সমস্ত মানবজাতির মধ্যে কবিতাকে যথার্থভাবে ভালোবেসেছেন, তারপর কবিতাকে আরো বেশী ভালোবেসেছি। আমাদের একটি স্বপ্ন ছিলো। বিশ্বাসী কবির অবেহলিত, উপেক্ষিত, বঞ্চিত, এমন কি লাঞ্ছিত, দেশশ্রেমিক কবির উপেক্ষিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত। আমরা যারা দেশশ্রেমিক কবি, আমরা যারা বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, উপেক্ষিত কবি, আমরা একদিন একত্রিত হবো, আমরা একদিন কবিতা পাঠের জন্য এই ঢাকা শহরকে মুখরিত করবো। আব্বাহ রাব্বুল আলামীন সেই দিবসটি যথেষ্ট সহজেই আমাদের সামনে এনে দিয়েছেন। আমি আজকের এই

বর্ষাকালীন কবিতা উৎসবের প্রধান অতিথি আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ আমাদের শিক্ষকতুল্য ভাইস চ্যান্সেলর সাহেবকে সর্বপ্রথমেই স্বাগত জানাতে চাই। আমরা তাঁকে দাওয়াত করেছিলাম, তিনি দাওয়াত কবুল করেছিলেন এবং যথাসময়ে তিনি আমাদের মাঝে এসেছেন। কবি আল মাহমুদ ভাই আমাদের সভাপতি, এসেছেন। তিনি সোচ্চার ছিলেন এবং আনন্দিত ছিলেন, আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন, বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠতম কবিরাও আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন, তারা আমাদের দাওয়াতকে কবুল করেছেন। সেই শ্রেষ্ঠতম কবিদের অনেকেই এখানে আছেন তারা কবিতা পড়বেন, আমি তাদেরকেও স্বাগত জানাচ্ছি, কবিতা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে। কবিতা বাংলাদেশের বিষয় আশয় নিয়ে সভাপতি প্রধানত কথা বলবেন, আমার দায়িত্ব শুধু স্বাগত জানানো।

বর্ষাকালকে নিয়ে এদেশে প্রধানত কবিতা উৎসব হয় না। কিন্তু বর্ষাকাল আমাদের জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সবচেয়ে বড় একটি ঋতু। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি ঋতু বাংলাদেশের জন্য। বাংলাদেশের যতো গৌরব, বাংলাদেশের যতো মহিমা, বাংলাদেশের যতো গুণকীর্তন, তার পেছনে এই বর্ষা ঋতুর একটা অবদান আছে, অপরিসীম অবদান আছে। আমরা সেই ঋতুকেই বেছে নিয়েছি এই উৎসবের জন্য। এদেশে অন্যান্য ঋতুকে নিয়েও কবিতা উৎসব হয়ে থাকে। এই ঋতুকে নিয়ে যারা কবিতা উৎসব করেন কবিতা বাংলাদেশ থেকে তাদেরকেও স্বাগত জানাই। কবিদের মধ্যে কখনো কখনো ঐক্য থাকে না, আমরা কবিতা বাংলাদেশের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের কবিদের মধ্যে ঐক্যের সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করতে চাই।

আমাদের কবিতার হাতিয়ার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, আমাদের কবিতার হাতিয়ার অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে, আমাদের কবিতার হাতিয়ার অসুন্দরের বিরুদ্ধে, আমাদের কবিতার হাতিয়ার অমানবিকতার বিরুদ্ধে। যতো ধরনের অন্যায় আছে, যতো ধরনের অমানবিকতা আছে, যতো ধরনের অপসংস্কৃতি আছে, আমাদের কবিতা এই সব অনাচারের বিরুদ্ধে। আমাদের কবিতা সত্যের পক্ষে সৌন্দর্যের পক্ষে। আল্লাহ রাক্বুল আলামীনের চেয়ে বড় সত্য নেই, আল্লাহ রাক্বুল আলামীনের চেয়ে বড় সৌন্দর্য নেই। সেই সৌন্দর্যের পক্ষে সেই সত্যের পক্ষে আমাদের পথ চলা, আমাদের কবিতা।

আজকে যারা কবিতা পড়বেন, আমরা তাদেরকে স্বাগত জানাই। সারা দিনব্যাপী আজকে কবিতা পড়তে হবে আমাদের। স্বাগত জানাই সেই সব সাংবাদিকদের যারা আমাদের এই অনুষ্ঠানকে গুরুত্ব দিয়েছেন। স্বাগত জানাই সেই সকল কর্মকর্তাবৃন্দকে যারা আমাদের এই অনুষ্ঠানকে গুরুত্ব দিয়েছেন। সবশেষে আমি

সমস্ত মেহমানদের স্বাগত জানাই, সমস্ত কবিদেরকে আমি স্বাগত জানাই। সমস্ত বোনদেরকে আমি স্বাগত জানাই। ভাইদের আমি স্বাগত জানাই। বিশেষ করে আজ সারাদিন কবিতা উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য যারা কাজ করছেন তাদেরকেও আমি স্বাগত জানাই। আমাদের উচ্চারণ আমরা আমাদের পোস্টারে উদ্ভাসিত করেছি, আমাদের উচ্চারণ আমাদের কার্ডে উদ্ভাসিত করেছি, সেই উচ্চারণ পেশ করার মধ্য দিয়েই আমি আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

‘পাষণ হইয়া পড়ে আছো আজ হায়রে আত্মভোলা

তোমরা জাগিলে সারা পৃথিবীতে উঠিবে প্রবল দোলা।’

আমরা কবির জাগব, আমরা শিল্পীর জাগব, আমরা সারা দেশের মানুষ জাগব। পৃথিবীর জন্যে, দেশের জন্যে, সারা পৃথিবীর মানুষের জন্যে, আমাদের মানুষের জন্যে, আমাদের জনগণের জন্যে আমরা জাগব। আমাদের বিশ্বাসের জন্যে, আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্যের জন্যে আমরা জাগব, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

[কবিতা বাংলাদেশ আয়োজিত বর্ষাকালীন জাতীয় কবিতা উৎসব ২০০৩-এ প্রদত্ত স্বাগত ভাষণ]

অনুলিখন : কবি আফসার নিজাম

কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সম্মেলন'৯৭

প্রদত্ত ভাষণ

ইয়া রাব্বি লাকালহামদ কামা ইয়াযবাগী লিজ্জালিলি ওয়াজহিকা
ওয়াজ্জিমি সুলত্বানিক ।

আজকের এই কবিতা পাঠের আসরের পরম শ্রদ্ধেয় সভাপতি কবি শাহাবুদ্দীন আহমদ, বিশেষ অতিথি বন্ধুবর কবি মোশাররফ হোসেন খান, বিশেষ অতিথি অধ্যাপক শফিউল্লাহ মাহমুদী, বিশেষ অতিথি প্রিয়ভাজন উবায়দুর রহমান খান নদভী, অন্যান্য আলোচকবৃন্দ, সুধীমগুলী, আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ্ ।

কবি মোশাররফ হোসেন খান ভাই ঠিকই বলেছেন, ঠিকই উচ্চারণ করেছেন যে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন এবং এখানে না আসলে একটি অড়ুণ্ডি নিয়ে বিদায় নিতে হতো ।

খুবই আবেগের কথা, প্রাণের ভেতরের কথা বলেছেন তিনি । একটু আগেই মোশাররফ ভাইকে বলছিলাম ‘কি বলা যায়!’ আসলে আবেগ যেখানে সীমা অতিক্রম করে সেখানে কথা বলা খুব কষ্টকর হয় । এই কিশোরগঞ্জে আসার আকাঙ্ক্ষা করেছি অনেক আগেই । পত্রিকার পাতায় কিশোরগঞ্জের সাহিত্যের খবর যখন পড়েছি তখন ভেতরে একটি আকাঙ্ক্ষা কাজ করেছে ‘কিশোরগঞ্জ যেতে হবে’ । এ আবেগ আরেক ধাপ এগিয়েছিল তখন-যখন শুনেছিলাম যে, আমার নানাশ্বস্তরের বাড়ি কিশোরগঞ্জ । এই নীলগঞ্জ এলাকাতেই নানাশ্বস্তরের বাড়ি । সৌভাগ্যক্রমে কালকে রাতেই শাওড়ীর সাথে দেখা হয়েছিলো এবং পুরোপুরি তথ্য আমি তখনই সংগ্রহ করেছি । তারপর থেকেই আরো আবেগ আমার মধ্যে কাজ করেছে ।

আমি যে পথের পথিক, যে পথের আওয়াজ আমি শুনতে চাই প্রতি মুহূর্তে, সেই আওয়াজ আমি শুনেছি আজকে যারা এখানে কবিতা পড়েছেন তাদের সবার কবিতার মধ্যে। বিশেষ করে আমি উবায়দুর রহমান খান নদভী- যার নাম শুনেছি- আমার ধারণা ছিলো খুব বয়সী লোক কিন্তু আজকে এসে দেখলাম একেবারে তরতাজা তরুণ। ইসলামী সাহিত্যের উপরে সূরা আশশুয়ারার কয়েকটি আয়াতের আলোকে তিনি মাত্র কয়েকটি কথা বলেছেন। তাতেই আমি বুঝতে পেরেছি যে, ইসলামী সাহিত্যের উপরে তার গভীর দখল রয়েছে। আমি ভুলে যেতে পারি, সে জন্য অনুরোধ রাখতে চাই- বাংলাদেশে ইসলামী সাহিত্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা দেবার মতো ভালো কোনো গ্রন্থ নেই। আমার কেনো যেনো মনে হচ্ছে উবায়দুর রহমান খান নদভী সাহেব যদি ইসলামী সাহিত্যের উপর একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ আমাদেরকে উপহার দেন। তাহলে আমরা সবাই উপকৃত হতে পারবো। আমি আবেগাপ্ত হয়েছি সব কবিদের কবিতা শুনে, কিন্তু একজনের কবিতা আমাকে আরও বেশী আবেগাপ্ত করেছে। যে শব্দ আমি শুনতে চাই, যে বাণী আমি শুনতে চাই এবং সারা জীবন আমি যে বাণী এবং যে শব্দ শুনতে চেয়েছি- সে বাণী যেনো আমি শুনেছি আজকের একজন কবির কবিতায়। যে কবির পরিচয় উবায়দুর রহমান খান নদভী সাহেবের ছোট ভাই মুহিবুর রহমান খান বলে দিয়েছেন। আমি কবিকে অনুরোধ করবো সম্ভবত: তিনি মাদরাসার ছাত্র। তিনি যেনো কুরআন এবং হাদীস থেকে এবং ইসলামী সাহিত্যের উপরে এ পর্যন্ত যতো গ্রন্থ রচিত হয়েছে এই সব কিছুকে যেনো আত্মস্থ করেন। আমাদের দেশে নজরুলের পরে সরাসরি কুরআন এবং হাদীস থেকে রসদ সংগ্রহ করে লেখার মতো লোকের সংখ্যা খুবই কম।

আমাদের দেশে যতোগুলো অভাব রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় অভাব আমি লক্ষ্য করছি, কুরআন এবং হাদীসের আলোকে সাহিত্য এবং শিল্পকে আত্মস্থ করতে না পাড়ার অভাব। কুরআন এবং হাদীসের আলোকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত বিভিন্ন মনীষীরা যে অতুলনীয় সম্পদ রেখে গেছেন সেই সাহিত্য এবং সেই সংস্কৃতিকে আমাদের জাতির সামনে আজকে উদ্ভাসিত করা দরকার। উন্মোচিত করা দরকার।

আমি তাঁদের দুই ভাইকে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি মোশাররফ হোসেন শাহজাহান ভাই এবং মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম ভাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই জন্যে যে আমি যদি আজকে এখানে না আসতাম তাহলে রবীন্দ্রনাথের এ চারটি লাইন আমি নতুন করে উপলব্ধি করতে পারতাম না।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

“স্বজাতির সিংহাসন উচ্চ করি ধরো

মনে রেখ তারও চেয়ে সত্য আরও বড়

স্বদেশের পারো যদি তার উর্ধ্বে ওঠো

করো না দেশের কাছে মানুষের ছোট।”

আমি সারা দেশের সাহিত্যসভায় যাই। আমার যাওয়ার সৌভাগ্য হয়। কিন্তু এমন একটি সাহিত্য সভা যেখানে অনেক কবি এমন রয়েছেন যাদের মুখের দিকে তাকালে মনে হয় আল্লাহর ওলী। অনেক অনেক তরুণ মুখ আমি আজকে দেখলাম, যাদের মুখ দেখলেই মনে হয় এক একজন মুজাহিদ। আবার অনেক প্রতিভাবান মানুষের মুখ আমি দেখলাম, যাদেরকে দেখে আমার মনে হয়েছে এরা সবাই যদি একদিন জাগরিত হয়, একদিন মাথা তুলে দাঁড়ায় তাহলে গোটা বাংলাদেশকে এরা কাঁপিয়ে দিতে পারবে। শুধু বাংলাদেশ নয়, একদিন যেমন এই অঞ্চলটি উপমহাদেশের জন্যে গৌরবের বিষয় ছিলো, এই অঞ্চলটি মুসলিম জাহানের জন্যে গৌরবের বিষয় ছিলো, তেমনি আবারও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে এই অঞ্চল। কিন্তু সেই মাথা তুলে দাঁড়াবার সবচেয়ে বড় মাধ্যমে হচ্ছে একটি বিশ্বাস। মৌলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী খুব চমৎকারভাবে সেই বিশ্বাসের কথাটি একটি মাত্র শব্দের মধ্যে গেঁথে দিয়ে বলেছেন, সেই শব্দটি হচ্ছে তওহীদ। যদি এ অঞ্চলের প্রতিভাবান মানুষেরা তওহীদকে তাঁদের সমস্ত সাধনার কেন্দ্রবিন্দু করতে পারে তাহলে আমার বিশ্বাস এ অঞ্চল আবারও একদিন গোটা মুসলিম জাহানকে আলোড়িত করবে, আমার অন্তত এতে কোন সন্দেহ নেই। আমি যখন এই অঞ্চলে পা দিয়েছি, এই অঞ্চলের ভেতর দিয়ে আমি আরো গভীর অঞ্চলের মধ্যে প্রবেশ করেছি তখন আমার ঈশা খাঁর কথা মনে পড়েছে। সুকান্তের একটি লাইন তো সবাই আজকাল ব্যবহার করে। ব্যবহার করে বলে যে- “বিপ্লব স্পন্দিত বুকে মনে হয় আমি অমুক আমি তমুক।”

আমার এ লাইনটি কেবল মনে পড়েছে এবং আমি চিৎকার করে বলতে চেয়েছি, “বিপ্লব স্পন্দিত বুকে মনে হয় আমি ঈশা খাঁ।” এরকম একটি উপলব্ধি যেখানে এসে জন্মিত হয়, সেখানে আমি বাংলাদেশের সবাইকে আসার জন্য দাওয়াত জানাচ্ছি- এখানে আসুন। এখানকার সম্মেলন অনেক বড় সম্মেলন হউক, এখানে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রতিভাবান মানুষেরা আসুক, বুদ্ধিজীবীরা আসুক এসব প্রাণিত হউক তারা উদ্বুদ্ধ হউক এবং তারা আবার অনুপ্রেরণা নিয়ে তাদের নিজেদের এলাকায় ফিরে যাক।

আজকে আমাদের একটি বিষয়কে উপলব্ধি করতে হবে। আমি কবি ইকবালের দুটি লাইনের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই আমার অস্তিত্বের সমস্ত

অনুভূতি দিয়ে। সে দুটি লাইন হচ্ছে-

উয়ো জামানে মে থে ময়াজেজ্ হামেলে কুরআ হো কর
আওর তোম খার হোয়ে তারেকে কোরআ হো কর।।

আগের দিনের যারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলো তাঁরা একটি কারণেই মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিলো তা হচ্ছে তারা কুরআনকে গ্রহণ করেছিল। তারা কুরআনকে গভীরভাবে আলিঙ্গন করেছিলো। যে কথাটি নজরুল চমৎকার করে বলেছেন :

“কোরআনের ঐ জাহাজ বোঝাই হীরা মানিক পান্নাতে
লুটে নেরে লুটে নে সব ভরে তোল তোর শূন্য ঘর।”

ঈশা খাঁ কেনো মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন? ঈশা খাঁ কেনো গোটা দুনিয়ার জন্যে বিস্ময়কর এক প্রতিবাদী হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আপনারা যতোই গবেষণা করেন, গবেষণা করতে করতে একটি সিদ্ধান্তে আপনারা এসে উপনীত হবেন- সে সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে তিনি তওহীদকে আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন এবং তওহীদের বিশ্বাসকে নিজের হৃদয়ের মধ্যে নিজের অস্তিত্বের মধ্যে সর্বাঙ্গিকভাবে রোপন করতে পেরেছিলেন। সেই জন্যই মানসিংহের মতো লোক যখন অস্ত্র শূন্য হয়ে গিয়েছিল তখন তিনি তাকে আঘাত করেননি। ঈশা খাঁ যে উদারতা দেখিয়েছিলো, সেই উদারতার তুলনা হতে পারে কেবল সাহাবীদের উদারতার সাথে এবং সাহাবীদের পরবর্তীতে যারা জিহাদ করতে করতে জীবনকে উৎসর্গ করেছেন তাদেরই সাথে। একি এক বিস্ময়কর ঘটনা, কেনো ঈশা খাঁ একটি মানুষকে হত্যা করার সুযোগ পাবার পরও দুশমনকে তিনি হত্যা করেননি; এ জন্যে যে তাঁর বুকের মধ্যে ছিল ইসলামের শিক্ষা, ইসলামের সংস্কৃতি।

আজও এই বাংলাদেশ এই ছোট্ট একটি বাংলাদেশ গোটা দুনিয়াকে কাঁপিয়ে দিতে পারে, শুধুমাত্র কুরআনকে গ্রহণ করলে। এই দেশের কবিরা যদি কোরআনকে গ্রহণ করে, এদেশের নাট্যকাররা যদি কুরআনকে গ্রহণ করে, এই দেশের রাজনীতিবিদরা ‘অর্থনীতিবিদরা’ গুলো সবাই মিলে যদি কুরআনকে গ্রহণ করতে পারে তাহলে এই ছোট্ট দেশটি একদিন গোটা পৃথিবীতে বিস্ময়কর একটি দেশ হিসাবে পরিগণিত হবে।

একথা দ্বিধাহীন চিন্তে বলতে চাই, আজকে যারা এই সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করেছেন- এই সাহিত্য সম্মেলনের প্রধান আয়োজকের ভূমিকায় যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে একটি বিশ্বাস সবসময় কাজ করেছে বলেই এই সাহিত্যসভার ক্ষেত্রে তারা সাম্প্রদায়িকতার কোনো পরিচয় দেননি। হৃদয়ের

দিক থেকে তারা সমৃদ্ধ, হৃদয়ের দিক থেকে তারা বড়মনের সে জন্যে সবাইকে তারা ডাকতে পেরেছেন। আমি বড়জামা এই গোল টুপি এই করতালি দেখে আবেগে আপ্ত হয়ে পড়েছি। এই নির্যাতিত এই নিষ্পেষিত মানুষেরা সাহিত্যের দিকে এগিয়ে এসেছে এবং তাদের সাথে রয়েছে একেবারেই তরুণ টগবগে যুবক, যাদের দেখে মনে হয় সর্বাধুনিক। এই সর্বাধুনিক লোকের মধ্যে এবং এই প্রাচীন লোকের মধ্যে যে সেতুবন্ধন রচিত হয়েছে এই সেতুবন্ধনই আমাদের জাতিকে উদ্ধার করতে পারে, এই সেতুবন্ধনই আমাদের মাথা উঁচু করে ধরতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন-

“এ দুর্ভাগা দেশ হতে হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়।
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশ
উদার আলোক মাঝে উন্মুক্ত বাতাস।”

রবীন্দ্রনাথ মাথা উঁচুতে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, একটি উন্মুক্ত আকাশ চেয়েছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যদি জানতেন কোন আদর্শকে গ্রহণ করলে মাথা তুলে দাঁড়ানো যায়, তাহলে রবীন্দ্রনাথের মতো একজন উদার চিন্তের মানুষ ইসলামকেই গ্রহণ করতেন। সে কারণেই শুধুমাত্র সেই কারণেই মহানবী (সা.) সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও প্রশংসা করেছেন। মহামতি কার্লাইল প্রশংসা করেছেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের, প্রশংসা করেছেন কোরআনের, প্রশংসা করেছেন ইসলামের।

কয়েকদিন আগে চেচনিয়ার মুসলমানের পক্ষে কথা বলেছেন সোলজিনৎস্কি। চিৎকার করে বলেছেন চেচনিয়ার মুসলমানদের স্বাধিকার দেয়া উচিত। আমার তখন মনে হয়েছিলো সোলজিনৎস্কি কেনো মুসলমানদের পক্ষে কথা বলেছেন। সোলজিনৎস্কি এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন যে, এই নির্যাতিত মানুষেরা এই নিষ্পেষিত মানুষেরা মানবতারই একটি অংশ। তিনি একজন উদার দৃষ্টির মানুষ। সে জন্যই মানবতার পক্ষে এগিয়ে এসেছেন।

আজকে আমার কথা বলার সময় নেই। আমি আপনাদেরকে উদারভাবে নজরুলকে পড়তে বলি নজরুলের কবিতা পড়তে বলি। আজকে আপনাদের সামনে একটি প্রশ্ন রেখে যেতে চাই, তাহলো নজরুল যেমন হিন্দুদের পক্ষে কথা বলেছেন, নজরুলের কবিতায় মানুষের কথা আছে নজরুলের কবিতায় পৃথিবীর পক্ষে কথা রয়েছে, তারপরও নজরুলকে আজকে কেনো অবহেলা করা হচ্ছে? আপনাদের কাছে আমি এই প্রশ্ন রাখতে চাই। নজরুল ছেলের নাম রেখেছিলেন অনিরুদ্ধ, ছেলের নাম রেখেছিলেন সব্যসাচী, নজরুলের বাড়িতে পূজা করতো তার শাশুড়ি। এ রকম একজন ব্যক্তিকে কেনো এই

দেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর প্রেতাঙ্গারা প্রতিক্রিয়াশীল কবি বলে আখ্যায়িত করতে দ্বিধা করে না। সরকার শুধু নজরুলের ব্যাপারে উদাসীন কেনো? আমি এই প্রশ্ন যদি করি তাহলে কি বলা যায় না যে নজরুল, ইসলামের পক্ষে কথা বলেছিলেন, নজরুল কোরআনের পক্ষে কথা বলেছিলেন, আল্লাহর পক্ষে, নজরুল কথা বলেছিলেন সমস্ত মানবতার পক্ষে। এটাই নজরুলের অপরাধ। নজরুলের শ্যামা সজীত রয়েছে। নজরুলের চিঠি পত্রে প্রবন্ধে ভগবানের কথা রয়েছে, ঈশ্বরের কথা রয়েছে, কিন্তু তারপরেও কেনো নজরুলকে আজকে অবহেলা করছে আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা, আমাদের দেশের সরকার। তার কারণ নজরুল নিতীক চিন্তে বলেছেন,

“তখতে তখতে দুনিয়ায় আজি কম বখতের মেলা
শক্তি মাতাল দৈত্যরা সেথা করে মাতলামী খেলা
ভয় করিও না হে মানবাত্মা ভাঙিয়া পড়ো না দুখে
পাতালের এই মাতাল রবে না আর পৃথিবীর বুকে।”

আবারও নজরুল বলেছেন-

“পৃথ্য বসিয়া যে করে তখতের অপমান
রাজার রাজা যে তার হুকুমেই যায় তার গর্দান
ভিজিওয়ালার রাজত্ব ভাই হয়ে এলো ঐ শেষ
বিশ্বের যিনি সম্রাট তাঁরই হইবে সর্বদেশ।”

নজরুল বলেছিলেন একদিন এই গোটা পৃথিবী আল্লাহর পৃথিবীতে পরিণত হবে- এই ধরনের কথা নজরুল বলেছিলেন বলেই- আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা নজরুলকে পরিত্যাগ করেছেন। মনে রাখবেন, সত্যের পক্ষে যে কবির কথা বলবে, সত্যের পক্ষে যে লেখকরা কথা বলবে, চিরন্তন আদর্শের পক্ষে যারা কথা বলবে তাদেরকে খোদাদ্রোহীরা কখনও সহ্য করতে পারে না।

সময় থাকতেই আজকের দিনের কবিদেরকে আজকের দিনের লেখকদেরকে ভালো করে এই কথাটি বুঝতে হবে। নজরুল তাদের জন্য শিক্ষক, নজরুল যেনো তাদের জন্য উদাহরণ, নজরুল তাদের জন্য দিকনির্দেশনা।

ফররুখ আহমদকে প্রেম নিবেদন করেছিলেন সেই সময়ের এক হিন্দু এসডিও-এর মেয়ে। এক সাথেই পড়াশোনা করতেন ইংরেজিতে, সেই মেয়ে প্রেম নিবেদন করেছিলেন ফররুখকে বিয়ে করার জন্য। এই প্রস্তাব পাওয়ার সাথে সাথেই ফররুখ আহমদ বাড়িতে চলে এসেছিলেন। নানা তাঁকে খুব ভালোবাসতেন, নানাকে সমস্ত অবস্থা খুলে বলেছিলেন ফররুখ। নানা তাকে

তড়িঘড়ি তারই এক দূর সম্পর্কের বোনের সাথে বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন। একমাস দেড়মাস পরে ফররুখ যখন কলেজে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন তখন সেই অপূর্ব সুন্দরী এসডিওর মেয়ে এসে বলছে যে, আপনাকে খুঁজে পাচ্ছি না কেনো? তার উত্তরে ফররুখ বলেছিলেন যে আমি একটি জরুরী কাজে বাড়ি গিয়েছিলাম। আমার নানা ধরে আমাকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। ফররুখের পক্ষে সাবধানতা অবলম্বন সম্ভব হয়েছিলো।

ফররুখ সাবধান হয়েছিলেন নজরুলের দিকে তাকিয়ে। নজরুল ইসলাম সারা জীবন বেদনায়, জ্বালায় যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।

তার বুকের মধ্যে ছিলো কুরআন, তার বুকের মধ্যে ছিলো আল্লাহ, তার বুকের মধ্যে ছিলো রাসূল (সা.), এ জন্য জীবনের শেষ প্রাণ্তে এসে তিনি ‘মরুভাঙ্কর’ কাব্য লেখায় হাত দিয়েছিলেন। আল্লাহ রাসূল আলামীন নিঃসন্দেহে তাকে বেহেশত নসীব করেছেন- এ ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ রাসূল আলামীনের কাছে আজকের এই সাহিত্য সম্মেলনের মাধ্যমে কামনা করে যাই- রাসূল আলামীন নজরুল যদি কোনো ভুল করে থাকে তুমি রাহমানুর রাহীম তাকে মাফ করে দাও। যে কবি উচ্চারণ করেছে-

“তওফিক দাও খোদা ইসলামে মুসলিম জাহা পুনঃ হোক আবাদ
দাও সেই হারানো শালতানাত, দাও সেই বাহু সেই দিল আজাদ।”

আজকের বড় বড় কবিদের পক্ষে কি এ ধরনের কবিতা লেখা সম্ভব? এ ধরনের বক্তব্য দ্বিধাহীন চিন্তে কি আজ কোনো কবি লিখতে সাহস করতে পারে? নজরুলের মতো বিপ্লবী নজরুলের মতো বিদ্রোহী আজকের দিনে খুবই দরকার ছিলো।

হে রাসূল আলামীন, এই সাহিত্য সম্মেলনের মাধ্যমে তোমার দরবারে মোনাজাত করে যাই- তুমি এই জাতির জন্য আরও কোনো নজরুলকে দাও- আরও কোনো ফররুখকে দাও, আমাদের জাতি আমাদের দেশ রক্ষা পাক। ওয়াআখেরী দাওয়ানা আনীল হাম্দুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

[কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ আয়োজিত সাহিত্য সম্মেলন’৯৭, এ
প্রদত্ত ভাষণ]

মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বাংলা ভাষার সংস্কৃতি

মুসলিম সেনাপতি মুসা ও তারিকের নেতৃত্বে ইউরোপের স্পেন জয় করার পর সেখানে মুসলমানগণ শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, বিজ্ঞানের উৎকর্ষে এক সভ্যতার চারণভূমি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল স্পেন ও কর্ডোভা মহানগরীকে।

কর্ডোভা নগরীর ছিল শিক্ষার সৌন্দর্য ও জ্ঞানচর্চার বিপুল আয়োজনের সুনাম সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদের শিক্ষানুরাগী জ্ঞানপিপাসুগণের সমাবর্তন ঘটেছিল কর্ডোভায়। কর্ডোভাকে ঘিরে গোটা স্পেনে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুসলমানগণ আন্তে আন্তে ইউরোপীয় সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ে, ফলে কালক্রমে নিজেদের সংস্কৃতি বিলীন হয়ে যায়। যা ইবনে খালদুন আল মোকাদ্দমা গ্রন্থে লিখেছেন। ড. আব্দুস সালাম একবার স্পেন সফরে কর্ডোভা মসজিদে বসে মুসলমানদের হারানো ঐতিহ্য স্মরণ করে শিশুর মতো কেঁদেছিলেন। তিনি লিখেন- “মুসলিম হ্যায় আম অতান হ্যায়-সারা জাহা হামারা”

“মুক্ত বাজার অর্থনীতির কুফলে বাংলাদেশে ভারতীয় জিনিসপত্র থেকে শুরু করে বাংলা ভাষার সাংস্কৃতিক আত্মসন আমাদেরকে গ্রাস করে ফেলেছে। যেমন- আমাদের সংবাদপত্র ও ভারতপন্থীরা যা চালু করেছে সাংসদ প্রয়াত, পর্ষদ ইত্যাদি। বৃটিশদের দেয়া হলো হ্যালো। অথচ মুসলমানদের বলা উচিত আস সালামু আলাইকুম। আমরা প্রায় সময়ই নিজেদের অজান্তে কারো মজল কামনায় বলে ফেলি ওমুক কত লক্ষী ছেলে বা তার মত লক্ষী ছেলেই হয় না। কখনো আমরা বলে থাকি “চেনা বাগানের পৈতা লাগে না।” এ ধরনের সাংস্কৃতিক আত্মসন আজ আমাদের অক্টোপাসের মতো ঘিরে ধরেছে। আমাদের রেডিও টিভিতে আক্কা ডাকের পরিবর্তে বাবা ডাক বেছে নেয়া হয়েছে।

সংস্কৃতির লক্ষ্য মানুষকে সচেতন করা। আর স্বাধীনতা মানে শুধু ভৌগোলিক স্বাধীনতা নয় স্বাধীনতা মানে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, ভাষার স্বাধীনতা, সংস্কৃতির স্বাধীনতা, সাহিত্যের স্বাধীনতা, শিল্পের স্বাধীনতা, কিন্তু আজ আমরা ভারতের বিভিন্ন আত্মসনের শিকার।

[গাজীপুর সংস্কৃতিকেন্দ্র আয়োজিত ১৬ই নভেম্বর ১৯৯৯ মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বাংলাভাষার সংস্কৃতি শীর্ষক এক আলোচনা সভায় প্রদত্ত ভাষণ]

[অনুলিখন : হুমায়ন কবির]

রাবিতে শিক্ষা সেমিনারে প্রদত্ত ভাষণ

ইয়া রকি লাকালহামদ কামা ইয়ামবাগী লিজ্জালালি ওয়াজহিকা
ওয়াআজিমি সুলতুনিক।

আজকের এই সেমিনারের পরম শ্রদ্ধেয় সভাপতি, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, প্রফেসর এম. নজরুল ইসলাম; আজকের এই মহতী সেমিনারের প্রধান অতিথি, ছাত্রনেতা জনাব মজিবুর রহমান মনজু। বিশেষ অতিথি আমার রাজনৈতিক শিক্ষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সম্মানিত সদস্য জনাব তাসনীম আলম ভাই; এই সেমিনারের প্রধান আলোচক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. এম উমার আলী, শিক্ষাবিদ ড. মো: বেলাল হোসাইন, ড. মো: নিজাম উদ্দিন, জনাব আবদুল হান্নান, জনাব আ. স. ম. মামুন শাহীনসহ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতৃবৃন্দ, সুধীমণ্ডলী, ভাই এবং বোনেরা। একটি চমৎকার প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়েছে। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন আমার শিক্ষক দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ শাহ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান স্যার, যিনি একজন বিদগ্ধ গ্রন্থকার, প্রবন্ধকার স্বাভাবিকভাবে তাঁর কাছ থেকে আমরা একটি সুন্দর প্রবন্ধ পেয়েছি। বহুদিন থেকে তিনি বিভিন্ন সেমিনারে প্রবন্ধ পেশ করে আসছেন সেজন্য স্বাভাবিকভাবে শ্রোতা-দর্শকবৃন্দের উপযোগী প্রবন্ধ তিনি পেশ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই প্রবন্ধের দুটো দিক আছে, একটি হলো- অবক্ষয়ের দিক। এই অবক্ষয়ের দিকটিকে তিনি খুব চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। আমি প্রবন্ধ পড়েছি এবং শুনেছি। পড়ার সময় আমার মনে হয়েছে স্যার যদি সাংবাদিকতা করতেন ভালো করতেন। সাংবাদিকসুলভ তথ্য তিনি পরিবেশন করেছেন। শেষের দিকে অবক্ষয় প্রতিরোধে ইসলামী শিক্ষার যে ভূমিকা সেই ভূমিকার প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি সংক্ষেপে কথা বলেছেন। সংক্ষেপে কথা বললেও মূল কথাগুলো এই প্রবন্ধের মধ্যে এসে গেছে।

আমি এই আয়োজনকে স্বাগত জানাই এবং আমি অনুরোধ করি আজকে যে প্রবন্ধ দুটি সেমিনারে পড়া হয়েছে সকালে এবং বিকেলে; সম্ভব হলে আলাদা আলাদাভাবে এই প্রবন্ধ দুটিকে পুস্তক আকারে ছড়িয়ে দেয়া উচিত। স্বাভাবিকভাবে মানুষ বড় বই কিনতে চায় না। এই ধরনের প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ যদি ছোট আকারে প্রকাশ করা হয় তাহলে মানুষের কিনতে সুবিধা হবে। আর এই বিষয়গুলো

সাধারণ মানুষের মধ্যে খুব দ্রুত ছড়িয়ে দেয়া উচিত। দ্বিতীয় যে বিষয়টি সেটি হলো, বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের সেমিনার বেশি বেশি হওয়া উচিত। শুধু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এ প্রবন্ধ নয় বরং মফস্বল শহর পর্যন্ত এই ধরনের প্রবন্ধ যেভাবে ছড়িয়ে দেয়া যায় সে চিন্তা আমাদের করা উচিত। স্বাভাবিকভাবে আমি দীর্ঘ সময় নিতে পারি না। আর আমি এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞও নই। আমি কবিতার অঙ্গনে সামান্য একজন কবি। এর চেয়ে বড় পরিচয় আমার নেই। আমি মনে করি যে, এই সেমিনারে আমাকে আলোচনা করার সুযোগ দেয়ার মধ্য দিয়ে আসলেই আমাকে সম্মানিত করা হয়েছে। এতোটা সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত আমি নই। ইসলামকে ভালোবাসি; ইসলামী আন্দোলনকে ভালোবাসি; ইসলামী সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে ভালোবাসি। সেজন্য ইসলামী শিক্ষার প্রতিও আমার একটি আকর্ষণ আছে। কারণ ইসলামী শিক্ষাই সবকিছুর পিছনে চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। মূল আলোচনা বিদগ্ধ জনেরা করেছেন- পণ্ডিতজনেরা করেছেন- আরো যারা বিদগ্ধজন আছেন, পণ্ডিতজনেরা আছেন- তাঁরা করবেন। বিশেষ করে সম্মানিত সভাপতি এবং প্রধান অতিথি মূল আলোচনা করবেন। বিশেষ অতিথি তাসনীম ভাইও মূল আলোচনা করবেন।

আমি প্রাসঙ্গিক কিছু কথা বলে শেষ করে দিতে চাই। আমি শিক্ষা বলতে বুঝি চরিত্র। আমি চরিত্র বলতে বুঝি শিক্ষা। আমি চরিত্র বলতে বুঝি সংস্কৃতি। চরিত্র শব্দের অর্থ বলতে আমি বুঝি স্বভাবকে; প্রত্যেকটি কাজের নামই চরিত্র। প্রত্যেক কাজকে চরিত্র বলা হয়েছে, এজন্য রাসূলে করীম (সা.) প্রত্যেকটি কাজই যেনো মানুষ বরকত পায় তার জন্যে প্রত্যেকটি কাজ শুরু করার জন্য তিনি বিসমিল্লাহ বলে শুরু করতে বলেছেন। এই বিসমিল্লাহ মুসলমানদের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেকটি কাজকে আমি চরিত্র কেন বলব, এ জন্যেই যে আমরা স্বাভাবিকভাবে বলি লোকটির কাজ কর্ম ভালো না। আবার আমরা বলি লোকটির চরিত্র ভালো নয়। আবার আমরা বলি লোকটার স্বভাব ভালো নয়। তার মানে স্বভাব যা, চরিত্র মানে তাই। চরিত্র মানে যা, কাজ কর্ম মানে তাই। আমি সংস্কৃতির উপর চর্চা করতে গিয়ে এই বিষয়টিকে ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করেছি। প্রত্যেকটি কাজকেই চরিত্র বলা হয়ে থাকে। এই যে আমি বক্তৃতা দিচ্ছি এটাও একটি চরিত্রের কাজ। এই আমি অঙ্গুলী উত্তোলন করলাম এটাও একটি চরিত্রের কাজ। প্রত্যেকটি কাজই চরিত্র। সে জন্য ইসলামী চরিত্র হচ্ছে যে কোনো কাজ কুরআন এবং হাদীস অনুযায়ী করাই ইসলামী চরিত্র। আর চরিত্র মানে হলো সেরূপ কোনো কাজ সুন্দরভাবে করা। শেখ সাদীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে আপনি এত আদবীন হয়েছেন কেনো? আপনি এত চরিত্রবান মানুষ হয়েছেন কিভাবে? এতোটা আদব কার কাছ থেকে শিখেছেন? শেখ সাদী বলেছিলেন, “বেয়াদবের কাছ থেকে আদব শিখেছি”। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল বেয়াদবের

কাছ থেকে আদব কিভাবে শিখলেন? শেখ সাদী বলেছিলেন- একটা বেয়াদব যা যা করে তাই না করলেই তো আদব শেখা হয়ে গেলো। সে জন্য চরিত্র যদি কেউ শিখতে চায়, চরিত্রের উপর যদি কেউ শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে চায় তাহলে সে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই চরিত্রকে উদ্ধার করতে পারে।

ওমর (রা.) তার কয়েকজন সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে আয়েশা (রা.) নিকট গিয়েছিলেন। আমরা আপনার কাছে এসেছি রাসূল (সা.) এর চরিত্র সম্পর্কে, রাসূলের জীবন সম্পর্কে কিছু জানার জন্য। আয়েশা (রা.) অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। শুধু কবিতাই মুখস্থ রেখেছিলেন সাড়ে চার হাজারের মত। এই মানুষটি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন বলেই হযরত ওমর (রা.) এর মত মানুষ তার কাছে গিয়েছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন রাসূল (সা.) এর চরিত্র বা জীবন সম্পর্কে, জীবন-যাপন সম্পর্কে। আয়েশা (রা.) তখন বলেছিলেন- “কানা খলুকুল্ল কুরআন”- রাসূলের চরিত্র কুরআন ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা চরিত্রের কথা বলি; আমরা সংস্কৃতির কথা বলি; আমরা শিক্ষার কথা বলি যার কথাই আমরা বলি না কেন আসলেই আমাদের সব কিছুর উৎসই হচ্ছে কুরআন। তার মানে কুরআনই আমাদের চরিত্র; কুরআনই আমাদের সংস্কৃতি; কুরআনই আমাদের শিক্ষা। এই কুরআনকে যারাই বর্জন করেছে তারাই মানবতার নিম্নতম পর্যায় গিয়ে পৌঁছেছে। এজন্যে রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন- “নিঃসন্দেহে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদেরকে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে দেন। যারা কুরআনকে অবলম্বন করে কুরআনের শিক্ষাকে গ্রহণ করে”- তার মানে কুরআনের চরিত্রকে গ্রহণ করে। কুরআনের সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে। আর যারা কুরআনকে বর্জন করে তাদের জন্য আল্লাহর রাসূল (সা.) পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, যুগে যুগে তারা ধ্বংসের অতল তলে পৌঁছে যাবে। এ জন্যে ইবনে খালদুন স্পেনের লোকদের দিকে তাকিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন, বই লিখেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি বলেছেন- “স্পেনের লোকেরা যেদিন ইসলামকে এবং এ কুরআনকে পরিত্যাগ করলো, যেদিন ইসলামের সংস্কৃতিকে পরিত্যাগ করলো, সেদিন থেকে তাদের অধঃপতন শুরু হয়ে গেলো। সুতরাং কথা একটাই, সেটি হচ্ছে, কুরআনকে বর্জন করার অর্থই হলো সবকিছু পতনের দিকে অগ্রসর হওয়া। ৪৭-এ আমরা একবার স্বাধীন হয়েছিলাম আর আমরা পরাধীন হয়েছিলাম ইংরেজদের হাতে। আসলে চারিত্রিক অবক্ষয়, আমাদের নৈতিক অবক্ষয় প্রচণ্ডভাবে শুরু হয়েছে যখন ইংরেজরা আমাদেরকে দখল করেছে। ইংরেজদের গোলামে আমরা যখন পরিণত হয়েছি তখন থেকেই আমরা আমাদের অবক্ষয়ের সবকিছুকে গ্রহণ করেছি। ইংরেজরা এখন চতুর-ইংরেজরা খুব চালাক। এজন্য তারা খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছিল যে, এদের চরিত্র যদি ধ্বংস করে দিতে পারি, তাহলে এদের উপর আমরা প্রভুত্ব

করতে পারবো। সে জন্যেই ইংরেজরা সর্বপ্রথম যে চেষ্টাটা নিয়েছিলো সেটা হলো ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কিত, তারা ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন করে ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করলো। এই শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে উইলিয়াম হান্টার থেকে শুরু করে আরো বড় বড় মনীষী কাজ করলেন। উইলিয়াম হান্টার খুব বড় ধরনের ভূমিকা পালন করলেন ইংরেজদের শিক্ষাব্যবস্থা চালুর ক্ষেত্রে। এই শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বড় ধরনের সাফল্য অর্জন করার পরে উইলিয়াম হান্টার নিজেই বললেন- “Our system of education is opposed to the tradition, united the requirement and helpful to the religion of Muslim.” আমরা যে শিক্ষা দিলাম এই উপমহাদেশের মানুষের জন্যে এই শিক্ষায় যারা শিক্ষিত হবে এর প্রথম গুণ হবে, তারা তাদের ইতিহাসকে অস্বীকার করতে শুরু করবে; তারা তাদের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করতে শুরু করবে। দুই নম্বর হলো এই শিক্ষায় যারা শিক্ষিত হবে তারা অর্থের পিছনে ঘুর ঘুর করবে এবং সম্পদের পিছনে ঘুর ঘুর করবে, তারা তাদের জাতিকে ভুলে যাবে, তারা তাদের দায়িত্ববোধকে ভুলে যাবে।

আর তিন নম্বরের কাজ-তারা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পেয়েছে সেটা হলো মুসলমানরাই ইসলামকে হিট করতে শুরু করবে। মুসলমানরাই ইসলামকে আঘাত করা শুরু করবে। এই জন্যেই এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত হয়েছিলো দাউদ হায়দারের মতো কবি। সে রাসূল (সা.) কে উদ্দেশ্য করে লিখেছিল, “বধিদ্দোম ছায়াতলে বসে আছে বুদ্ধ, মুহাম্মদ তুখোড় বদমাশ- চোখে-মুখে রাজনীতি”। এই শিক্ষাব্যবস্থা দাউদ হায়দারকে তৈরী করেছে; এই শিক্ষাব্যবস্থা শামসুর রাহমানকে তৈরী করেছে। সে আজানের শব্দ শুনতে পেয়ে নানান রকমের বেশ্যার শব্দ আবিষ্কার করে। (নাউয়িবুল্লাহ মিন যালিক) এই শিক্ষাব্যবস্থাই কবীর চৌধুরীকে তৈরী করেছে। ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থা ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ শিক্ষককে তৈরী করেছে যে রাসূলে করীম (সা.) কে সম্রাসী বলতে দ্বিধাবোধ করেনি। এই শিক্ষাব্যবস্থাই বুশকে তৈরী করেছে যে বুশ কয়েকদিন আগে বক্তৃতায় বলেছে যে, ইরাকের লোকেরা সভ্য দেশের সৈনিকদের উপরে, সভ্য দেশের মানুষের উপরে আক্রমণ চালাচ্ছে। কি সুন্দর ফতোয়া, যে সমস্ত সৈনিকেরা ইরাকের মুসলমান মা-বোনদের ইজ্জত হরণ করছে- গণ আইনের তোয়াক্কা করেনি ইরাকের মুসলমানদের স্বাধীনতাকে হরণ করেছে; সেই সৈনিকের বাদশা কি চমৎকার করে বলেছে যে, সভ্য মানুষের উপরে আক্রমণ করছে। তার মানে বুশ সাহেব বলতে চান সমস্ত মুসলমানেরা অভদ্র-অসভ্য; আর আমেরিকার বুশ আর ক্লিনটন সাহেবরা সভ্য! পশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থাই বুশ সাহেবকে তৈরী করেছে; পশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থাই ক্লিনটনকে তৈরী করেছে। পশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থাই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ষণে সেক্সুয়াল তৈরী করেছে।

আমরা ঐ শিক্ষাব্যবস্থার মুখে থু থু দিতে চাই, ঘৃণা করি। ইংরেজরা চালাক ছিলো সেজন্য তাদেরকে দিয়ে আমাদের দেশ স্বাধীনতা আনিয়ে দিয়েছিলো তাদের মাথায় এবং মগজে ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থাকে রেখে দিয়েছিলো। সে জন্য যারা স্বাধীনতা দিয়েছিলো আমাদের ৪৭-এ। তারা আমাদের স্বাধীন শিক্ষাব্যবস্থা দেয়নি। তারা আমাদের স্বাধীন জীবনব্যবস্থা ইসলাম দেয়নি, সে জন্য আমরা আজকে ধুকে ধুকে মরছি। যখন ইংরেজরা এদেশ দখল করেছিলো; নৈতিক অবক্ষয়ের চিত্র এতোটা করুণ ছিলো যে, কবি গালিব তখন অন্তরের অন্তঃস্থ থেকে চিৎকার করে কবিতা লিখেছিলেন, “হাম ঘাবড়া কাই কারতে হাইকে মরগা জায়েয হাম, মারকি ভিচায়েন না পাওয়া তু তা তায়েঙ্গে হাম”। সমাজের এ অবস্থা দেখলে মরে যেতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু মরেও যদি শান্তি না পাই তাহলে যাব কোথায়? এই অবস্থায় পরিবর্তন ঘটেনি। সে জন্য স্বাধীনতার কবি নজরুল তার স্বরে চিৎকার করে বলেছিলেন, “পাঠাও বেহেস্ত হতে হযরত, শোন সাম্যের বাণী আর দেখিতে পারি না মানুষে মানুষে এই হীন হানাহানী। এই যে হানাহানি, এই হানাহানির ঘুণ তারা আবিষ্কার করেছে। তারা এ নাম তোমার দিগন্তরে তুমি কেনো তুমি ভয় পাও, কেনো কাঁপো অজ্ঞাত ডরে”? সাহসী করো তো বেদোহন সাইকে। সেই দিনগুলো চলে গেছে বিগত নির্বাচনের পরে সাহসের সূর্য উদিত হয়েছে বাংলাদেশের আকাশে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী শক্তি যতো দিন দাপটের সাথে টিকে ছিলো ততোদিন পর্যন্ত তারা ধারণা করেছিলো যে, ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা যদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তাহলে তাদের ব্যর্থতা উন্মোচিত হয়ে যাবে। সেজন্য এই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সম্ভ্রাসীরা, আওয়ামী খুনিরাই ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার প্রণেতা শহীদ আব্দুল মালেক ভাইকে হত্যা করেছে। তারা বুদ্ধিমান সে জন্য কাকে হত্যা করতে হবে তারা তা বুঝেছিলো।

এই তোফায়েল আহমদরাই নেতৃত্ব দিয়েছিলো মালেক ভাইকে হত্যা করার জন্য। সুতরাং আজকে যারা ইসলামী আন্দোলন করছে তাদের সামনে কি সেই নিয়ত নেই আমাদের সব চেয়ে সুন্দর ভাইটিকে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার জন্য যারা হত্যা করেছে তাদের বিরুদ্ধে আমরা বসে থাকতে পারি না। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রথমত শিক্ষা আন্দোলনকে জয়ী করতে হবে। তা না হলে আমাদের দেশে দাড়িওয়ালা মানুষ থাকবে না। সেই আমাদের প্রথম সাংস্কৃতিক আন্দোলন হলো ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থাকে জয়ী করা। আল্লাহ রাসুল আলামিন এদেশের ইসলামী আন্দোলনকে এবং বিশেষ করে আজকের তরুণ ছাত্র সমাজকে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিপ্লব আনার তৌফিক দান করেন। সবাইকে ধন্যবাদ।

[এই অভিভাষণগুলো মতিউর রহমান মল্লিক-এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত অভিভাষণ। অভিভাষণগুলো অডিও ফিলা থেকে শ্রুতি লিখন করে এখানে পাণ্ডুলিপি আকারে উপস্থাপন করা হলো। অভিভাষণের লেখ্যরূপ দান করেন দেশীয় সাংস্কৃতিক সংসদের সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম।]

অভিভাষণ- ১

আমি সংস্কৃতির উপরে তাত্ত্বিক আলোচনায় আজকে যাচ্ছি না। আমি গুরু দিকেই দু'একটি বিষয়ে কালচারকে বুঝতে গেলে আবুল মনসুর আহমেদের একটি উদ্ধৃতি চাই আমাদের সামনে রাখতে, তিনি বলেছেন- মাছ, গোশত, তরকারি রাখিয়া খাইবে, নাকি কাঁচা খাইবে, এটা হইলো সভ্যতা ছাড়া কিছু না। এর বাঁধার পদ্ধতি, কোনটা খাবে, কোনটা খাবে না, কোনটা হালাল, কোনটা হারাম, কিভাবে পাকপ্রণালী পছন্দের, এটা হলো কালচারের বিষয়। সভ্যতা এবং কালচারের মধ্যেই এইগুলোর পার্থক্য। গোশতটা রান্না করে খাবে এটা সভ্যতা। আমি একবার আমাদের ভাইয়ের কাছে শুনেছিলাম, আসামের ঐ দিকে একটা প্রদেশ আছে না? উপজাতির দেশ, তাঁর আব্বা সেখানে চাকরী করতো। সেই উপলক্ষে সে সেখানে থাকতো। তো একটা গল্প বলেছিলো, আমি শুনে হতবাক হয়ে গেছি। গল্পটা হচ্ছে যতো ধরনের পোকা আছে, শুয়ো পোকা থেকে শুরু করে, বিশেষ করে রসালো পোকা, জঙ্গলে যেসব পোকা পাওয়া যায়। সব পোকা তারা সংগ্রহ করলো। সংগ্রহ করে তারা বাঁশ দিয়ে তৈরী চোঙের মধ্যে ঢুকালো। ঐ চোঙ অনেক দিন মাটির তলে রেখে দিলো। সেগুলো পঁচে একেবারে শরবতের মতো হয়ে গেলো। তারপর মাটির তলা থেকে গুটা বের করে ছেকে নানান ধরনের মসলা দিয়ে চুমুক দিয়ে খায়। এই কাজটি সভ্য সমাজের কাজ? প্রাণীতো কতোরকমের প্রাণী আছে। তিনি কোন প্রাণী খাবেন, আর কোন প্রাণী খাবেন না, কিভাবে খাবেন, ঐ যে পোকা খেয়েছেন, এই যে পোকা খাওয়ার ব্যাপারটা, এটা বিদ্যুটে ব্যাপার কিনা? এইখানে কি সুন্দর করে বুঝিয়েছেন আবুল মনসুর আহমদ, যে কোন জিনিসটা কিভাবে খাবে সেটা হলো সভ্যতার ব্যাপার।

আর সংস্কৃতির ব্যাপার হলো কি পদ্ধতিতে থাকে। আরও একটু পরিষ্কার বলতে গেলে কি থাকে, কি থাকে না এটা সভ্যতার ব্যাপার। কিভাবে থাকে, কোন প্রশালীতে থাকে, এটা হলো সংস্কৃতির ব্যাপার। আমি মুরগী কিনতে বাজারে যাই। হঠাৎ একদিন শুনলাম যে, ড্রামের মধ্যে মরা মুরগী থাকে। ড্রামের মধ্যে নতুন মুরগী জবাই করে রেখে পুরনোগুলো দিয়ে দেয়। ওদেরকে যদি বারবার চিৎকার করে বলি যে, বিসমিল্লাহ বলে জবাই করো ওরা কি আমার কথা শুনবে? আমিই জোরে বলে শুনাই। হিন্দুরা পাঠা জবাই করে ছোটবেলায় দেখেছি। গ্যাড়াকলের মধ্যে ফেলে তারপর এককোপ দিয়ে কেটে ফেলে। এটা কিন্তু তাদের সংস্কৃতির কাজ। আর আমাদের সংস্কৃতি হলো আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, “যে ছুরি দিয়ে তুমি জবাই করবে সেই ছুরিটাকে তুমি ভালো করে ধার দিবে। এমনভাবে ভালো করে ধার দিবে যেন, খুব সহজে জবাই হয়ে যায়।” আল্লাহর রাসূল (সা.) শুধু জবাই করার পদ্ধতি বলেননি, যে অস্ত্রটা দিয়ে জবাই করতে হবে, সেই অস্ত্রটার চরিত্র সম্পর্কে বলেছেন। ভালো করে ধার দিয়ে জবাই করতে হবে। এখন ভালো করে ধার দিয়ে যদি জবাই করা না হয়, পশুটা কষ্ট পাবে, যতোটা কষ্ট পাবে অতোটা তোমার গোনাহ হবে। তো মুরগীর কথা বলছিলাম আমি শুনলাম যে, ড্রামের মধ্যে মুরগী মরা মুরগী একটার পরিবর্তে আরেকটা ঢুকাল তারা লাভের জন্য এ কাজটি করে। এ জন্য মুরগীর দোকানদারের কোনো লোকসান হয় না, মুরগী মারা গেলেও। এই কথা শোনার পর, আমি আর ড্রামের মধ্যে মুরগীটা ভরি না। বাইরে রাখি, আমি আমার মুরগীর রং ভালো করে দেখে নেই। কোন রঙের মুরগী। এই যে, তুমি মুরগী থাকে না শুয়োর থাকে এটা হলো সভ্যতা। এখন সভ্যতা তোমাকে কি বললো সভ্যতা তোমাকে বললো যে শুয়োর খাওয়া যাবে না। কেনো যাবে না? একজন ডক্টরেট ডিগ্রিধারী ডাক্তারের সাথে আমি এ ব্যাপারে কথা বলেছি, শুয়োরতো খাওয়া যাবে না, কেনো খাওয়া যাবে না? তিনি বলেছিলেন যে, গরু জবাই করলে একটা নালা কেটে শিরা থেকে ঐ খারাপ রক্তটা বেড়িয়ে যায়। কিন্তু শুয়োরকে জবাই করলে খারাপ রক্তটা বেড়িয়ে যায় না; এটা পরীক্ষা করে দেখা গেছে। দেখো আল্লাহর রাসূল (সা.) কতো আগে বিষয়টা অবহিত করেছেন। আল্লাহ তাঁকে শিখিয়েছেন বলেই আমাদের বিষাক্ত রক্ত থেকে বাঁচিয়েছেন। এখন শুয়োর খেলাম না, এটা আমার সভ্যতার বিষয়। আমি খেলাম মুরগী, মুরগী কিভাবে থাকে- খাওয়ার ক্ষেত্রে আমি জবাই করা থেকে কাজ শুরু করবো, বিসমিল্লাহ বলে জবাই করবো তারপরে সুন্দরভাবে সেটাকে পরিষ্কার করবো। যেগুলো ফেলে দেওয়া দরকার সেগুলো ফেলে দিবো। তারপর রান্না করে খাবো। জঙ্গলে এখনো পর্যন্ত কিছু মানুষ আছে, তারা কাঁচা গোশত খায়। তার মানে কি খাবো, কি খাবো না সেটা সভ্যতার বিষয়। কি করবো, কি করবো না। কি মাখবো, কি মাখবো না, সেটা সভ্যতার বিষয়।

কি পরবো, কি পরবো না, সেটা সভ্যতার বিষয়। কিন্তু কিভাবে করবো এই পদ্ধতিগত প্রশ্ন যখনই আসবে, তখনই সেটা সংস্কৃতির বিষয়। যেমন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু করবো। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার জন্য, কি করবো, কি করবো না সেটা সভ্যতার বিষয়। কিন্তু কিভাবে করবো সেটা সংস্কৃতি। এই পদ্ধতিগত প্রশ্ন যখনই আসবে তখন বুঝতে হবে এটা সংস্কৃতির বিষয়।

আর সভ্যতা বিভিন্ন জিনিসপত্রের সাথে জড়িত যার বিস্তিৎ হবে এক। হিন্দুরা যখন দালান করে তখন এই শিরাটা রাখে। আমাদেরও অনেক বিস্তিৎ আছে শিরা রাখে না। কিন্তু হিন্দুরা শিরাটা যখন ছেড়ে দিলো তখন ঐ ভিতর দিকে একটু পাতার মতো করলো, হিন্দুরা এটা করে। এটা হিন্দুরা সাপের মনসার একটা প্রকৃতি নিয়ে তৈরি অনেক হিন্দু বাড়িতে দেখবে যে, এই শিরাটাকে একটু সমান করেছে কিন্তু উপরের দিকে গিয়ে একটু পাতার মতো, আসলে ওটা পাতা না ওটা হলো সাপের মাথা। তুমি মিছিলে গেলে কাগজের টুপি পড়তে পারো। কোনো উৎসবকে কেন্দ্র করে তাদের টুপি পরো। খাঁচ কেঁটে কেঁটে যে টুপিটা বানায় এটা হলো হিন্দুদের সংস্কৃতি। কারণ হলো হিন্দুদের মূর্তির মাথায় যে টুপিটা থাকে সেটা হলো খাঁচ কাঁটা খাঁচ কাঁটা।

আর সংস্কৃতির ব্যাপারে যারা সচেতন মুসলমান তারা যখন কাগজের টুপি বানায় তখন কোনো খাঁচটাচ কাঁটে না। যেমন মসজিদের দরজা করে সেটা সোজা। এই যে তুমি মসজিদের দরজা করছো, কোন কায়দায় করছো। কাগজের টুপি যখন বানাচ্ছে এটা কিন্তু সংস্কৃতি। এখন আমরা যখন সভ্যতা-সংস্কৃতি খানিকটা বুঝলাম। তখন সংস্কৃতি কি আমাদের বুঝতে হবে। আমি সংস্কৃতির উপরে পড়াশোনা করে যেটা বুঝেছি সেটা হচ্ছে- প্রত্যেকটি কাজের কায়দা কানুনের নামই হলো সংস্কৃতি। প্রত্যেকটি কাজের নিয়ম আছে, নিয়মটা কী? যেমন ধরো আমি নীচেই খেতে বসেছি। এখন আমি যদি এই ভাবে খাই এটা হলো হিন্দু সংস্কৃতি। ঠ্যাস দিয়ে হিন্দুরা খায়। কিন্তু ঠেস দিয়ে খেতে ইসলাম সম্মতি দেয় না। ঠেস দিয়ে খেলে পেট বড় হয়। বেশি খাওয়াটাকে জেন্নের খাওয়া বলে। জেন্নের খাওয়াটাকে ইসলাম সম্মতি দেয় না। এক ভাগ পানি, এক ভাগ খাবার, আর একভাগ খালি রাখা। এটা হলো যথার্থ ঠিক। তো হিন্দু সংস্কৃতি কি? খাবারের সময় তারা কথা বলবে না। আমি নিজেই ছোটবেলায় জেনেছিলাম যে, খাবার খাওয়ার সময় কথা না বলাটাই ইসলামের নিয়ম। কিন্তু পরে আমি পড়াশোনা করে জেনেছি যে, খাবারের সময় কথা না বলাটা হলো ভারতীয় কালচার হিন্দুদের কালচার। খাবারের সময় প্রয়োজনীয় কথা বলাটা ইসলাম বৈধ করেছে। কি চমৎকার। এগুলো জানতে হবে।

আমি বলেছিলাম কালচার বা সংস্কৃতি মানেই হলো প্রত্যেকটি কাজের নিয়ম। সংস্কৃতির মানে হচ্ছে সংস্কার। বসনিয়ার প্রেসিডেন্ট সংস্কৃতির উপরে চমৎকার

একটি বই লিখেছেন। বইটার অনুবাদ আমার কাছে আছে। সেই বইটাতে আছে সংস্কৃতির মানে ধরুন; গতকালকে আমি যতোটা ভালো ছিলাম আজকে তাঁর চেয়ে ভালো হওয়ার জন্য নিজের প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টার নাম হচ্ছে সংস্কৃতি। এই জন্য আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন গতকালকের চেয়ে আজকের দিনটা যার ভালো হলো না সে ধ্বংস হয়ে গেলো। এখানে রাসূলের কথার মিল পাওয়া গেছে। সংস্কৃতি মানে হলো তুমি গতকালকে যতোটা ভালো ছাত্র ছিলে না, আজকে তাঁর চেয়ে ভালো ছাত্র হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এমনি প্রত্যেকটা ভালো কাজের ক্ষেত্রে তোমার যে প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা, এটাকে ড. আলীয়া আলী দেহলভী সংস্কৃতি বলেছেন। সংস্কৃতি হলো প্রত্যেকটি কাজ সর্বোত্তমভাবে করা, প্রত্যেকটি কাজ করার সময় সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা নিয়োগ করা এবং সর্বশক্তি প্রয়োগের নামই সংস্কৃতি। এই যে, আমি বক্তৃতা দিচ্ছি, আমি যদি আমার বক্তৃতার কাজটাকে আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে করি, ভালো করে করার চেষ্টা করি তাহলে এই বক্তৃতা দেয়ার যে কাজটা এই কাজের ক্ষেত্রে আমি উত্তম সংস্কৃতির অনুসরণ করছি।

ঐ যে তুমি বসেছো, তোমার যদি চেষ্টা থাকে তুমি সবচেয়ে সুন্দর করে বসবে। বসা একটা কাজ সবচেয়ে ভালো করে বসার জন্যে যে প্রচেষ্টা, এটাই সংস্কৃতি। তুমি যেখানে শুয়ে থাকবে। সেই শুয়ে থাকার জায়গাটাকে যতোখানি সুন্দর করে তুমি তৈরি করতে পারো। আল্লাহর রাসূল (সা.) শুতেন ডান কাতে, উত্তর দিকে মাথা দিয়ে অর্থাৎ যদিকে কবরস্থ করলে মানুষ দেখতে পায়। সে দিকে মাথা দিয়ে হোক, গালের নিচে একটু ফাঁকা। আমার কাছে মনে হয়েছে গালের নিচে। অনেকের কাছে মনে হয়েছে কানের নিচে আবার কারো কাছে কানের নিচে, গালের এবং কানের নিচে। এটা আমি বুঝেছি, আমি একদিন শুয়ে ছিলাম ঠিক পিঁপড়া একটা ঢুকে গেলো আমার কানে। কি মুসিবত! এটা করি, সেটা করি আবার ভিতর কামড়ায়। কে যেনো আমায় বলেছিলো যে, অনেকক্ষণ ধরে দুইকান আটকে, নাক আটকে, মুখ আটকে, মানে বাতাস ঢোকান সব রাস্তা বন্ধ করে দীর্ঘক্ষণ ধরে চাপ দিলে পিঁপড়াটা দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে। তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হবে। আমিও ওরকম চেষ্টা করতে করতে টের পেলাম যে পিঁপড়াটা মরে গেছে। তো এই যে ডান কাত হয়ে শুতে হবে। ডান কাতে শুতে হবে আমি যে দিন পিঁপড়ে ঢুকলো সেদিন বুঝলাম গালের নিচে হাত না, কানের নিচে হাত দিয়ে শুতে হবে, কান এবং হাতের নিচে দিয়ে শুতে হবে যাতে পিঁপড়ে ঢুকতে না পারে। এখন এই যে তুমি শুচ্ছো, সবচেয়ে সুন্দর করে শোয়ার যে চেষ্টা করছো এটাই সংস্কৃতি। আর এই শোয়ার চেষ্টার ক্ষেত্রে রসূল (সা.) কে যখন মান্য করবে তখন এটা হয়ে যাবে ইসলামী সংস্কৃতি।

কোনো অনুষ্ঠানে বসার জন্যে আল্লাহর রসূল (সা.) এর নির্দেশ- “তোমরা আগে আগে সামনের আসনগুলো পূরণ করবে পরের আসন খালি থাকবে।”

কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের যেখানেই যাবেন, যে অনুষ্ঠানেই যাবেন দেখা যাবে কয়েকটা চেয়ার খালি, তারপরে মাঝখানে খালি, এদিকে ৫জন, ঐদিকে কয়েকজন বসে রয়েছেন। ইসলামের এই পদ্ধতি যদি তারা জানতেন তাহলে বসার ক্ষেত্রে ইসলামের যে সংস্কৃতি সেটা তারা পালন করতো। সংক্ষিপ্ত কথা হলো, যেকোনো কাজ তুমি করবে সেটা সর্বোত্তমভাবে করার নামই হলো সংস্কৃতি।

ইউনিভার্সিটির একজন টিচারকে আমি দেখেছি। একদিন দেখি সে দাঁত খোচ্ছে, কান খোচ্ছে, এখন তুমি তাঁকে খুঁজবে কিভাবে। মীর কাশেম আলী ভাইকে দেখি যে একদিন চুলকাচ্ছে, সুন্দর করে যেটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। আমিও চুলকাতাম এরকম করে। মীর কাশেম আলী ভাইয়ের একটা আর্ট আছে। তো এই যে চুলকানোর কাজটা এটা একটা কাজ না? চুলকানোর কাজটাও যদি তুমি সুন্দর করো তাহলে এই সুন্দর করে করার যে পদ্ধতিটা, এই পদ্ধতিটাই হলো সংস্কৃতি। এ কথাই বলছি, যে কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে যতোটা কাজটা সুন্দর করে করার চেষ্টা এবং পদ্ধতিই হলো সংস্কৃতি। আর ইসলামী সংস্কৃতি সবচেয়ে ভালো কাজটা করার জন্য উৎসাহ প্রদান করে। তোমার এই যে বসাটা, নোট করতে সুবিধা হয় এইভাবে বসা উচিত। তারপরে এখান থেকে বের হয়ে যাবে, বের হওয়াটা একটা কাজ না? এখানে বসে আছো, এখান থেকে উঠে যাবে, উঠে দাঁড়ানোও একটা কাজ। আমি সেদিন বলেছিলাম যে, “রসূল (সা.) কোনো জায়গায় বসলে সেখানে ঝেড়ে মুছে বসতেন।” আজকে আমি সে দিকে খেয়াল করতে পারি নাই। আমি বসে গেছি। সাধারণত আমি এটা করি না। একটা বিছানায় বসতে গেলে বা চেয়ারে বসতে গেলে আমি এটা খেয়াল করি। আল্লাহর রাসূল (সা.) পরিষ্কার করে বসতেন। আবার যখন উঠে যেতেন তখন সুন্দর করে গুছিয়ে উঠে যেতেন। এইখান থেকে বুঝতে হবে, যে কাজটা যেভাবে করতে হবে, সেই কাজটা সেইভাবেই করা উচিত।

অনেক সময় আমি লক্ষ্য করি যে, আমার রুমের দরজাটা বন্ধ ছিলো। একটা লোক দরজাটা খুললো। দরজাটা খুলে ঢুকলো, বন্ধ করলো না। তাঁর মানে গুরুটা করলো সুন্দর করে হয়তো। কিন্তু ফিনিশিং কাজটা সুন্দর করে করলো না। তাঁর বোঝা উচিত ছিলো যে, আমার দরজাটা বন্ধ ছিলো, দরজাটা আবার বন্ধ করা উচিত। তোমরা অনেক সময় দেখবে তোমরা বাথরুমে যাচ্ছে, বাথরুমে ঢুকছো, বাথরুম থেকে বের হবার সময় বাথরুমের দরজাটা খুলে বের হয়েছো। হ্যাঁ, যদি তুমি লোক দেখে খুলে বের হয়ে আসো তা হলে ঠিক আছে, একজন ঢুকবে। কিন্তু যদি কাউকে না দেখো তাহলে যেটা যেভাবে ছিলো সেটা সেভাবে রাখবে। তাহলে তুমি বাথরুমে ঢুকছো, তোমার দরজা খোলার একটা

কাজ ছিলো সেই কাজটা যদি তুমি সুন্দরভাবে করো তাহলে দরজা খোলার ক্ষেত্রে তোমার সংস্কৃতি মান্য করা হলো। আমি দাড়ি রেখেছি। দাড়ি রাখাটাকে আমি যেকোন কারণেই মান্য করেছি। এখন আমি দাড়ি একবার লম্বা করে ফেলি। একবার ছাঁটলাম, আবার ছোট করে ফেলি। এ জন্যে সংস্কৃতি আর রীতিকে বলা হয়েছে ‘তাহজীব’। তাহজীব মানে হেফাজত করা। বাড়াবাড়ি যতোটুকুন হয়েছে, বেড়ে গেছে যতোটুকু, ততোটুকু সাইজ করা। তাহজীব করা। যেমন অনেক ফুলের বাগানে ফুলের গাছগুলো সাইজ করে না। এটাকে তাহজীব বলে। মানে অপ্রয়োজনীয় বিষয়টাকে বাদ দেয়ার নামই হলো সংস্কৃতি। সংস্কৃতির আরেকটা সংজ্ঞা আছে- সংস্কৃতি হচ্ছে প্রয়োজনীয় কাজটা সুন্দরভাবে করা। এটা হলো সংস্কৃতি।

আর অপসংস্কৃতি হলো- অপ্রয়োজনীয় কাজটা করা। তাহলে অপসংস্কৃতি আর সংস্কৃতির পার্থক্য বুঝলে তা? এই একটি কথাই আমি বলে রাখতে চাই যে, অপসংস্কৃতি মানে হলো যতো রকমের অপ্রয়োজনীয় কাজ আছে সেই অপ্রয়োজনীয় কাজ করা। আর সংস্কৃতি মানে কি? প্রয়োজনীয় কাজটা সুন্দর করে করা। এ জন্যে আল্লাহ কি বলেছেন- “ফাসতা বিতুল খালাক” ভালো কাজের প্রতিযোগিতা কর। তাঁর মানে তুমি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করো অন্যদের সাথে। আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন- “বাদিউ বি আওয়া” যখনি কোনো কাজ করবে প্রতিযোগিতা করে করবে, প্রতিযোগিতা করে করতে গেলেই সেটা সুন্দর হয়ে যাবে। এইজন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা.) আসল কথাটাই বলে দিয়েছেন। তুমি বিছানা গোছাচ্ছে। তো আল্লাহর নির্দেশ যদি মান্য করো, রসূল (সা.) এর নির্দেশ যদি তুমি মান্য করো তাহলে কি মনে করতে হবে? বিছানাটা সুন্দরভাবে মনে করে গোছাতে হবে। সবার বিছানা থেকে তোমার বিছানা গোছানোটা হতে হবে সুন্দর। লুঙ্গি পরা শুধু একটা কাজ না। এখন সবাই লুঙ্গি নাড়ে। কিন্তু তোমার লুঙ্গি নাড়াটা সবচেয়ে সুন্দর জায়গায় হলো কি না, সবচেয়ে সুন্দর হলো কিনা? অনেকেই নাড়ে, লুঙ্গি, চারকোণা দেখা যায়। আবার অনেকে লুঙ্গি টুঙ্গি নেড়ে দেয় মনে হয় খুব সুন্দর করে সমান করে নেড়ে দেয়। অনেকে এমন জায়গায় লুঙ্গি নাড়ে, যেতে একবার মাথায় লাগবে, আবার পিঠে একবার লাগবে, একবার ঘাড়ে লাগবে। তো এই লুঙ্গি নাড়ার কাজটাও হতে হবে সবচেয়ে সুন্দর কাজ।

এভাবে প্রত্যেকটি কাজ সবচেয়ে সুন্দর করে করাটাই হলো সংস্কৃতি এবং সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজটাই হলো সংস্কৃতি। আর অপ্রয়োজনীয় কাজটা হলো অপসংস্কৃতি। আচ্ছা এবার সংস্কৃতির এবং অপসংস্কৃতিকে স্বল্পভাগে বুঝানোর

চেষ্টা করি। আমি আজকে সকালবেলা চিন্তা করতে করতে এলাম যে, এতোগুলো চেয়ার কোথায় কিভাবে সুন্দর করে রাখা যায়। তোমরা এখানে প্রশিক্ষণের কাজ করবে। সেজন্যে এ রুমটা খালি করে দেয়া দরকার ছিলো। এখন বারান্দায় চেয়ার রাখা হয়েছে। আমি দেখলাম যে আমার দাঁতের মতো চেয়ার রয়েছে। যারা চেয়ার রেখেছিলো তাঁরা যদি একটু সতর্ক হতো তাহলে ঐ বারান্দায় সুন্দর করে রাখা সম্ভব হতো। বাইরের লোকেরা এসে বসতে পারতো। তো আমি কি করলাম। ওখানে যখন এলোমেলোভাবে চেয়ারগুলো দেখলাম, তখন ভাবলাম চেয়ার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এটা সাংস্কৃতিক অফিসের জন্য অপমানজনক, এতো সুন্দর একটা অফিস আর সুন্দর ফুলের বাগান, পাশে যদি ঐ রকম চেয়ারগুলো এলোমেলো করে রাখা হয় তাহলে সুন্দর দেখাবে না। সেজন্যে কি করলাম কয়েকজন পরিশ্রমী লোক দিতে বললাম যারা কাজ করতে গেলে আনন্দ পায় তাদের। আমি আবার কাজ করতে গেলে যারা বিরক্ত হয় এধরনের লোকদের পছন্দ করতাম না। আমি তো তোমাদের সবাইকে চিনি না। কে কোন বংশের ছেলে চেয়ার টানতে গেলে কে অপমান বোধ করবে আমি জানতাম না। এ সমস্তু ছেলেকে ঘৃণা করি যারা কাজকে পছন্দ করে না। আব্রাহাম তায়াল্লা বলেছেন- “লাক্বাদ খলাকনালা ইনসানা ফী কাবাদ” নিশ্চয়ই আমি মানুষকে শ্রমনির্ভর রূপে তৈরি করেছি। আমি মানুষকে কাজ করার জন্য তৈরি করেছি অর্থাৎ কষ্ট করার জন্য তৈরি করেছি। যেখানেই কাজ সেখানেই কষ্ট। এজন্য আমাদের সকল কাজ সুন্দর ও পরিশীলিতভাবে হওয়া দরকার।

অভিভাষণ- ২

বিদেশের রাজনৈতিক শাসনের চাইতে, সাংস্কৃতিক অধীনতা অনেক বেশি ক্ষতিকর। ভারত আমাদেরকে রাজনৈতিকভাবে যতোটা শাসন করার চেষ্টা করছে, তাঁর চেয়ে বেশি শাসন করার চেষ্টা করছে সাংস্কৃতিকভাবে। তবে বাস্তবে সাংস্কৃতিক দাসত্ব, রাজনৈতিক দাসত্বের সঙ্গে শুধুমাত্র সম্পৃক্তই নয়, বরং সকল ইচ্ছা ও কাজে তা অবিভাজ্য। বিজীতরা সবসময় বিজয়ীদের পোশাক, প্রতীক, বিশ্বাস এবং অন্যান্য আচার প্রথা অনুকরণ করতে চেষ্টা করে। আমেরিকা আজকে বিজয়ী, গোটা মুসলিম জাহান আজকে পরাজিত। সেই জন্যে আজকে গোটা মুসলিম জাহান কি করছে? আমেরিকার পোশাক, আমেরিকার প্রতীক, আমেরিকার বিশ্বাস, আমেরিকার অন্যান্য আচার অনুকরণের চেষ্টা করছে। এটা বলেছেন- ইবনে খালদুন। এর কারণ হচ্ছে, মানুষ সবসময় বিজয়ীদের কাছে প্রিয়পাত্র হতে চায়। আমেরিকার কাছে বাংলাদেশের বহুদল প্রিয় হওয়ার জন্যে কতো রকমের বাহানা করেছে। একজন একবার যাচ্ছে প্রিয় হওয়ার জন্যে, আরেকজন আরেকবার যাচ্ছে প্রিয় হবার জন্য। কারণ হচ্ছে মানুষ সব সময় বিজয়ীদের কাছে প্রিয়পাত্র হতে আগ্রহী হয়, এটা দুই কারণেই হয়। প্রথমত, বিজয়ীদের প্রতি শ্রদ্ধা, দ্বিতীয়ত বিজয়ীদের মতো যোগ্যতার অধিকারী হতে। তাদের পরাজয় হতো না এই মনোভাব হেতু যোগ্যতা অর্জনের জন্য। আমেরিকার মতো যোগ্য যদি আমরা হতাম, তাহলে আমাদের পৃথিবীতে পরাজয় ঘটতো না। এই অনুভূতি আমাদের আমেরিকার প্রতি আকৃষ্ট করছে এবং এই অনুভূতি আমাদেরকে বলে, আমেরিকার মতো যোগ্য হলে আমরা পরাজিত হতাম না। এই বিশ্বাস দীর্ঘস্থায়ী হলে কি হয়? এটা একটা মারাত্মক, এটা একটা ব্যাপক আছাড় সৃষ্টি করে। বিজয়ীদের সকল কিছু অনুকরণে বিজীতরা আশ্বস্ত হয়ে যায়। এই বিশ্বাস অজ্ঞাতভাবে অথবা বিজয়ের জন্য বিজয়ীদের শারীরিক ও অস্ত্রের শক্তির চাইতে আচার আচরণ প্রাধান্য বিস্তার করেছে এই বিশ্বাস থেকে সৃষ্টি হতে পারে। এ অবস্থায় তখন এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে, বিজয়ীদের অনুকরণ। পরাজয়ের কারণে বিজয়ীদের মতো আমাদের সবকিছু করতে হবে

তা না হলে আমরা বিজয়ী হতে পারবো না। এভাবে দেখা যায়, বিজয়ীর পোশাক আমাদের পড়তে হয় এবং জীবন ধারণের সকল পদ্ধতিতে বিজয়ীদের অনুকরণ করে। বস্তুত প্রতিটি দেশই তাঁর বৃহৎ বিজয়ী প্রতিবেশীকে অনুকরণের চেষ্টা করে। প্রত্যেকটা প্রতিবেশী তাঁর কাছাকাছি সবচেয়ে বড় যে দেশটি আছে, সে দেশের অনুকরণ করার জন্যে যার-পর-নাই চেষ্টা করে, যেমন বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক বুদ্ধিজীবীরা সবচেয়ে বেশি মূল্য দেয় ভারতের। আশ্রাণ চেষ্টা করে তাদের মতো হতে। বস্তুত প্রতিটি দেশই তাঁর নেহাত বিজয়ী প্রতিবেশীকে অনুকরণের চেষ্টা করে। স্পেনের মুসলমানেরা বিজয়ী প্রতিবেশী খ্রিস্টানদের অনুকরণ করেছে। খ্রিস্টানদের পোশাক, অলঙ্কার এবং আচার আচরণের বিভিন্ন দিক এমনকি ঘরে ছবি রাখার ব্যাপারেও মুসলমানরা তাদের অনুকরণ করেছে। স্পেনের মুসলমানেরা যখন মনে করতে লাগলো যে, পার্শ্ববর্তী খ্রিস্টানরা উন্নতি করছে, তাঁরা যে যেভাবে উন্নতি করছে, আমরা যদি সে কাজগুলো অনুকরণ করি তাহলে আমরাও উন্নতি লাভ করতে পারবো। সে জন্যে অনুকরণের খেলায় স্পেনের মুসলমানেরা খ্রিস্টানদের রাজনৈতিকভাবে অনুসরণ করা শুরু করলো, অর্থনৈতিকভাবে অনুকরণ করা শুরু করলো, সাংস্কৃতিকভাবে অনুকরণ করা শুরু করলো এমনকি বৈঠকখানা পর্যন্ত খ্রিস্টানরা যেভাবে সাজাতো সেভাবে স্পেনের মুসলিমরা সাজানো শুরু করলো।

বাংলাদেশেও এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তোমরা তোমাদের নিজেদের বাড়িতে খেয়াল করবে। তোমরা তোমাদের আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে গেলেও খেয়াল করবে, শিক্ষাগুরুর বাড়িতে গেলেও, বড় বড় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের বাড়ি গেলেও খেয়াল করবে; বৈঠক খানার আলমারিতে বিভিন্ন ধরনের পুতুল, নানান ধরনের মূর্তি বিরাজমান, কারণ তাঁরা মনে করে যে, এভাবে সাজালে আধুনিক হওয়া যায়। এজন্যে ভারতীয় সংস্কৃতিসেবী ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক বাহক মুসলমান নামধারী লোকদের বাড়িতে তুমি স্বরস্বতী মূর্তি পাবে। আর ভারতীয় রাজনীতির যারা একান্ত ধারকবাহক তাদের বাড়িতে গেলে ইন্দীরা গান্ধী অথ বা গান্ধীজীর ছবি দেখতে পাবে। আমি তোমাদের জন্যে ইসলামী সাংস্কৃতিক কর্মীদের সামনে রেখে রাসুলে কারীম (সা.) এর কয়েকটি হাদীস পেশ করছি, খুব মনোযোগ দিয়ে তোমাদের শুনতে হবে। এই একটা সপ্তাহ গেলো, আমি কষ্ট করে একটি হাদীসের আমল করলাম। আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন- সকালের ঘুম মানুষকে দরিদ্র বানায়। সকালের ঘুম মানুষকে অভাবে রাখে। সকালের ঘুম মানুষকে আয় রোজগারের পথ বন্ধ করে। সারা রাত ইবাদত করে এবং গভীর রাত পর্যন্ত যারা ইসলামী আন্দোলনের কাজে ব্যয় করে তাঁরা যদি ফজর পড়ে ঘুমায় সেটা ভিন্ন কথা। রাসূল (সা.) এর একটি চমৎকার বক্তব্য আছে- “বেলা ডোবার সাথে যারা ঘুমায় এবং বেলা উঠার সময় যারা ঘুমায়

তাঁরা অসুস্থ থাকে।” এজন্য যারা বেলা ডোবার পর ঘুমায় আর বেলা উঠার পর যারা কুরআন তেলাওয়াত করে তাদের শরীর সুস্থ থাকে। ডাক্তারদের থেকে আলাপ করে আমি জেনেছি যে, বিমান বাহিনীতে যারা কাজ করে তাদের হার্ট ভালো থাকে তাঁরা সকাল বেলায় ঘুম বর্জন করে। এই সকাল বেলায় ঘুম তাড়ানোর ব্যাপারে পশ্চিমা গভর্নর নিয়ম করে বাচ্চাদের স্কুল সকালবেলা করেছে। তাঁরা বাচ্চাদের শিখায় আরলি টু বেড এই কথাটা। কিন্তু রাসূল (সা.) কতো সুন্দর করে কথা বলেছেন, আসনুবহাতু তাহতা উস্বা- সকালবেলায় ঘুম মানুষকে অভাবী বানিয়ে দেয়, দরিদ্র বানিয়ে দেয়। জ্ঞানের দিক থেকেও দরিদ্র বানিয়ে দেয়। জীবনের সব দিক থেকে পিছিয়ে দেয়, এ জন্যে সকালের ঘুমকে তাড়াতে হবে। রাত্রি জাগরণ যদি সঙ্গত কারণে হয়, তাহলে হিসেব নিকেশ করে ঘুমাবে। রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন রাত ৪টায় উঠে গেছে। হিন্দু সংস্কৃতির একজন ধারক বাহক হওয়া সত্ত্বেও। তিনি ব্রাহ্মণ ধর্মের ব্রাহ্মণ ছিলেন।

আমি রবীন্দ্রনাথের শাস্তি নিকেতনে গিয়ে দেখে এসেছি তাঁর উপাসনা ঘর। তাঁর ঘরে এক ঈশ্বরের উপাসনার কথা লিখাসহ খুব সুন্দর সুন্দর কিছু কথা লিখা আছে। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ একেশ্বরবাদী ছিলেন কিন্তু সাংস্কৃতিক দিক থেকে পুরোপুরি হিন্দুদের থেকে মারাত্মক হিন্দু ছিলেন। এই জন্যে হিন্দুত্বকে বিসর্জন দেয়ার পরেও যারা পরিপূর্ণভাবে মুসলমান হতে পারেনি, তাঁরা হিন্দু সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিতে পারেনি। এ জন্যে আমাদের দেশে গুধু বিয়ে করার জন্যে কিছু হিন্দু বুদ্ধিজীবী মুসলমান হয়েছে। বিয়ে করা শেষ হয়ে গেলে, তাঁরা তাদের নামটাকেই হিন্দু রেখে দিয়েছে, পরিচয় দেয়ার সময় গোপনে গোপনে যেখানে প্রয়োজন হয়, মুসলমান বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু এরা ধর্মীয় দিক থেকে নামকাওয়াস্তে ইসলামকে গ্রহণ করে। এরা সাংস্কৃতিক দিক থেকে মারাত্মক লোক। যেমন রামেন্দ্র মজুমদার। রামেন্দ্র মজুমদার সে ফেরদৌসি মজুমদারকে বিয়ে করার জন্যে নামকাওয়াস্তে ইসলাম গ্রহণ করেছে। আজকে সে এদেশে বাঙালি সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার নামে হিন্দু সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে জীবন দিতে প্রস্তুত আছে। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.) শিরককে তুলনা করেছেন লবণের খনির সাথে। লবণের খনিতে পড়লে যেমন- সবকিছুই নিঃশেষ হয়ে যায়। শিরকের সংস্পর্শে গেলে মানুষের সবকিছুই শেষ হয়ে যায়। এ জন্যে ফেরদৌসি মজুমদার যদিও মুসলমান ঘরের মেয়ে কিন্তু হিন্দু সংস্কৃতিকে গ্রহণ করার কারণে, তাঁর আর জীবনের কোনো ক্ষেত্রে মুসলমানিত্বকে কাছে রাখা সম্ভব নয়। কখনো কখনো আমার মনে হয় যে, সে রামেন্দ্র মজুমদারের চেয়েও শক্ত হিন্দুচেতা।

সুফিয়া কামালের মেয়ে কয়টা আমার মনে নেই। তবে সুফিয়া কামালের জামাই হিন্দু বংশের। সুফিয়া কামালের ছেলেরা হিন্দু মেয়ে বিয়ে করেছে।

হয়তো সবাই বিয়ে করেছে অথবা করেনি। কিন্তু কেউ তো বিয়ে করেছে সেই পরিবারে। হিন্দুদের একটা খিউরি আছে। কিভাবে পর্যায়ক্রমে মুসলমানদেরকে হিন্দু বানানো যায়। এই খিউরিটা তোমরা পাবে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এই বইটাতে। এই বইটা তোমাদের সংগ্রহ করা উচিত, পড়া উচিত। এই বইটার মধ্যে খুব চমৎকারভাবে বলা আছে মুসলমানদেরকে কিভাবে হিন্দু বানাতে হয় তাঁর চমৎকার আলোচনা এবং আমাদের দেশে কিভাবে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালানো হচ্ছে সেসব ব্যাপারে এই বইটাতে চমৎকার আলোচনা রয়েছে। আমি এইসব আলোচনার সুযোগ এখন পাবো না।

সে জন্যে একান্তভাবে তোমাদের বলি, কুরআন এবং হাদীসে সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিল্পকলার ব্যাপারে যে দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায় সেটা জানানো। আমি সে জন্যে হাদীসের দিকে চলে যাচ্ছি। আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন- তিনি মহানবী (সা.) কে বলতে শুনেছেন- যে বাণীর বিন্যাস হয়েছে কোনো রকম চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই, নাটকের মধ্যে বাণী আছে নাটকের বাণীকে বিন্যাস করতে হয় না? তো যে বাণীর বিন্যাস হয়েছে কোনো রকম ভাবনা চিন্তা ছাড়াই সেই বাণীই তাঁকে নিয়ে যাবে পূর্ব-পশ্চিমের ব্যবধানের চেয়ে বহুদূর নরক-গহ্বর। তাঁর মানে কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই যে কবিতা লেখা হয়েছে, যে নাটক লেখা হয়েছে কোনো চিন্তা ভাবনা ছাড়াই, কোনো গ্রন্থ উপন্যাস লেখা হয়েছে গল্প লেখা হয়েছে, ছবি আঁকা হয়েছে, কোন চিন্তা ভাবনা ছাড়া এ জন্যে রাসূল (সা.) বলেছেন, কোনো বাণী তাঁকে নিয়ে যাবে পূর্ব-পশ্চিমের ব্যবধানের চেয়েও আরো দূর। মানে পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে তাকালে যতোটা দূরত্ব তুমি দেখতে পাও তাঁর চেয়ে গভীর নরকে তোমাকে যেতে হবে। যদি তুমি কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তাঁর মানে এখানে আল্লাহ রাসূল (সা.) বলেছেন- কোনো কাজের চিন্তা ছাড়াই যদি তুমি কোনো সংলাপ রচনা করো, কোনো বাক্য রচনা করো, তাহলে তোমাকে এত গভীর নরকে নিক্ষেপ করা হবে যার দূরত্ব পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত ব্যাপ্ত।

দুই.

রাসূলে করীম (সা.) এর কাছ থেকে আবু হুরায়রা (রা.) শুনেছেন- কারও মর্জির তোয়াক্কা না করে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে কথা বললে আল্লাহ মানুষকে অপরিসীম মর্যাদা দান করেন। আর আল্লাহর অসন্তুষ্টির পরোয়া না করে মানুষের মনোরঞ্জননের জন্যে লেখা কোনো কথা তাঁকে পৌছে দেবে জাহান্নামের দ্বার পানে। সোজা কথায় আল্লাহ রাসূল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে, তাঁর মহক্বতে, রাসূল (সা.) এর মহক্বতে, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে যে গান

লেখে, যে কবিতা লেখে, যে ছবি আঁকে, যে নাটক করে, যে অভিনয় করে। শিল্প সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অঙ্গনের যা কিছু সে করুক না কেনো; তাঁর উদ্দেশ্য যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি হয় তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে দুনিয়া এবং আখেরাতে অনেক অনেক মর্যাদা দান করবেন। কবি ফররুখ আহমদকে, কবি শেখ সাদীকে আল্লাহ মর্যাদা দান করেননি? রুমীকে, নজরুল ইসলামকে আল্লাহ মর্যাদা দান করেননি? করেছেন। আর আমার মতো ক্ষুদ্র মানুষকে একেবারে চুনোপুটি আমি নিজে বুঝি আমি কতোটা জ্ঞানহীন। আমি না জানি লেখাপড়া, না জানি আমার আল্লাহর এবং তাঁর রাসূল (সা.) এর বাণী সম্পর্কে সবচেয়ে আসল কথাটি। তাঁর মানে আমি না কোরান এবং না হাদীসের বড় কোনো আলেম, না আমি সাংস্কৃতিক জগতের বড় কোনো কিছু, তারপরও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনেক সম্মানের মধ্যে রেখেছেন। কতো মানুষ আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে, হয়তো নাম শুনেছে। তারপরে যখন পরিচিত হয়েছে কতোজন আমাকে চুমু খেয়েছে, গান শুনে। আমি নিজে বুঝি এই হাদীসের তাৎপর্য।

আমার ক্লাস ফ্রেন্ডদের কেউ কেউ কলেজের প্রফেসর, কেউ কেউ হাইস্কুলের মাস্টার, কেউ কেউ মাদরাসার শিক্ষক তাঁরা যে যতোটুকু আল্লাহর দ্বীনের জন্য কাজ করেছে, তাঁরা ততোটুকু স্থানীয়ভাবে মর্যাদায় আছে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমি ইসলামী আন্দোলনের জন্যে সবকিছুকে বিসর্জন দিয়েছিলাম, আল্লাহ আমাকে তাঁর পুরস্কার দিয়েছেন। এই হাদীস আমাকে আরো আশ্বস্ত করেছে, এই হাদীস আমাকে আরো আনন্দিত করেছে। আবু হুরায়রা (রা.) রাসূল কারীম (সা.) এর কাছ থেকে শুনেছেন, “তোমরা আর কোনো হাদীস মনে রাখতে না পারলে এই একটি হাদীস যেনো মনে রাখো। নাটক লেখার সময় মনে রেখো, অভিনয় করার সময় মনে রেখো, মানুষের কোনো মর্জির তোয়াক্কা না করে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে রচিত কথামালা মানুষকে অপরিসীম মর্যাদা দান করে।” কথামালা নাটকে আছে না? কথামালা প্রবন্ধের মধ্যে আছে না? কথামালা সংবাদপত্রের মধ্যে, ক্লাসের বইয়ের মধ্যে আছে না? আছে। কথামালা যেখানেই আছে, যেকোনো কথামালা সেটা যেখানেই থাকুক না কেনো। কথামালা একজন উপস্থাপকের কণ্ঠে থাকে না? কথামালা খবর পাঠকের মুখে থাকে না? যেখানে কথা আছে সেখানেই কথামালা আছে। কত সুন্দর করে আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন- একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে রচিত কথামালা মানুষকে দান করে অপরিসীম মর্যাদা। এখানে রচনা করার কথা হয়েছে আসলে রচনা মানে শুধু লেখা নয়, রচনা মানে সাজিয়ে বলা। তাহলে যারা আল্লাহকে স্মরণ রেখে তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে কোনো কথামালা কাজে লাগায়, কোনো কথা রচনা করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে দুনিয়ায় অপরিসীম মর্যাদা দান করেন। আর যারা মানুষের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আল্লাহর অসন্তুষ্টির

পরোয়া না করে মানুষের মনোরঞ্জনের জন্যে কোনো লেখালেখি রচনা করে,
কোনো কথা সৃষ্টি করে আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামের ভেতরে ঢুকিয়ে দেবেন।
আল্লাহ তাদের জাহান্নামের দরজায় পৌঁছে দেবেন।

তিন.

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) রাসূল (সা.) এর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন- প্রভাতে
যখন কোনো মানুষ গাত্রস্থান করে তখন সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জিহ্বার কাছে
স্ব-কাতরে অনুজোর করে বলে এই যে, সকালে ঘুম থেকে উঠেছো, সকালে ঘুম
থেকে উঠার সঙ্গে সঙ্গে তোমার প্রত্যেকটি অঙ্গ তোমাকে ডেকে ডেকে অনুরোধ
করে বলে তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে বল কারণ তুমি যদি সোজা পথে
থাক তাহলে আমরাও সোজা পথে থাকবো। আর তুমি যদি বাঁকা পথে চল
তাহলে আমরা বাঁকা পথে চলবো, প্রত্যেকদিন সকালবেলায়।

অভিভাষণ- ৩

একবার আমার বাসার পায়খানা ভরে গেল। কোথাও কোন লোক পাচ্ছি না। আমি করলাম কি পলিথিন বাঁধলাম, পলিথিন বেধে হাত ঢুকাইয়া দিলাম। হাত ঢুকাইয়া দেখি যে, আসলে শয়তান হলো কাজের ভিত্তি, শয়তান হলো শয়তানের প্রভু, সে নানান জিনিসপত্র বাইরে না ফেলে ঐখানে ফেলেছে। ঐগুলো আমি উঠালাম। উঠায়ে পরিষ্কার করে ধুয়েটুয়ে বেরিয়েছি। পরে গিন্নিতো রাগারাগি করছে, তুমি লোক পাচ্ছ না ইত্যাদি। তো এক পর্যায়ে গিন্নি দেখলো সব পরিষ্কার সে তো বললো কি ব্যাপার! পরিষ্কার হলো কিভাবে? আমি বললাম যে, একটা লোক পেয়েছিলাম সেই লোকটা পরিষ্কার করে দিয়েছে। সে বলল লোকটা আসলো কোন পথে? যেই পথে লোকরা আসে সেই পথেই এসেছে। পরে আন্তে আন্তে বুঝলো। কাজটা তুমি করেছো? ছি কি বিচ্ছিন্নি ব্যাপার। অথচ এই কয়েকটা দিন সমস্ত বাড়িটা দুর্গন্ধময় ছিল, সেটা সহ্য করা গেল, আর আমি আধা ঘণ্টা ধুয়ে কষ্ট করে পরিষ্কার করলাম আর আমাকে সহ্য করা যাচ্ছে না। যারা পরিষ্কার করে তাঁরাও তো মানুষ। সে যদি এই কাজটা করতে পারে তাহলে আমি পারবো না কেন? ইসলামী আন্দোলন ইরানে সাকসেসফুল হয়েছে, কি কি কারণে আমি সামাজিকভাবে বুঝার চেষ্টা করছি। একদিন আমি একটা গল্পের বইয়ে পড়েছি। আয়াতুল্লাহা যেসব এলাকায় এরা থাকে সেসব এলাকায় আয়াতুল্লাহা এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা নিজেদের বাড়ি নিজেরা কষ্ট করে তৈরি করে থাকে। দেখা গেল যে, একজন আয়াতুল্লাহ যে এলাকায় বাড়ি করেছে। সে এলাকার মেথররা খুব ভোরে গিয়ে সেই এলাকায় নর্দমাগুলো আর ময়লা পায় না। মেথররা তো হতবাগ ব্যাপারটা কি? রাস্তাঘাট সব পরিষ্কার করা দরকার ততটা এলাকা কে যেন ভোরে পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে। পরে মেথররা ওঁত পেতে আবিষ্কার করলো যে, আয়াতুল্লাহ মানে ঐ এলাকার যিনি নেতা তিনি মেথরদের ওঁঠার আগে উঠে পরিষ্কার করেছে। মেথররা তো হতবাক! আমাদের এলাকার নেতা এই কর্মটা

করে। পরে মেথররা তাঁকে বলেছে যে, আপনি আমাদের লজ্জা দিচ্ছেন কেন? তো আয়াতুল্লাহ বলেছে যে, তোমরা আমাদের ভাই, তোমরা বছরের পর বছর এই কাজ করছো, এই দুনিয়ায় কেউ তোমাদের সাহায্য করে না।

তোমরা তো আমাদের ভাই, ভাইয়ের জন্য কি ভাইয়েরা সহযোগিতা করতে পারে না? তোমরা কখনো রেষ্ট পাওনা। তো এই কটা দিন তোমাদের রেষ্ট দিলাম, ইসলামী আন্দোলনের লোকেরা যদি এই পর্যায়ে যেতে পারতো, তাহলে এই দেশে ইসলামের দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হতো। ইসলামী বিপ্লব হতে দেরি হত না। আমাদের দেশে বাজার করতে যায় বড় বড় নেতারা। সাথে একটা বাচ্চা ছেলে থাকে, যত জিনিসপত্র আছে, সব জিনিসপত্র থলেটা ঐ বাচ্চা ছেলেটার হাতে তুলে বাড়িতে নিয়ে আসে। ঐ বাচ্চা ছেলেটার কি কষ্ট হয়! সেটা তাঁরা দেখে না। এই যে, বাজার থেকে থলেটা নিয়ে আসার কাজটা তুমি করাচ্ছে, এই কাজটা সুন্দরভাবে তুমি করতে পারতে। যদি তুমি রাসূল (সা.) এর নির্দেশ মানতে। রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা যাদেরকে দিয়ে কাজ করাও, যখন দেখবে যে, তাদের জন্যে অতিরিক্ত বোঝা হয়ে গেছে তখন তোমরা তাঁকে সাহায্য করবে। তাহলে এটা হয়ে গেল ইসলামী সংস্কৃতি। আর একজন সাধারণ মানবতাবাদী মানুষকে দেখবে যে, মানুষের প্রতি তার দরদ আছে, দেখবে যে, ঐ ছেলেটা কিছুদূর নিয়ে যাবে আবার সে নিজেও কিছু দূর নিয়ে যাবে। সেই ওমর (রা.) এর মতো, সফরে সিরিয়াতে তিনি গেলেন, যাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন সে ছিলো তাঁর চাকর। পথ পাড়ি দিতে, একবার ওমর (রা.) ঘোড়ায় পিঠে ওঠেন আর চাকর ঘোড়াটাকে টেনে নিয়ে যায়, আবার চাকর ঘোড়ার পিঠে ওঠে আর খলিফা ওমর (রা.) ঘোড়াটা টেনে নিয়ে যান। এই ভাবে ঘোড়ার পিঠে পর্যায়ক্রমে পথ অতিক্রম করেছেন। কিন্তু শেষবারে পরেছিলো চাকরের পালা। তিনি সিরিয়াতে যখন উঠলেন তখন তাঁরা মনে করলেন ঘোড়ার পিঠে যে আছে তিনি নেতা আর ঘোড়াটাকে যিনি টেনে নিচ্ছেন সেই চাকর। অর্থাৎ তাঁরা ওমর (রা.) কে চাকর মনে করলেন আর চাকরকে মনে করলেন ওমর (রা.)। ইসলামের যে সংজ্ঞা সেই সংজ্ঞার দৃশ্যগুলো হলো আলী (রা.) এর বেলায়। তিনি একবার বাজার থেকে খেজুর কিনেছেন। খেজুর কেনার দৃশ্য দেখেছেন কয়েকজন। তখন তিনি খলিফা। একজন খলিফা যখন তাঁর খেজুরের পোটলাটা ঘাড়ে উঠাচ্ছেন, তখন উনারা দৌড়ে এসেছেন, পোটলাটা আমাদেরকে দিন, আমরাতো আছি, আপনি আমাদের খলিফা, তো আলী (রা.) মিষ্টি করে হেসে দিলেন এবং বললেন- যেই ছেলেদের জন্যে আমি খেজুর কিনেছি, সেই ছেলেদের বাবা এই বোঝা বহন করার খুবই যোগ্য। কত সুন্দর বাক্য, যেই ছেলেদের জন্যে এই খেজুর কেনা হয়েছে, সেই ছেলেদের বাবা, এই ছেলেদের বোঝা বহন করার খুবই যোগ্য।

এই বলে নিজের কাঁধে খলিফা খেজুরের বোঝাটা নিয়ে বাড়ি চলে গেলেন। এই জন্যে, আসল সৈয়দ হলো এনারা। আমি আমার আলোচনায় কোন বিশাল বিশাল উদ্ধৃতি দেই নাই। যেন বুঝতে কষ্ট না হয়। তোমরা যদি একটা কথাই বুঝতে পেরে থাক, আমার যখন যে কাজটা করতে হবে, তখন সে কাজটা সবচেয়ে ভালো করে করার জন্য প্রতিযোগিতা করতে হবে। এই প্রতিযোগিতার নামই হলো ইসলামী সংস্কৃতি। ইসলামী পদ্ধতি অনুযায়ী কোন কাজ করা হলো ইসলামী সংস্কৃতি। কিন্তু সর্বোত্তম ইসলামী সংস্কৃতি হলো সবার চেয়ে সুন্দর করে যখন যে কাজ করি সেটা সবচেয়ে সুন্দর করে করার ও প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে যদি কর সেটা হবে সর্বোত্তম ইসলামী সংস্কৃতি। যেমন ধর তুমি বাসায় ভাত খাও, দেখবে যে তুমি তোমার আক্সা হয়তো তোমার আন্নার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার কারণে, তিনি তাঁর ভাতের পেটটা ধুইয়ে সুন্দর কায়দায় জায়গায় তিনি রেখে দেন।

কারণ তিনি জানেন যে, বেচারী সারাদিন পরিশ্রম করে। আর তুমি করলে খালের চতুর্দিকে কাটা হাড়ের অংশ, এটা সেটা চতুর্দিকে সুন্দর করে রেখেছো। আর খালের মধ্যে নানান ধরনের খাবারের অংশ ছড়ানো ছিটানো, পুরো খালাটাই একটা ডাস্টবিনের মত করে রাখলে। তুমি ফেলে দিয়ে চলে গেলে। কিন্তু তোমার এই খালাটা রেখে দেয়া একটা কাজ না? এটা যদি তুমি ধুয়ে মুছে জায়গা মতো রেখে যেতে তাহলে কি হতো? এই কাজটা সবচেয়ে সুন্দর হতো। এটা হতো ইসলামী সংস্কৃতি। খাবারের উদাহরণ দিচ্ছিলাম। এই খালাটা সুন্দর করে রাখা অপসংস্কৃতি রোধে সাংস্কৃতিক কর্মীদের কাজ। অপসংস্কৃতি তো বুঝ। অপ্রয়োজনীয় কাজ করাই অপসংস্কৃতি। অপ্রয়োজনীয় কাজকেই অপসংস্কৃতি বলে। অপ্রয়োজনীয় কাজ করার নিয়ম কি? অপ্রয়োজনীয় কাজ করার কায়দা কানুনকেই অপসংস্কৃতি বলে। সেখানে যত অপ্রয়োজনীয় কাজ তা আছে, এবং অপ্রয়োজনীয় কাজ করার পদ্ধতিও আছে।

এই অপ্রয়োজনীয় কাজের যে পরিণাম, সেই পরিণাম ভয়াবহ পরিণাম। সেই পরিণামটাকে নাটকের মাধ্যমেই সবচেয়ে সুন্দর করে তুলে ধরা যায়। তুমি যেকোন কাজকে নাটকের বিষয়বস্তু করতে পার। যেমন- আমারতো কৌতুক বানাতে ইচ্ছে করে। তো আমি একবার এক হোটেলে খেতে বসেছি। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে এবং তাঁর খাওয়াটা দেখার জন্য একটু দূরে গিয়ে বসেছি, সে খাচ্ছে। বিশ্বাস কর, তাঁর লোকমাটা অনেক বড় এবং সে এমনভাবে খাচ্ছে, মোড়ায়ে মোড়ায়ে ভিতরে ঢুকাচ্ছে। আমি ভাবলাম যে, দু'একটা লোকমা। না প্রত্যেকটা লোকমাই ঐ রকম করে ঢুকাচ্ছে। এখন তুমি এইটাকে কৌতুকের বিষয় করতে পারো। যেন এই খাওয়ার বিষয়টাকে তুমি কৌতুকের একটা বিষয়

বস্তু করো। সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর করে খেতেন ওমর (রা.)। ওমর (রা.) এর খাবার খাওয়া দেখে একজন সাহাবী বলেন যে, আমি জিন্দেগীতে ওমর (রা.) এর মত এত সুন্দর করে খাবার খেতে আমি আর কাউকে দেখিনি। এখন সেদিন করেছি কি। আমি ভাত খাচ্ছি, তো ওমর (রা.) এর খাবারের কথা মনে পড়ে গেল। তো আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাচ্ছি, বড় মেয়েটা দেখেছে। সে দেখছে আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাচ্ছি। ও হতবাক হয়ে গেছে, ও মনে করেছে যে, আবু পাগল হয়ে গেছে। তো আমি বড় মেয়েটাকে ডেকে বললাম যে, ওমর (রা.) এর খাবার ছিল সবচেয়ে সুন্দর। আমি দেখলাম যে, আমার খাবার খাওয়াটা সুন্দর কি না। আমি দেখলাম যে, আমার খাবার খাওয়াটা ছিল খারাপ। তো এটা কিভাবে সুন্দর করা যায়। তো আমি আয়নায় প্র্যাকটিস করা শুরু করলাম। কিভাবে খেতে হয়। ইউরোপে গিয়ে শিখে এসেছিলাম যে, ইউরোপে তাঁরা যখন খাবার খায় তখন তাঁরা খুব শব্দ করে খায়। তুমি খেতে বসেছো তুমি চুপ চুপ করে খাচ্ছ। ইউরোপিয়ানরা খাবারের সময় শব্দ করে খায় না। তো ওখান থেকে প্র্যাকটিস করেছিলাম যে কিভাবে খাবারের সময় শব্দ না হয়। দেখলাম যে, মুখবন্ধ করে খেলে শব্দ হয় না। তো আমরা প্র্যাকটিস করতে হচ্ছে। আর আমার বড় ভাই যখন খান তিনি কবি মানুষতো তিনি যখন আর্টিস্টিক পদ্ধতিতে ডাইলে টান দিয়েছেন। তখন দু'চার বাড়ি থেকে শুনা যায় যে কবি সাহেব ডাইলে টান দিয়েছেন, তো এখানে কৌতুকের বিষয় করতে পার কতজনে কতভাবে খান। এই কৌতুকটা দেখালে তারপর দেখালে যে, একজন রোগী কিভাবে খায়। তাঁকে স্যালাইন দিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে। খাওয়ার একটা কৌতুক হতে পারে না? ইসলামে কত সুন্দর করে খাওয়া-দাওয়া শেখায়।

রাসূল (সা.) এর ছিলো সবচেয়ে সুন্দর খাওয়ার অভ্যাস। তাহলে নাট্যকর্মীদের কাজ আছে না? নাট্যকর্মীদের কাজ অনেক বড় কাজ। নেতাদের যা কাজ তাঁর চেয়ে অনেক বেশি কাজ নাট্যকর্মীদের। এইভাবে সমাজের প্রত্যেকটি দুষ্ট খবরকে নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরা। দুষ্ট খবর কি বুঝতে পেরেছো? দুষ্ট খবর হচ্ছে প্রত্যেকটি অপ্রয়োজনীয় কাজ। প্রত্যেকটি অসংগতি তোমার নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরবে। নাটকের মাধ্যমে এমনভাবে তুলে ধরবে যেন, মানুষ মুহ্যমান শুদ্ধ হয়। যেমন- ইরানের ইসলামী সরকার গঠিত হওয়ার পর যে নাটকগুলো তাঁরা দেখাচ্ছে। দেখবে যে একটা বোবা ছেলে একটা বোবা মেয়ের উপরে নাটক। কিভাবে সে নাটকটা করেছে। সেখানে কোথা কোরআনের আয়াত ব্যবহার করেনি। হাদীসের কথাও ব্যবহার করেনি কিন্তু কেউ বলতে পারবে না যে, ইসলামী নাটক। আবার কেউ বলতে পারবে না যে এটা ইসলামী নাটক

নয়। নাট্যকারদের আমি বলে থাকি যে, তাঁরা সমাজ সংস্কারক, অভিনেতাদের আমি বলে থাকি তাঁরা সমাজ সংস্কারক। আজকে সকালে আমি চিন্তা করছিলাম, অভিনয়কারীদের কেন আমরা অভিনেতা বলি। আসলে যখন কোন অভিনেতা সত্যকে তুলে ধরার জন্যে কাজ করে তখন সেটা অভিনয়ে দেখাবে। কিভাবে নামাজ পড়তে হবে, কিভাবে নামাজ পড়া উচিত। এটা জিব্রাইল (আ.) রাসূলকে অভিনয় করে দেখিয়েছিলেন। তাহলে জিব্রাইলকে আমরা অভিনেতা বলবো, হ্যাঁ আমি তখন তাঁকে অভিনেতা বলবো। কিন্তু সে আসলে সত্যের জন্যে অভিনয়টা করেছে। মানবজাতির কল্যাণের জন্যে অভিনয় করেছে। মানবজাতির শ্রেষ্ঠ শিক্ষককে সে শিখিয়েছে। তাহলে জিব্রাইলকে যেমন আমি অভিনেতা আখ্যায়িত করি না, তেমনি আমি রাসূলকে অভিনেতা আখ্যায়িত করি না। তেমনি কোন অভিনেতাকে নকল কাজ হিসাবে আখ্যায়িত আমি করি না। যেমন- এভাবে আমি জিব্রাইল (আ.) এবং রাসূল (সা.) কেও অভিনেতা বলতে পারি।

অভিভাষণ- ৪

আমার সমস্ত অস্তিত্বে গানের সুর মিশে আছে। আমার শুধু ভয় করে ইসলাম গ্রহণের পর, আমি যদি আবার গানের জগতে চলে যাই, তাহলে হয়তো এই গানের মধ্য দিয়ে শয়তান ঢুকবে। শয়তান আমাকে আবার বন্দী করবে, আমি বললাম, আপনি কি শয়তানের ওসওয়াসার ব্যাপারে সতর্ক? শয়তান তো পজেটিভলি ওসওয়াসা দেয়, নেগেটিভলিও ওসওয়াসা দেয়। আপনি কি বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, শয়তান কি আপনাকে পজেটিভলি ওসওয়াসা দিচ্ছে, নাকি নেগেটিভলি ওসওয়াসা দিচ্ছে? এইভাবে তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছিলো। তাঁর পরের বছরই ফ্রান্স থেকে তাঁর এ্যালবাম বেরিয়েছে এবং তিনি প্রতিনিয়তই গান লিখে যাচ্ছেন এবং গানের সঙ্গে তিনি দ্বৈত মিউজিকের মিশ্রণ ঘটান। তিনি লিখছেন সুর করছেন, মিউজিকের মিশ্রণও ঘটান। সমস্ত দুনিয়ায় তাঁর গান ছড়িয়ে যাচ্ছে। কতো চমৎকার চমৎকার গান তিনি করে যাচ্ছেন। সুতরাং “উদয়ু ইলা সাবিলি রাব্বিকা বিল হিকমাতি ওয়াল মাউইজাতিল হাসানা” অর্থ- তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা। আমি ছাত্র জীবনে- তোমাদেরকে বলেছি, সেদিনও বলেছি এই কথাটা। বারবার বলি। ছাত্রজীবনে আমি ইসলামী আন্দোলনের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করেছি বিভিন্নভাবে- ১. গান গেয়ে, ২. কবিতা লিখে, ৩. ফুটবল খেলে, ৪. সাহিত্য সম্মেলন করে, ৫. খেলাধুলা করে ৬. সামাজিক কাজ করে। ভালো ফুটবল খেলতাম। বাম পায়ে খুব জোর ছিলো, বাম পা দিয়ে ফুটবল খেলতাম, খুব দৌড়াতে পারতাম। আমার সাথে কেউ দৌড়ে পারতো না। লেফট স্ট্রাইকার অভাব ছিলো। ঐ বল পেচাতে পেচাতে গোলের সামনে বল ফেলে দিতাম। কোনো দিন গোল দিতে পারিনি। গোল জীবনে মাত্র কয়েকটা দিয়েছিলাম।

অনুলিখন: মনিরুল ইসলাম

ସ୍ଥାପ

প্রসঙ্গ কথা

কবি মতিউর রহমান মল্লিক ছিলেন মানুষ পাগল মানুষ। কেউ একবার তার সাথে মিশলেই সহসা তার সাথে জমে উঠত বন্ধুতা। আর সে কারণেই অনেকের কাছে তিনি অনেক প্রিয়। তাই অনেকে তার সান্নিধ্য পাওয়া, কাছাকাছি হওয়ার চেষ্টা করতেন। কেউ কেউ মনে করতেন তাদের প্রকাশিতব্য বইয়ের ফ্ল্যাপে প্রিয় কবির মুখবন্ধ থাকলে মন্দ হয় না। বরং সেটা কারো কারো সৌভাগ্যও বটে। কবি মল্লিক অনেক লেখক-সাহিত্যিকের বইয়ের ফ্ল্যাপ লিখেছেন। কিন্তু তিনি এর কোন কিছুই সংরক্ষণ করতেন না। আমরা ৪টি ফ্ল্যাপ সংগ্রহ করতে সক্ষম হই। যা এখানে সন্নিবেশ করা হলো।

কবি সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেনের কাব্যময় ক্যানভাস

কবি-গীতিকার-গবেষক সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেন আমাদের সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনের এক সুরভিসার ব্যক্তিত্ব, এক স্বভাবসুলভ প্রতিভার প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

তঁার কবিতায় আছে মুক্ততায় ভরপুর সবুজাভ পৃথিবীর মায়াময়তা, তঁার গানে গানে ছড়িয়ে আছে গাঁয়ের গন্ধ, মাটির মমতা এবং মানুষের বহুবিধ উচ্চারণ— যা এক সময় দেশপ্রেম, যা এক সময় পরমার্থের বিস্ময়, যা কখনোবা মানব-মানবীর হাসি-কান্নার কাব্যময় ক্যানভাস। বস্তুত তঁার গবেষণায় আছে সত্য ও সুন্দরের উন্মোচিত সমন্বয়।

এবং ঐ-সব কারণে কবি ওমর ফারুক হোসেনরা মরেন না, স্পর্শ করে যান অমরতার সুউচ্চ মিনার।

তঁার অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের অনন্য স্বাদের সঙ্গে, গন্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলো ছেঁড়া কণ্ঠের পাখী। সে-স্বাদ অপূর্ব, সে-গন্ধ অভূতপূর্ব।

কবি কামাল হোসেন খান একজন নিবেদিতপ্রাণ কবি

কবি কামাল হোসেন খান একজন নিবেদিতপ্রাণ কবি। তাঁর কবিতার পরতে পরতে আছে আবেগের সহজ-প্রাণবন্ত বহিঃপ্রকাশ। তাঁর কবিতা পাঠ করলে আমরাও আবেগে আপ্ত হই। যেমন:

ভালোবাসি মানুষের সেই মনুষ্যত্ব

... ..

ভালোবাসি মানুষের নৈতিক শক্তি

ভালোবাসি মানুষের পরপারে মুক্তি

[মনুষ্যত্ব-ব্যাখ্যার কাব্য]

কবি কামাল হোসেন খান ঈমানদার কবি। তাঁর কবিতার বৃহৎ অংশজুড়ে আছে ইসলাম। যেমন:

হে দয়াময় সকল সময় তোমারই করি প্রার্থনা

ঐতো পাপ তাপ করে দাও সাফ

[প্রার্থনা-ব্যাখ্যার কাব্য]

অথবা-

ইসলামী আন্দোলন গড়ে তোলো সবে ভাই

সালমান রুশদীর আদালতে ফাঁসি চাই

[ইসলামী আন্দোলন-ব্যাখ্যার দান]

কবি কামাল হোসেন খানের কবিতায় আমরা আরো পাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রতি অনুরাগ, সমসাময়িক সমাজের সমস্যার অন্তর্জালা।

বস্তুত একজন কবি কামাল হোসেনের কবিতা সুখ-পাঠ্য। তাঁর কবিতার বহুল প্রচার কামনা করি।

ছড়াকার আমিনুল ইসলাম প্রসঙ্গে

৭০ দশকের দিকে সম্মানিত কবি ও গীতিকার আমিনুল ইসলামের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। তাঁর বিনয় এবং আবেগ আমাকে মুগ্ধ করে। পরে আরো আকৃষ্ট হই তাঁর গানের পারঙ্গমতায়, কবিতার সারল্যে।

গীতিকার আমিনুল ইসলাম এবং মানুষ আমিনুল ইসলামের মধ্যে পারতপক্ষে কোনো বৈপরীত্য নেই। তাঁর যা বিশ্বাস, তা-ই উঠে আসে তাঁর লেখায়। সুতরাং তাঁর একটি অঙ্গীকার আছে, যে-অঙ্গীকার অনেক লোকেরই নেই এবং সে অঙ্গীকার হচ্ছে- দেশের সঙ্গে অর্থাৎ একটি জাতির সঙ্গে। বস্তুত এই অঙ্গীকার যাঁদের আছে, তাঁরা এক সময়- না- এক সময় গৃহীত হয়, জননন্দিত হয়। সন্দেহ নেই, কবি-গীতিকার আমিনুল ইসলাম তাঁদেরই অন্যতম।

কবি আমিনুল ইসলামের একটি সুখদ পরিচয় আছে। কথাশিল্পী সাবিনা মল্লিক, কবি শাকিল রিয়াজ এবং নাট্যকার নাজিম আল ইসলাম মাহিনের তিনি বড় ভাই। তাছাড়া সুমাইয়া নাফিস তাঁর সহধর্মিণী। উপর্যুক্ত লেখক- লেখিকাদের অনেকের বই-ই ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। গীতিকার আমিনুল ইসলামের বইও অনেক আগে প্রকাশিত হবার কথা ছিলো। কিন্তু তা হয়নি- যে- কোনো কারণেই হোক।

‘ছড়ায় ছন্দে শিখি’ বইটির সবগুলো লেখা আমি মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। লেখাগুলোয় আছে ছন্দ, আছে আনন্দ; আছে সুর, আছে আবেগ-ঘন-মধুর। ছোটদেরও ভালো লাগবে, বড়দেরও ভালো লাগবে।

একজন খাঁটি গল্পকারের পক্ষেই অবিরলতাকে স্পর্শ করা সম্ভব

একটি মুহূর্তকে অবিনশ্বরতায় উন্মুখ করাই হলো গল্পের কাজ। এ-কাজ সবাই পারে না, সবার দ্বারা হয়ও না। অথচ ক্রমাগত প্রয়াসের মধ্য দিয়ে ফারজানা মাহবুবা সেই অসাধ্য সাধনের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে।

মানুষের দৃষ্টি-সীমার ভেতরেই ছড়িয়ে রয়েছে গল্পের বিষয়বস্তু। এ-দৃষ্টি যতোই বিস্তারিত হয়, ততোই অবিরল হতে থাকে গল্পের বিষয়বস্তু। একজন খাঁটি গল্পকারের পক্ষেই কেবল এ-অবিরলতাকে স্পর্শ করা সম্ভব। ফারজানা মাহবুবীর গল্প পড়লে মনে হয়— ফারজানাও একজন খাঁটি গল্পকারের মুন্সীয়ানায় পরিপক্ব হয়ে উঠছে।

ফারজানার অবিচল আদর্শ আছে, অনিন্দ্য অঙ্গীকার আছে, সুরেলা ও সুসজ্জিত আবেগ এবং আবেগ প্রকাশের আনন্দিত ভাষা আছে।

আমি ফারজানা মাহবুবীর অশেষ সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত হবার আকুল প্রার্থনা করি।

ଅଛାଞ୍ଚନା

প্রসঙ্গ কথা

গ্রন্থালোচনা। মানে হলো চুলচেরা বিশ্লেষণ। একজন লেখক কিংবা কবির প্রকৃত সত্তার স্বরূপ উন্মোচন করা। বলতে পারেন- তাঁর লেখালেখির মূল্যায়ন। অবশ্য কেউ কেউ গ্রন্থালোচনা করতে গিয়ে লেখক সত্তাকে অস্বীকার করার প্রবণতা দেখা যায়। কবি মতিউর রহমান মল্লিক অনেকটাই এর বিপরীত চরিত্রের মানুষ। তিনি বরং প্রকৃত লেখককে মূল্যায়নের আকুলতা ও ব্যাকুলতায় ব্যস্ত ছিলেন। আবদুল মান্নান সৈয়দের ‘ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য’ এবং কবি আবদুল হাই শিকদারের ‘এই বধ্যভূমি একদিন স্বদেশ ছিলো’ বই দুটির আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণপূর্বক তাঁদের সৃষ্টিকর্ম পাঠকের সামনে যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন।

সূচিপত্র

আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁর 'ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য' / ৩৩২
একজন তুমুল কবি এবং এই বধ্যভূমি একদিন স্বদেশ ছিলো কাব্যেছ/ ৩৪০

আবদুল মান্নান সৈয়দ

তাঁর ‘ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য’

ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য ।। আবদুল মান্নান সৈয়দ ।। বাংলা একাডেমি ।। প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী ।। প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৯৩ ।। মূল্য : একশত পঁচাত্তর টাকা ।। উৎসর্গ : সৈয়দা সালমা হোসেন, সৈয়দ এ. মঈদ, সৈয়দ এ. মোমিন, সৈয়দা নাগিস আলী, সৈয়দা শিরিন কবির সৈয়দ এ. মাবুদ, সৈয়দ এ. মাসুদ, সৈয়দা শাহীন মাহমুদ, সৈয়দ আহমদ মাসুদ ।

একদা- আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পর্কে- জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেছিলেন:

‘আবদুল মান্নান সৈয়দ বাংলাদেশের সাহিত্যের অঙ্গনে এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতি সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে তাঁর অবদান রয়েছে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে তিনি তাঁর বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন।’

আসলেই আবদুল মান্নান সৈয়দ বাংলাদেশের সাহিত্যের অঙ্গনের এক বিস্ময়কর প্রতিভা। বাংলাসাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই কাজ করেছেন তিনি এবং সফলভাবে। ঐতিহ্যবাদী এই কবি-গবেষক এখনও অবিরাম অসম্ভব শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন ভাষা ও সাহিত্যের জন্য। ইতোমধ্যে তাঁর অবস্থানকে তিনি এতোটা মজবুত করেছেন যে, বাংলাভাষার অন্যতম প্রধান কবি আল মাহমুদ বলেই ফেলেছেন:

‘আমাদের কাছে আবদুল মান্নান সৈয়দ আমাদের কালের সবচেয়ে অগ্রসর সাহিত্য-চিন্তার মানুষ। এ ধরনের মৌলিক গদ্যশিল্পীর আবির্ভাবে আমাদের কথাশিল্প সহসা এগিয়ে গেলো।’

এই অগ্রসর চিন্তার মানুষটি সাহিত্যের প্রত্যেকটি কর্ম সম্পাদন করেন পরম যত্নের সঙ্গে; অনগ্রহে যেখানে একেবারে ঠাই পায় না। নিষ্ঠা এবং নিবেদন আবদুল মান্নান সৈয়দের স্বভাবজাত। ফলে তাঁর অবদানকে অগ্রাহ্য করতে পারে কেবল একজন অগভীর মানুষই।

এ পর্যন্ত আবদুল মান্নান সৈয়দের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে পঁচাত্তরটির মতো। পঁচাত্তরটির মধ্যে সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা পঁচিশের কম নয়। সম্পাদিত গ্রন্থগুলির মধ্যে নজরুল রচনাবলী [প্রথম-চতুর্থ খণ্ড, যৌথভাবে], মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী-রচনাবলী, জীবনানন্দ, ফররুখ-রচনাবলী [১ম খণ্ড, যৌথভাবে], ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা উল্লেখযোগ্য।

ফররুখ সম্পর্কিত তাঁরই সম্পাদিত-গ্রন্থ চারটি এবং মৌলিক গ্রন্থ দু'টি। এই ছ'টি গ্রন্থই প্রমাণ করে, আবদুল মান্নান সৈয়দ, এক ফররুখের জন্যে কতোটা মেধা, মনন এবং আগ্রহ অকাতরে নিবেদন করেছেন। যথার্থ দায়িত্ববোধই তাঁকে এ-পথে এগিয়ে দিয়েছে। এই দায়িত্ববোধ দৃষ্টান্তহীন।

কেনো তিনি ফররুখ চর্চায় অগ্রসর হলেন? তার একটি মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা আমরা পাই আলোচ্য গ্রন্থ 'ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য'-এর প্রবেশকে এবং বিস্তারিত। দুটি বাক্যই মাত্র তুলে ধরছি এখানে :

‘খানিকটা আকস্মিকভাবে যুক্ত হয়ে গিয়ে, গত প্রায় দুই দশক ফররুখ-চর্চা করে চলেছি। প্রথম কৈশোরে যে-কবির ‘সাত সাগরের মাঝি’র কবিতার পর কবিতা আমাকে মুগ্ধ-স্নাত করেছিলো- ভাবতে ভালো লাগে- পরিণত বয়সের অনেক বছর উদ্যাপন করেছি তাঁকে নিয়েই। আজ মনে করি, সবারই উপরে আমার আব্বা সৈয়দ এ. এম. বদরুদ্দোজার [১৯১০-৮৯] দোয়া ও প্রেরণাই আমাকে ফররুখ চর্চায় এতোখানি উদ্বুদ্ধ-নিযুক্ত রেখেছে।’

ভাবতে অবাক লাগে, ফররুখের ওপর কাজ শুরু করেছিলেন এক দক্ষ সাহিত্যসমালোচক, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার প্রখ্যাত শিক্ষক [জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়] সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়। সেই যে কাজ, সেই কাজকে এখন একটি ঈর্ষনীয় পর্যায়ে নিয়ে এলেন আবদুল মান্নান সৈয়দ- এক চৌকস গবেষক-সমালোচক তিনিও, তিনিও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামখ্যাত শিক্ষক।

ফররুখের ওপর কাজ কম হয়নি। এ-সব কাজের মধ্যে একটি অসাধারণ কাজ করেছেন খ্যাতিমান সাহিত্য-গবেষক শাহাবুদ্দীন আহমদ। শাহাবুদ্দীন আহমদ সম্পাদনা করেছেন ‘ফররুখ আহমদ: ব্যক্তি ও কবি’। ৬৭২ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলো ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। ফররুখ আহমদ: ব্যক্তি ও কবি-কে বিচারের ক্ষেত্রে- সন্দেহ নেই- গ্রন্থটি একটি অমূল্য সংযোজন।

কিন্তু একটি মৌলিক গবেষণা হিসেবে ‘ফররুখ আহমদ: জীবন ও সাহিত্য’ অবশ্যই অবিসংবাদী এবং নতুন মাত্রার। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশীদ গ্রন্থটির প্রসঙ্গ-কথায় যথার্থই বলেছেন :

‘ফররুখ আহমদের জীবন ও সাহিত্যকর্মের বহু মূল্যবান তথ্য লেখক সংযোজন করেছেন অনুসন্ধিসূ গবেষকের নিষ্ঠা নিয়ে। ফররুখ আহমদের সাহিত্যকর্মের বিশ্লেষণেও তিনি নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। এই গ্রন্থ রচনার জন্য আবদুল মান্নান সৈয়দকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।’

বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটলে ফররুখ আহমদ ‘অধীকৃতির শিকারে পরিণত’ হন। চাকরিচ্যুত হন। চরম অবহেলা এবং দারিদ্র তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। কিন্তু তাঁর আপসহীনতা, দৃঢ়চিন্তা কেবল অমরতা অর্জন করে না বরং সন্ধি ফিরিয়ে দেয় তাঁর দুশমনদেরও। কল্যাণকামীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে নতুন উদ্যমে। আবদুল মান্নান সৈয়দের সে সময়ের ‘বিশ্রামহীন পরিশ্রম’ ইতিহাস হয়ে আছে ‘ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা’ সম্পাদনার ভেতর দিয়ে।

ঐ নন্দিত হাতেই সম্ভবত আর একটি ইতিহাস উঠে এলো। উঠে এলো ‘ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য’। কিন্তু ‘ইতিহাসটি— এই গবেষণা-গ্রন্থটির— যথার্থতা উন্মোচিত হবে তখনই, যখনই এটি পঠিত হবে। আমরা আশা করছি, ‘ফররুখ আহমদ: জীবন ও সাহিত্য’ খুব দ্রুতই পাঠকের মূল্যবান সঞ্চয়ের সীমানায় পৌঁছে যাবে।

আবদুল মান্নান সৈয়দের ‘ফররুখ আহমদ: জীবন ও সাহিত্য’র সূচিপত্রের দিকে একবার তাকানো যেতে পারে। তাকাতে হবে চট্জলদি গ্রন্থটির ওজন এবং মূল্যমান অনুধাবনের জন্যে।

৩৬৮ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটিকে সাজানো হয়েছে ৪টি অধ্যায়ে।

প্রথম অধ্যায়- ‘জীবন’-এ রয়েছে ৮টি বিষয়:

১. জন্ম ও বংশপরিচয় ২. শিক্ষাজীবন ৩. সংসার জীবন ৪. কর্মজীবন ৫. সাহিত্য জীবন ৬. সাময়িকপত্র সম্পাদনা ৭. চরিত্র বৈশিষ্ট্য ৮. শেষ জীবন, মৃত্যু, মৃত্যোত্তর প্রতিক্রিয়া।

দ্বিতীয় অধ্যায়- ‘সাহিত্য’-এ রয়েছে ১৫টি বিষয় :

১. সমকালীন পরিপ্রেক্ষিত ২. প্রথম প্রকাশিত কবিতা ৩. “সাত সাগরের মাঝি” ৪. মঞ্চস্তরের কবি ৫. রবীন্দ্রোত্তর কাব্যনাট্য ও “নৌফেল ও হাতেম” ৬. একটি কাব্যনাট্য : দুই লেখন ৭. ‘দরিয়ার শেষ রাত্রি’ ৮. ‘বন্দরে সন্ধ্যা’ ৯. “হাতেম তায়ী” ১০. বিভৎস নগরী ১১. শব্দ ১২. চিত্রকল্প ১৩. সনেট ১৪. ছোটগল্প ১৫. জীবনদর্শন ও সাহিত্য বৈশিষ্ট্য।

তৃতীয় অধ্যায়- ‘পরিশেষ’- এ রয়েছে ৮টি বিষয় :

১. জীবনপঞ্জি ২. গ্রন্থপঞ্জি ৩. সংকলনভুক্ত রচনাপঞ্জি ৪. সাময়িকপত্রে প্রকাশিত
৫. সমকালীন প্রতিক্রিয়া ৬. সাক্ষাৎকার : ফররুখ আহমদ ৭. পাণ্ডুলিপি ৮.
পত্রাবলী ।

চতুর্থ অধ্যায়- ‘তথ্য ও নির্দেশিকা’-য় ২টি বিষয় :

১. প্রাসঙ্গিক তথ্যপঞ্জি ২. নির্দেশিকা

গ্রন্থের প্রথমদিকের ‘প্রবেশক’-এও রয়েছে ৩টি বিষয় :

১. ইতিবৃত্ত ২. প্রস্তুতি প্রসঙ্গ ৩. কৃতজ্ঞতা

আঙ্গুরের যেমন খোসা খসানো ঠিক নয়, কুলে ‘ফররুখ আহমদ : জীবন ও
সাহিত্য’-এর অবস্থাও তেমনি । গ্রন্থটির সবটাই মজাদার, সবকিছুই মজাদার ।
নানাবিধ তথ্য ও আলোচনার রসে এতোটা স্বাদু যে, একবার আশ্বাদন শুরু করলে
সমস্ত অরুচিই বুদ্ধবুদ্ধের জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হয় ।

ফররুখকে যে ভালোবাসে, ফররুখের সাহিত্য সম্পর্কে যে সম্যক ধারণা নিতে
চায়, ফররুখের কাব্য-ভাবনাকে যে আবিষ্কার করতে চায়, ফররুখকে নিয়ে যে
গবেষণা করতে চায়- তার জন্যে সত্যিই ‘ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য’
এক দরকারী কিতাব; এর প্রতিটি অধ্যায়ের প্রতিটি বিষয়ই এক-একটি পূর্ণাঙ্গ
প্রবন্ধ । সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ বলা যাবে মাত্র কয়েকটিকে । বাদবাকী প্রবন্ধগুলি বিরাট
এবং সুসমৃদ্ধ । কিছু প্রবন্ধতো বিশাল শস্যক্ষেত্রের মতো । পত্র-পল্লব-পুষ্প-
ফসলে ভরপুর ।

আবদুল মান্নান সৈয়দ শিকড় থেকে শিখর অবধি আলোচনা করতে গিয়ে ঐভাবেই
সুজলা-সুফলা করেছেন গবেষণার গোটা ভূখণ্ড ।

কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ইশারাদর্শী আলোকপাত করা যায় :

‘১৮.১১.৪৪ তারিখে উত্তরকালের বিখ্যাত কথাশিল্পী শাহেদ আলী ফররুখ
আহমদের একটি চিঠির জবাব দিতে গিয়ে লেখেন: ঘটনাক্রমে বর্তমান মুসলিম
বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে সুখী হলাম ।

—এসব থেকেই ফররুখ আহমদের বিভাগপূর্বকালেই খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা আন্দাজ
করা যায় ।’

[জীবন ।। সাহিত্যজীবন ।।]

১. ফররুখ আহমদের জীবন অধ্যায়টি অসংখ্য তথ্যে ঠাসা । যা একজন সাধারণ
পাঠককেও আকৃষ্ট করে । ড. আশরাফ সিদ্দিকীর একটি সাক্ষাৎকারের
উদ্ধৃতি এসেছে এ-ভাবে:

‘১৯৪৬-এ ইসলামিয়া কলেজের এক সম্মেলনে তিনি ‘সাত সাগরের মাঝি’ কবিতাটি পড়েন। সভায় এমন একটি ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়, যা কোনোদিন ভুলতে পারবো না। প্রধান কবি কায়কোবাদ তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেন, সম্ভবত ইবরাহীম খাঁও।’

২. আবদুল মান্নান সৈয়দ ফররুখ আহমদের পরিকল্পিত গ্রন্থগুলোর একটি সুবিন্যস্ত তালিকা দিয়েছেন। ফররুখ আহমদ সম্পর্কে যারা মোটামুটি ওয়াকিফহাল, তারা তালিকাটি সামনে রাখলে, কবির এখনও কোন্ কোন্ পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয়নি, সহজেই ধরতে পারবেন:

কবিতা: ১. হে বন্য স্বপ্নেরা, ২. ইকবালের নির্বাচিত কবিতা, ৩. কাফেলা, ৪. হাবেন্দা মরুর কাহিনী, ৫. দিলরুবা, ৬. কুরআন-মজুয়া, ৭. নির্বাচিত কবিতা।

নাটক: ১. রাজ-রাজড়া [গদ্য ব্যঙ্গনাটিকা]

ব্যঙ্গকবিতা: ১. বিসর্গ, ২. ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক কাব্য, ৩. হালকা লেখা, ৪. তসবির নামা, ৫. রসরঙ্গ।

গান: ১. রক্ত-গোলাব, ২. মাহফিল [হামদ-নাত], ৩. কাব্য-গীতি

শিশু-কিশোরতোষ: ১. চিড়িয়াখানা, ২. ফুলের জলসা, ৩. কিসসা-কাহিনী, ৪. সাত সকালের কিসসা, ৫. ছড়ার আসর (২), ৬. ছড়ার আসর (৩), ৭. আলোকলতা, ৮. খুশির ছড়া, ৯. মজার ছড়া, ১০. পাখির ছড়া, ১১. রং মশাল, ১২. জোড় হরফের খেলা, ১৩. পড়ার গুরু, ১৪. পোকামাকড়।

এর বাইরেও তাঁর অনেক কবিতা, গান, গদ্যরচনা ইত্যাদি রয়েছে।

৩. ফররুখ আহমদের ‘হাতেম তা’য়ী’কে কেউ কেউ মহাকাব্য বলেছেন, আবার কেউ কেউ বলেননি। এই নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিনের। আবদুল মান্নান সৈয়দ হাতেম তা’য়ী নিয়ে যে আলোচনা করেছেন, আমরা যারা হাতেম তা’য়ীকে মহাকাব্য হিসেবে কবুল করেছি, তাদের জন্যে সুখবর আছে। ঐ বিশদ আলোচনার এক ফাঁকে আবদুল মান্নান সৈয়দ স্পষ্ট বলে দিয়েছেন :

‘আমাদের বিবেচনায়, আজিকে এবং অন্তরাত্মায় ফররুখ আহমদের “হাতেম তা’য়ী” মহাকাব্য। আমাদের যুক্তি: এক সাহিত্যের কোনো আজিকই একেবারে অপরিবর্তনীয় থাকে না। কবিতা বা ছোটগল্পের টেকনিক কি ঊনবিংশ শতাব্দীতে যা ছিলো, আজো তা-ই আছে? তবু কিছু-কিছু মহাকাব্যিক টেকনিক তো ফররুখ ব্যবহার করেছেনই। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান দেখিয়েছেন, ‘ফররুখ আহমদের “হাতেম তা’য়ী” “মেঘনাদবধ কাব্য” এর মতো অষ্টাধিক সর্গে রচিত (‘সর্গ’ এই নামটি অবশ্য ব্যবহৃত হয়নি)।’ এবং ‘পাতাল ও মর্তে এর কাহিনী

প্রসূত।’ “হাতেম তা’য়ী”র মহাকাব্যোচিত উপমা প্রয়োগের কথা আমরা আগে বলেছি। ছন্দোবৈচিত্র্য সত্ত্বেও এ কাব্যের কেন্দ্রীয় ছন্দ ১৮-মাত্রার অমিল ও সমিল অক্ষরবৃত্ত-একই ছন্দ হয়তো আজকের পাঠকের কাছে ক্লাস্তিকর মনে হ’তো। (দুই) ট্রাজেডি বা অলঙ্ঘ্য নিয়তির প্রভাব নেই বটে, কিন্তু হাতেমের চরিত্রে যে-অভিযাত্রিকতা আছে, তা-ই তাকে দান করেছে চরিত্রের সমুন্নতি। (তিন) ব্যাপ্তি, বৈচিত্র্য ও গভীরতায় এ কাব্যে মহাকাব্যিক অতৃপ্তি রয়েছে। (চার) মহাকাব্যের যুগ শেষ হয়ে গেলেই তো বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য-“মেঘনাদবধ কাব্য”- রচিত হয়। আধুনিক যুগে প্রায়-অব্যবহৃত এই প্রকরণটি ফররুখ আর একবার ব্যবহার করলেন- যেমন করেছেন গ্রীক কবি নিকোস কাজানজাকিস এই বিংশ শতাব্দীতেই।’

ফররুখ আহমদকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে, তাঁর সাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আবদুল মান্নান সৈয়দ ‘ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য’ গ্রন্থের মাধ্যমে এক বিস্ময়কর অবদান রাখলেন। [সেই বিস্ময়কর কাজের আরো উদ্ধৃতি দিতে গেলে বক্ষ্যমাণ রচনাটির কলেবর বেড়ে যাবে বিধায় সংযত হতে হলো।]

ফররুখ আহমদ এক অসাধারণ প্রতিভার নাম। তাঁর কাব্য প্রক্রিয়ায় ছিলো ‘একটি বিশ্বাসের উন্মুক্ততা’। প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান একটি মন্তব্য করেছেন:

‘আমি ফররুখের কাব্যে যেমন আমার বিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি পেয়েছি, তেমন পেয়েছি আমার বুদ্ধিবৃত্তির প্রেক্ষাপট এবং অনুচ্চারিত সকল ইচ্ছার উন্মোচন।’

প্রত্যয়দীপ্ত মহান কবি ফররুখের যথার্থ বিশ্লেষণের জন্যে দরকার ছিলো একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের। দরকার ছিলো একটি সঙ্গত ক্ষেত্রেরও। আবদুল মান্নান সৈয়দ সেই প্রতিষ্ঠানের নাম। বাংলা একাডেমি সেই ক্ষেত্রের নাম। একটি প্রশ্নাতীত্ব সময়ে ‘ফররুখ আহমদ: জীবন ও সাহিত্য’-এর প্রকাশ ঐ কথাগুলিই বারবার মনে করিয়ে দেয়। মনে করিয়ে দেয়-একজন মহৎ কবি দীর্ঘকাল ধরে অনুচ্চারিত থাকতে পারেন না, একজন মহৎ সমালোচক সময়মত অবশ্যই তাঁকে হারানো স্বপ্নের মতো চিনে ফেলেন এবং নিশ্চিতভাবেই। শুধু যে চিনে ফেলেন তা নয়, এই চিনে ফেলার খবরটিও পৌঁছে দেবার সম্পন্ন অবলম্বন পেয়ে যান।

আবদুল মান্নান সৈয়দের প্রত্যেকটি কাজের মধ্যেই থাকে স্বাতন্ত্র্য। সেই স্বাতন্ত্র্য প্রোজ্জ্বলতর হয়েছে এই ‘ফররুখ আহমদ: জীবন ও সাহিত্য’ গ্রন্থে। গবেষণার ভারই শুধু নয়, মননের খোঁরাকই শুধু নয়, তথ্যের প্রাচুর্যই শুধু নয়- দুর্লভ এবং দৃষ্টিনন্দন অনেক কিছু তিনি এ-গ্রন্থের সাথে যুক্ত করেছেন। যুক্ত করেছেন, ‘ফররুখ আহমদের আটটি ছবি; তাঁর স্ত্রীর একটি ছবি; কবি আহসান হাবীব, কবি আবুল হোসেন, কবি বেগম সুফিয়া কামাল, কবি শামসুর রাহমান ও কবি আবদুল

কাদিরের সাথে তাঁর একটি সম্মিলিত ছবি; তাঁর আঙ্গার একটি ক্ষেচ; তাঁর গ্রন্থ-সাত সাগরের মাঝি, মুহূর্তের কবিতা, নৌফেল ও হাতেম, হে বন্য স্বপ্নেরা, নয়া জামাত ও চিড়িয়াখানার প্রথম প্রচ্ছদের ছবি; তাঁর প্রাপ্ত পুরস্কার- স্বাধীনতা, বাংলা একাডেমি, আদমজী সাহিত্য ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কারের সম্মানপত্রের অনুলিপি; তাঁর শ্বশুরের চিঠি, ড. আশরাফ সিদ্দিকীকে লেখা পত্র, প্রথম ও শেষ প্রকাশিত কবিতার হস্তাক্ষরের অনুলিপি, অনুবাদ কবিতার অনুলিপি; যুক্ত করেছেন কোলকাতা বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের একটি ক্ষেচ। যে-স্কুলে, বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র-পরিচালক সত্যজিৎ রায় এবং ফররুখ আহমদ একই স্নেহ, একই শ্রেণিতে পড়াশোনা করেছেন। ফররুখ আহমদের নিজের হাতে লেখা কিছু দুর্লভ কবিতার অনুলিপি ও গ্রন্থভুক্ত করেছেন আবদুল মান্নান সৈয়দ। যে-শুলোর মধ্যে কবির শেষ কবিতার অনুলিপি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আবদুল মান্নান সৈয়দ ফররুখ আহমদের প্রকাশিত ১৮টি গ্রন্থের একটি পঞ্জি দিয়েছেন। এই পঞ্জিগুলো পড়তেও মজা লাগে। জানা যায়- কোন্ বই কে প্রকাশ করেছিলেন, কে প্রচ্ছদ ঐঁকেছিলেন, কোন্ গ্রন্থের কত দাম ছিলো। ‘সাত সাগরের মাঝি’র কথা ধরা যাক; প্রকাশ করেছিলেন কবি বেনজীর আহমদ, প্রচ্ছদ ঐঁকেছিলেন শিল্পী জয়নুল আবেদীন, কোলকাতা থেকে প্রকাশিত- ১৯৪৪ সালে- এই কবিতাগ্রন্থের দাম ছিলো মাত্র দুই টাকা।

পত্রসাহিত্যের রয়েছে সীমাহীন গুরুত্ব। একজন লেখককে চিনবার জন্যে পত্রগুলো কখনো কখনো দিকনির্দেশিকার কাজ করে। ফররুখ আহমদের ২০টির মতো চিঠি ‘ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য’-কে সমৃদ্ধ করেছে। এইসব চিঠি ব্যক্তি ফররুখ এবং কবি ফররুখকে আবিষ্কারের ক্ষেত্রে সত্যিই তাৎপর্যময়। ফররুখ আহমদের শব্দ, চিত্রকল্প, সনেট, ছোটগল্প, জীবনদর্শন ও সাহিত্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন আবদুল মান্নান সৈয়দ। এই সব আলোচনায় ফররুখ আহমদকে নতুন করে চেনা যায়, একজন প্রকৃত কবি হিসেবে তিনি যে কতো বড় মাপের ছিলেন তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে; শুধু তাই নয়, এক অসাধারণ সাহিত্য সাধক হিসেবেও ফররুখ আহমদ ক্রমাগতভাবে একজন কাব্যপাঠকের সামনে শিখরস্পর্শী মহীরুহের মত আবির্ভূত হতে থাকেন।

সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে আবদুল মান্নান সৈয়দের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত সত্যের মতো। অগ্রজ-অনুজ সবাইকেই তিনি অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। ফলে ফররুখের ওপর যারা কাজ করেছেন তাঁদের প্রত্যেকের কাজের চমৎকার একটি ফিরিষ্টি দিতে পেরেছেন ‘ফররুখ আহমদ: জীবন ও সাহিত্য’-এর ‘প্রাসঙ্গিক তথ্যপঞ্জি’তে। ফররুখ সম্পর্কিত কয়টি একক গ্রন্থ, কয়টি সম্পাদিত গ্রন্থ, কয়টি অনূদিত গ্রন্থ, কয়টি সাময়িক পত্র-পত্রিকা-সংকলন এবং বিশেষ সংখ্যা এ-পর্যন্ত প্রকাশিত

হয়েছে- তা এ-প্রাসঙ্গিক তথ্যপঞ্জি পড়লে সম্যক অবগত হওয়া যাবে। ফররুখ সম্পর্কিত আর যে 'নির্বাচিত প্রবন্ধপঞ্জি'টি 'প্রাসঙ্গিক তথ্যপঞ্জি'র আওতাভুক্ত করেছেন- সেটি সত্যিই কৌতূহল উদ্দীপক। কেননা এই পঞ্জিতে রয়েছে সেই সব শ্রেষ্ঠ লেখকদের নাম, যারাই ফররুখের সাহিত্য নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন; কোথায়- কোন পত্রিকায় সেই প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে তারাও নিখুঁত বর্ণনা সেখানে রয়ে গেছে। এগুলি সবচেয়ে বেশী কাজে লাগবে তাদেরই যারা ফররুখ সম্পর্কে আরো বেশী জানতে চায়, আরো গবেষণা করতে চায়।

প্রায় দুই দশক ধরে আবদুল মান্নান সৈয়দ ফররুখ চর্চা করছেন বলে, ফররুখ সম্পর্কে নানান উপাস্ত উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন এবং ঈর্ষনীয় শক্তিমত্তার সাথে এবং পেরেছেন বলেই, কাজী আফসার উদ্দিন সম্পাদিত 'মৃত্তিকা' পত্রিকায় 'সিকান্দার শা-র ঘোড়া' নামে ফররুখ আহমদের একটি যে অসমাপ্ত উপন্যাস-সেই উপন্যাস সম্পর্কেও আলোচনা করবেন তিনি। সম্ভবত নতুন কোনো দিগন্ত উন্মোচিত হবে তাহলে।

'ফররুখ আহমদ: জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থের কিছু কিছু মুদ্রণভ্রান্তি পাঠকমেজাজকে চটিয়ে দিতে সাহায্য করেছে, বাংলা একাডেমির প্রতিও সন্দেহ জাগিয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে ফররুখ আহমদের সাক্ষাৎকারে, ছাপার ভুল এতো বেশী যে, কান্না এসে যায়।

আমরা আশা করছি, আগামী সংস্করণে ঐ ভুলত্রুটিগুলো আর থাকবে না।

কাইয়ুম চৌধুরীর প্রচ্ছদ কাছে টেনেছে। একশত পঁচাত্তর টাকা মূল্য- একটু বেশীই মনে হয়। তবুও ফররুখের পাঠকের অভাব নেই বলে এবং আবদুল মান্নান সৈয়দের একটি অসাধারণ সৃষ্টি বলে 'ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য'- এর প্রথম সংস্করণ দ্রুতই নিঃশেষ হয়ে যাবে।

একজন তুমুল কবি এবং এই বধ্যভূমি একদিন স্বদেশ ছিলো কাব্যগ্রন্থ

একটি প্রসিদ্ধ-কথা, কবিতা বুঝতে হলে কবিকে বুঝতে হবে, কবিকে জানতে হবে। কবি-কে বোঝা এবং জানার মধ্যে নিহিত রয়েছে- অনেকখানি নিহিত রয়েছে ঐ কবির কবিতা বোঝা, ঐ কবির কবিতা জানা। সুতরাং যে কবি-কে বুঝলো না, কবিকে জানলো না- সে কি করে কবির কবিতা বুঝবে, কবির কবিতা জানবে।

আমাদের দেশে কবিকে বোঝার, কবিকে জানার সমস্যা আজো প্রকট। অনেকেই বলেন- ‘রচনা, দিয়েই তো রচয়িতাকে আবিষ্কার করা সম্ভব।’ এই বলার উত্তরে শুধু এতোটুকু বলা যায়-কিছুটাই মনে হয়, সবটুকু নয়।

মূলত ইকবালের মর্মবেদনার সাথে যার পরিচয় নেই; সেই মর্মবেদনার কারণ সম্পর্কে যে কিছুই জানে না- সে কি করে শেকওয়া এবং জওয়াবে শেকওয়াকে বুঝবে। সেই জন্যে, ইকবালের মর্মবেদনাকে যারা আবিষ্কার করতে পারেনি- সম্পূর্ণ ইকবালকে জানেনি শেকওয়া প্রকাশিত হবার পর তারাই তাঁকে কাফের ফতোয়া দিয়ে বসেছে।

আমরা আগেই বলেছি- আমাদের দেশে কবিকে বোঝার সমস্যা প্রবলতর। এখানে কবির সৃষ্টি নিয়ে আলোচকরা যতোটা আলোচনা করেন কবিকে নিয়ে- কবির সামগ্রিক পরিচয় নিয়ে ঠিক ততোটা আলোচনা করেন না। যার ফলে, একটোখা পর্যালোচনার সঙ্গেই পাঠকদের পরিচিতি বেড়ে ওঠে।

সত্যিকার অর্থে সমালোচকের একটি চোখ থাকতে হয় কবির জন্যে, আর একটি চোখ থাকতে হয় কবিতার জন্যে।

‘বস্তুত এই বধ্যভূমি একদিন স্বদেশ ছিলো’ কাব্যগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে, তার কবিকে নিয়েও আলোচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু তার জন্যে যে পরিসর দরকার- সম্ভবত এখানে তা নেই। তবু স্বল্প সুযোগের মধ্যেও- চেষ্টা চালানো যায়, পারতপক্ষে চেষ্টা।

‘এই বধ্যভূমি একদিন স্বদেশ ছিলো’ কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে কিছু কথা বলার আগে, আমরা তাই, ঐ কাব্যের- কবি আবদুল হাই শিকদার’ সম্পর্কে দু-একটি কথা বলে নিতে চাই।

এক.

কবি আবদুল হাই শিকদারের শৈশবের অনেকগুলো উজ্জ্বল দিন কেটেছে- ভারতের আসাম প্রদেশে; তার আক্বা-আম্মা-ভাই-বোনের সাথে। কবির আক্বা ছিলেন জননেতা মরহুম মওলানা ভাসানীর ছাত্র, মওলানা ভাসানীর ঘনিষ্ঠ মানুষ।

মওলানা ভাসানী যখন আসাম থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন; তখন কবির আসামের ভিটে বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং নতুন ঘর-দোর তুলেছিলেন বৃহত্তর রংপুরে- মওলানা ভাসানীরই নতুন বসতির পাশে।

কবি আবদুল হাই শিকদার ছিলেন রংপুর কারমাইকেল কলেজের বাংলা বিভাগের তুখোড় ছাত্র। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ করেছিলেন। এম এ করেছিলেন- কৃতিত্বের সাথে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে।

কবি আবদুল হাই শিকদার বাম-রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষভাবেই যুক্ত ছিলেন। যুক্ত ছিলেন কমরেড সিরাজ শিকদারের লাইনের সঙ্গে। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন ঠিকই; কিন্তু ভারতীয় ষড়যন্ত্রকে মেনে নিতে পারেননি- লহমার জন্যেও।

কবির আক্বা ছিলেন নেহায়েত পরহেজগার মানুষ- আপসহীন- ঐতিহ্যবাদী মানুষ। কবির নাস্তিক-নাস্তিক আচরণের জন্যে কষ্ট পেতেন তিনি কিন্তু কবির ওপর কখনো ক্রুটি না হয়ে, দোয়া করতেন বরং। তাই কবির ভাষায়-

আক্বার দোয়া এবং চোখের পানি এবং বড় দুলা ভাইয়ের পরিশ্রম আমাকে মুক্ত করেছে- অবিশ্বাসের নাগপাশ থেকে।

এই বিশ্বাস যে- আবদুল হাই শিকদারের জীবনে- কবির জীবনে কতোটা গভীর তা বোঝা যায় ‘আমি আপনাকে ভালোবাসি কবিতায়’ :

শপথ সেই পরম সত্তার
যার হাতে আমার জীবন
আমি আপনাকে ভালোবাসি
শপথ সেই অনন্ত অসীমের
যিনি দিনকে অপসারণ করেছেন রাত্রি থেকে
আর রাত্রিকে বিচ্ছিন্ন করেছেন দিনের অন্তর থেকে

আমি আপনাকে ভালোবাসি

[এই বধ্যভূমি একদিন স্বদেশ ছিলো-৯]

কবি ফররুখ আহমদও একদা বাম রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন কিন্তু বিশ্বাসের
দিকে প্রত্যাবর্তনের কারণে গোটা মানবতা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছে বিজয়ের
সম্ভাবনার উপটোকন। সেই উপটোকনের বক্তব্য এখন কবি শিকদারের
উচ্চারণের মধ্যেও দেদীপ্যমান।

মানুষ কেবল তুমিই পারো স্বাধীনতা বলতে পারো
এবার তোমার শিশুর পক্ষে দাঁড়াও,
স্বাস্থ্যবান ভবিষ্যৎ তোমাকে ভালোবাসা দেবে।

মানুষ তুমি শুকিয়ে গেছো
এবার নদীর পক্ষে দাঁড়াও।
স্বপ্ন তোমার আকাশ ছুঁয়ে যাবে।

মানুষ তুমি গাছের পক্ষে দাঁড়াও।
মানুষ তুমি বৃক্ষমুখী হও।
গভীর নিসর্গ তোমাকে অভিবাদন জানাবে।

আর অভিবাদন কুড়াতে কুড়াতে
মানুষ তুমি আবার মানুষ হবে।

[এই বধ্যভূমি একদিন স্বদেশ ছিলো-১৯]

একশ্রেণির কবি আছেন- যারা কবিতার জন্যে কবিতা লেখেন, গানের জন্যে
গান লেখেন কিন্তু কবি শিকদারের শিল্প-নির্মাণ মানুষের জন্যে, মানবতার জন্যে,
মাটির জন্যে, স্বাধীনতার জন্যে। শুধু এই কারণেই তাঁর কবিতায় আছে রাজনীতি-
অর্থনীতি-সমাজনীতি-সবই। যেমন ছিলো নজরুলের কবিতায়।

প্রতিবাদী কবির সংখ্যা সবসময়ই কম থাকে, সবযুগেই কম থেকেছে। বর্তমানে তো প্রতিবাদী কবি নেই বললেই চলে। অথচ যথার্থ অর্থেই কবি শিকদার এক অবিসংবাদিত প্রতিবাদী কবি। এই প্রতিবাদ তার অসত্যের বিরুদ্ধে, অশোভনের বিরুদ্ধে। কবির ‘আওয়ামী জাহেলিয়াত’ কবিতা ধারণ করে আছে এক অসাধারণ প্রতিবাদী ভাষা।

হায় ‘বঙ্গবন্ধু’ এ আপনি কোথায় নিয়ে এসেছেন আমাদের?
যেখানে দৈনিক কেবল বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গবন্ধু
তারপর বঙ্গবন্ধু অতঃপর বঙ্গবন্ধু অতএব বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গবন্ধু
আর আপনি নিজে কেড়ে নিয়েছিলেন আমাদের কথা বলার অধিকার,
আর এখন আপনার ফরজান্দ হরণ করছে আমাদের ইজ্জত।

কবি আবদুল হাই শিকদার এখন জাতীয়তাবাদী- জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ। কিন্তু সে জাতীয়তাবাদ ইসলামকে পরিত্যাগ করে নয় এবং ইসলামকে পরিত্যাগ করে নয় বলে ধর্মনিরপেক্ষ তথা ইসলাম বিদ্বেষী জাতীয়তাবাদীরা তাঁকে সহ্য করতে পারে না- একেবারেই সহিতে পারে না। একদা এই বিদ্বেষী-অপশক্তিই কবিকে পৃথিবী থেকে সর্বকালের জন্যে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলো। কবির ‘এই বধ্যভূমি একদিন স্বদেশ ছিলো’ কবিতায় তারই একটি তাজা চিত্র :

ঘটনাটি ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ না হয়ে যে কোনো দিনেই ঘটতে পারতো কিন্তু না, ২৫ সেপ্টেম্বরই কালো গ্রানাইড পর্বতের মতো কবির পথ রোধ করে দাঁড়ালো অন্ধকার।

কবির ডান বাজু অক্টোপাসের মতো পেঁচিয়ে ধরলো মৃত্যু
কবির বাম হাতকে সাড়াশির মতো নির্মমভাবে ধরলো মৃত্যু
কবির পেছনে শ্রেতের মতো অটুহাসি দিয়ে উঠলো মৃত্যু
আর কবির বক্ষ দেশের সোজা সামনে লকলক করে উঠলো আজরাঙ্গিলের
জিহ্বা।

[এই বধ্যভূমি একদিন স্বদেশ ছিলো-১৬]

আবদুল হাই শিকদারের সবচে’ বড় দুশমন হলো ব্রাহ্মণ্যবাদী-চক্র, অশুভ-ভারত-পন্থী চক্র। এঁরা তাঁর বিনাশ চায় এবং বিনাশ চায়, সংস্কৃতিগত বিনাশ, সর্বোপরি দৈহিক বিনাশ এবং এ কারণেই তাঁকে আখ্যায়িত করতে চায় রাজনৈতিক কবি হিসেবে, মৌলবাদী কবি হিসেবে। কবি ও ঐসব শত্রুদের ভালো করে চেনেন এবং চেনেন বলে সরাসরি ‘আমি হাজির’ কবিতায় উচ্চারণ করেন :

আমার পেছনে নিন্দুকের কুর্থসিং হুংকার
আমার পেছনে বন্ধুদের কপটতা

আমার পেছনে ভগুদের আঙ্কালন
আমার পেছনে বিশ্বাসঘাতকদের অট্টহাসি
আমার পেছনে চাঁদ নেই, উমি চাঁদ
আমার পেছনে জগৎশেঠের দাঁত
আমার পেছনে ঘাতকের খজুর ।

আমি ভয় ও শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছি

[এই বধ্যভূমি একদিন স্বদেশ ছিলো]

মূলত ভয় এবং শোষণের বিরুদ্ধে যারা দাঁড়ায় তাঁরাই মহাকালের স্বাক্ষী হয়ে
অনিশেষ জ্যোতির্ময়তাকে স্পর্শ করে। সুতরাং শত্রুরা তাঁর সর্বনাশের চেষ্টা
করবে যতোই, ততোই তাঁর আলো আদিগন্ত ছড়িয়ে পড়বে।

কবি আবদুল হাই শিকদার আদি-অন্ত ঐতিহ্যবাদী। ঐতিহ্যের প্রতি তার
অপরিসীম মমতা। এই মমতার স্পর্শ অনুভব করা যায়- যেমন তাঁর লেখায়; তেমনি
এ-ক্ষেত্রে তার সাংগঠনিক ক্ষমতা যোগ্যতা এবং মেধা কার্যকর করতে সর্বসময়ে
দ্বিধাহীন- সর্বসময়ে উন্মুক্ত- তিনি। সুতরাং জাতীয় ঐতিহ্যবাদী নেতৃত্বের প্রতিও
তাঁর সীমাহীন মমতা। ‘মাথা নত না- করার গল্প’ কবিতায়

কবি বলেন :

মাথা নত না করার কথা একদিন বলেছিলেন ঈশা খাঁ
একদিন রজব আলী শুনিয়েছিলেন একই গল্প।

....

....

....

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে পলাশীর মাঠে

এই কথাটিই বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন সিরাজ উদ্ দৌলা।

মজনু শাহর ফকিরদের পুরোটা জীবনই ব্যয় হয়ে গেলো পথে পথে।

বলতে বলতে এক পর্যায়ে নজরুল ইসলাম তো কথা বলাই বন্ধ করে দিলেন

আর ফররুখ আহমদ মরে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন

তিনি মরেননি

[এই বধ্যভূমি একদিন স্বদেশ ছিলো]

বহুত কবি শিকদারের ঐতিহ্য-প্রেম একদা শক্ত-ভিস্তির ওপর দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো
বলে, স্বদেশ- প্রেমের জ্বালা তাকে তাড়িয়ে ফেরে, দিনানুদিন।

‘জিয়া শহীদ জিয়া’ কবিতায় তাঁর উচ্চারণ :

দুয়ারে দুয়ারে অন্ধকারের দেয়াল
লগুভগু বিদেশী পিশাচ বুটের শব্দ কেবল
ফকির মজনু শাহ তোমাকে ডাকি
তিতুমীর বাঁশের কেন্দ্রা তোমাকে ডাকি
ঈশা খাঁ এগারসিন্ধু ঘুমিয়ে পড়েছো?
শেরে বাংলা আবুল হাশিম ভাসানী? ভাসানী?

কবি শিকদারের ঐতিহ্য-প্রেম এবং স্বদেশ-প্রেম তাকে বানিয়েছে চারণ-কবি।
সে-কারণে পরিভ্রমণ তাঁর একটি সংস্কৃতি-রক্তের মধ্যে মিশে থাকা একটি
অসাধারণ উল্লাস। এই উল্লাসের ভেতর দিয়ে আবার তিনি বিশ্ব-ব্রাজক। ‘নিপপন
নি সাসাগু’ কবিতায় আমরা দেখি :

জাপান সূর্যোদয়ের জাপান।

তোমার হতপিণ্ডের মতো বিস্তৃত মহাসাগরের অনেক উপর দিয়ে চলে
যাবো।

অন্য অনেক মানুষের মতো আমাকেও যেতে হবে।

যাবো, কিন্তু আপন হৃদয়, রয়ে গেলো সেতো তোমার মধ্যস্থানে।

[এই বধ্যভূমি একদিন স্বদেশ ছিলো]

হ্যাঁ, একজন বড় কবি হবার জন্যে- তুমুল কবি হবার জন্যে- পরিব্রাজন-পিপাসা
অবশ্যই থাকতে হয় এবং থাকতে হয়- ঐ পরিব্রাজন-পিপাসার সাথে সাথে-
মিথ্যাকে আবিষ্কার করার একটি ন্যায়সঙ্গত কৃষ্টি। কবি শিকদারের তা-ও আছে
বলে ‘বেনিয়াদের বাড়ি ৯৫’ কবিতায় তাঁর তরবারির মতো উচ্চারণ:

আর পথ রোধ করে যাজক বললেন,

তাঁর আগে বলো, ক্লাইভকে কেনো খোঁজো?

বললাম রাক্ষসের উৎসভূমি কেনো হয় মাটি

তাই জানতে এসেছি এতোদূর।

বললেন তিনি সত্যি বটে বেনিয়াদের

বাড়ির রং সাদা, তবে ঠিক সাদা নয় ওটা ছদ্মবেশ

[এই বধ্যভূমি একদিন স্বদেশ ছিলো]

কবি আবদুল হাই শিকদার দক্ষ বক্তা, দৃষ্ট সাংবাদিক, সংগঠক, দীপ্তবান
উপস্থাপক [টিভি উপস্থাপক] এবং গবেষক। এতোসব গুণের অধিকারী হবার
কারণে সবচেয়ে উপকৃত হয়েছে তাঁর কবিতা- সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর কাব্য-শিল্প-
বাংলার শব্দসমাজ। ‘এই বধ্যভূমি একদিন স্বদেশ ছিলো’ কাব্যের মধ্যে সবুজাভ
জমীন জুড়ে সেই প্রমাণ-শস্যই ছড়িয়ে আছে।

দুই.

এই বধ্যভূমি একদিন স্বদেশ ছিলো ' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হাবার আগেই প্রকাশিত হয়েছে- ১. আশি লক্ষ ভোর; ২. আশুন আমার ভাই; ৩. মানব বিজয় কাব্য; ৪. রেলিঙ ধরা নদী; ৫. 'যুগলবন্দী ভূগোলময়' নামের কাব্যগ্রন্থসমূহ। এর মধ্যে রেলিঙ ধরা নদী কবিকে সবচেয়ে বেশি পরিচিতি দিয়েছে, খ্যাতি দিয়েছে হিংসা করার মতো।

'এই বধ্যভূমি একদিন স্বদেশ ছিলো' কাব্যে ৪৪-টি কবিতা রয়েছে। প্রত্যেকটি কবিতাই সুখপাঠ্য এবং উদ্দীপক। বিশেষ করে, আবৃত্তির গুণাগুণ মিশ্রিত হয়ে আছে প্রায় প্রতিটি কবিতার আদিগন্ত। দু-একটি কবিতা নিয়ে শ্লোগানের অভিযোগ তোলা হলেও তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেননা কবিতার মতো কবিতা সবকিছুকেই গ্রহণ করতে সক্ষম। তাছাড়া কবিতায় উল্লঙ্গপনা থাকতে পারবে, শ্লোগান থাকতে পারবে না, সমাজ-নির্মাণের উচ্চারণ থাকতে পারবে না, তা হয় না।

একটি দুঃসাহসী প্রকাশনী- 'ধারাবাহিক প্রকাশনী' প্রকাশ করেছে ঐ কাব্যগ্রন্থ এবং সাহসী প্রকাশকের প্রোজেক্ট বর্ণমালা- নুরুল আমীন দুদু। যার সাহসের একটি খ্যাতি আছে সর্বত্র।

'এই বধ্যভূমি একদিন স্বদেশ ছিলো'র প্রচ্ছদ সত্যিই কাব্যময়। কে-যে ঐকেছেন, তার নাম না থাকাটা আপত্তিকর বলে মনে হয়েছে।

পঞ্চাশ টাকা মূল্যের এই কাব্যগ্রন্থ কবিতা-প্রেমী এবং স্বদেশ প্রেমী সবারই সংগ্রহে থাকা উচিত। কাব্যটির কোথাও যৌন-কণ্ঠ নেই বলে- পরিবারের সবাই মিলে পড়তে কষ্ট হয় না। গ্রন্থটি পাওয়া যাচ্ছে শাহবাগের আজিজ সুপার মার্কেটের দেশ প্রকাশনীতে।

चिठि

প্রসঙ্গ কথা

চিঠি। মনের ভেতরে লুকিয়ে থাকা অব্যক্ত কথার সুনিপুন প্রকাশ। কবি মতিউর রহমান মল্লিক জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তার প্রিয়জনের কাছে লিখেছেন একান্ত অনুভূতির কথা। তিনি জীবনের সাথে ইসলামী সাহিত্য সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কাজকে একাকার করে ফেলেছিলেন। তাই তার অধিকাংশ চিঠিতে সেসব অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বেশি। কখনো ভালো লাগা আবার কখনো অভিমানে ক্ষোভের তীব্রতাও প্রকাশ পেয়েছে। এখানে সংগৃহীত কবির ৬টি চিঠি সন্নিবেশিত হলো।

প্রিয় আমীরুল ইসলাম ভাই।

আস্ সালামু আলাইকুম।

বুঝতে পারছি ব্যস্ত আছেন, ভালো আছেন। আল্লাহ আপনাদের আরো আরো সাফল্য দিন।

চট্টগ্রাম সংস্কৃতি কেন্দ্রের দীপ্ত ভূমিকায় ব্যক্তিগতভাবে আমি অত্যন্ত আনন্দিত, গর্বিত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চট্টগ্রাম সংস্কৃতি কেন্দ্র ধীরে ধীরে তার জায়গা করে নিচ্ছে বলে মনে হয়।

এবার পুরস্কার পেলেন শাহাবুদ্দীন ভাই। আপনাদের নির্বাচন যার-পর-নাই যথার্থ। সামনের দিনগুলোতে এই যথার্থতা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে, ক্রমাগতভাবে ‘ফররুখ স্মৃতি পুরস্কার’ সংসাহিত্য আন্দোলনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক-প্রান্ত খুলে দেবে। এবং নিঃসন্দেহে।

ইকবাল চেয়েছিলেন, প্রতিটি মানুষের মধ্যে অসম্ভব সম্ভাবনা নিয়ে ‘খুদী’ জাগ্রত হোক, আত্মমর্যাদায় সুশোভিত হোক। ঢাকার সাহিত্যিকদের মধ্যে সেই ‘খুদী’ আমি শাহাবুদ্দীন ভাইয়ের মধ্যে দেখতে পেয়েছি। এবং দেখতে পেয়েছি বলেই শাহাবুদ্দীন ভাইয়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধার অন্ত নেই। শাহাবুদ্দীন ভাইয়ের কাছে এলে আমি সব সময় একটা মানসিক প্রশান্তি খুঁজে পাই। সঙ্গত কারণে তাই, ‘ফররুখ স্মৃতি পুরস্কার শাহাবুদ্দীন ভাই পাওয়ায় আমার আনন্দের সীমা নেই। আল্লাহ আপনাদেরও পুরস্কৃত করুন- উত্তম পুরস্কারে।

আপনার পাঠানো দাওয়াতপত্র পেয়েছি। যাওয়ার খুবই ইচ্ছে ছিলো। কলমের ঝামেলা আর অন্যান্য ঝঞ্ঝাটে পারলাম না। তবুও মানসিকভাবে আমি এই মহান অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়ে গেছি। আমার একটি বিশেষ অনুরোধ- সারা অনুষ্ঠান যেন ভিডিও করেন, দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাবো ঢাকায় বসে, সমবেতভাবে। ক্যাসেটের দাম আপনি ঢাকায় এলে পাবেন- ইনশাআল্লাহ।

শাহাবুদ্দীন ভাই ফল-ফলাদি খেতে দারুণ পছন্দ করেন। খেয়াল রাখবেন। আমারই পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ‘মাল্লান সৈয়দ স্যার’ পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি। একদিকে শাহাবুদ্দীন ভাই অন্যদিকে মাল্লান সৈয়দ স্যার- সুতরাং এবারের বিজয় আমারই বিজয়।

অনেক ধকল তো যাচ্ছে। ক’দিনের জন্য বেড়াতে আসুন।

সালাম আপনার পরিবার, চ.স. কে. পরিবার, নোঙর পরিবার ও অন্যান্য সবার জন্য।

শুভেচ্ছান্তে,

আপনাদের মল্লিক ভাই।

বরাবর,
পরম শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান সাহেব,
বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্র,

বিষয় : পদত্যাগপত্র ফিরিয়ে নেয়া প্রসঙ্গে

মোহতারাম,

আস সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ

গতকালই ৫/৫/০১ বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্রের সদস্য-সচিবের পদ থেকে পদত্যাগ করবার একটি আবেদনপত্র আপনার নিকট পেশ করেছিলাম। ঐ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্রের পরম শ্রদ্ধেয় সদস্য-প্রশাসন ঐ দিন বিকেলে আমাকে ডেকে পাঠান। এবং আমাদের মধ্যে পদত্যাগের বিষয় নিয়ে এবং বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্রের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা হয়।

তার সাথে আলোচনা করে আমি যার-পর-নাই আনন্দিত হয়েছি এবং মুগ্ধ হয়েছি।

এ রকম একটি অবস্থায় আমি আমার পদত্যাগপত্র ফিরিয়ে নিচ্ছি এবং আবেদন করছি আমার পদত্যাগপত্র গ্রহণ না করার জন্য। উল্লেখ্য, পরম শ্রদ্ধেয় সদস্য-প্রশাসনের সাথে গতকাল আলোচনা হয়ে যাবার পর, নতুন উদ্যোগ নিয়ে, যথা সময়ে আমি আমার অফিসে যোগদান করেছি।

সবশেষে আমি আপনার কাছে এই দোয়াই কামনা করছি- আল্লাহ আমাকে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কাজ করবার যতটুকু যোগ্যতা দিয়েছেন তার সবটুকুই যেন উজ্জাড় করে দিতে পারি। এবং বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে যথার্থ ভূমিকা রাখতে পারি।

মাআসসালাম

মতিউর রহমান মল্লিক

৬/৫/০১

মুহতারাম মাওলানা মুহাম্মদ শামছুদ্দীন

সভাপতি, ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ, চট্টগ্রাম।

মুহতারাম এম.এ.তাহের

সেক্রেটারী, ইসলামী সমাজকল্যাণ পরিষদ, চট্টগ্রাম।

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়াবাবাহুতুহ্‌।

মহান রাক্বুল আলামীনের দরবারে শুকরিয়ার মন্তক অবনত করছি। যিনি সকল কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক। যিনি সমস্ত সম্মান ও মর্যাদার অধিপতি। যার করুণা ও রহমতে আমরা আলোকিত পথের সন্ধান পেয়েছি।

ইসলামী সমাজকল্যাণ পরিষদের ২৫তম তাফসীরুল কুরআন মাহফিল এ-বছর অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি যার-পর-নাই আনন্দিত। সেই সাথে গুণীজন সংবর্ধনা হচ্ছে জেনে আরো বেশী উৎসাহী ও পুলকিত হয়েছি। তবে খানিকটা অবাক হয়েছি গুণীজনদের তালিকায় আমার নাম দেখে। আসলে এ-সংবর্ধনার উপযোগী আমি নই। তবুও আপনারা আমাকে বাছাই করেছেন, এটা নিঃসন্দেহে মহান রাক্বুল আলামীনের একান্ত মেহেরবানী।

আমার মনে পড়ে, সেই সাংস্কৃতিক জীবনের প্রথম দিকের কথা। যখন গান-কবিতা লেখা শুরু করেছি, সংস্কৃতি চর্চা শুরু করেছি, সেই সময় এমন কোনো বিষয় ভাবতেই পারিনি যে, আমি সংবর্ধিত হবো, পুরস্কার পাবো। অবশ্য এখনো এই বিষয় ভাবি না। কেননা আমি মনে-প্রাণে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, প্রকৃত পুরস্কার আল্লাহ রাক্বুল আলামীনের দরবারেই রয়েছে। তারপরও দুনিয়ার জীবনে মানুষের মধ্যে এ-ধরনের স্বীকৃতি উজ্জ্বল হলে নিজেকে ধন্য মনে হয়; কাজের ক্ষেত্রে আরো বেশী উদ্যমী হতে সাহস পাই।

আমি যা করেছি আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য করেছি। এখনও যা করছি সেই একই লক্ষ্যে করছি। ইনশাআল্লাহ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা প্রবহমান থাকবে বলে বিশ্বাস করি।

আমি জানি, যে-কোনো মর্যাদা বা সম্মান আল্লাহ রাক্বুল আলামীনের পক্ষ থেকেই আসে। সে-কারণে সর্বাবস্থায় যেনো তাঁর উপর ভরসা করার এক দুর্বীর হিম্মত বুকে রেখে আজীবন পথ চলার চেষ্টা করতে পারি, সেই দোয়াই আপনাদের কাছে চাই।

মহান রবের উপর ভরসা রেখেই আমি আপনাদের সিদ্ধান্তের প্রতি অত্যন্ত আনন্দ ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্মতি প্রদান করছি।

মায়াসসালাম

মতিউর রহমান মল্লিক

৯/১২/২০০৩

সাজ্জাদ ভাই

আসসালামু আলাইকুম।

১. আপনাকে লিখছি মহাখালী বঙ্কব্যাধি হাসপাতাল থেকে। ভাবতে পারিনি শেষ পর্যন্ত আমার এখানে আসতে হবে। গতকাল ভর্তি হয়েছি। অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় কেটেছে রাত। যদিও দীর্ঘসময় ধরে লিখেছি। মনে হচ্ছে, ঠিকমত লেখাপড়াটা যদি চালিয়ে যেতে পারি- সতেজ থাকবো। গতরাতে, ৮টার দিকে এক রুগী এলো, নোয়াখালীর, বেইশ। আমার পাশের খাটিয়ায় মারা গেলো রাত ১০:৩০ টায়। আশে-পাশে আরো ক'জন আছে। অনেকের অবস্থা ভালো না। অন্যান্য কক্ষ থেকেও ভেসে এসেছে আত্ননাদ। এখানে মৃত্যু কতো সহজ।
২. জামেদ আলী ভাইয়ের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী যাচ্ছে। ক'দিন থেকে তাগিদ অনুভব করছিলাম একটা কিছু লেখার। একবার ভেবেছিলাম স্মৃতিকথা লিখবো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মন সায় দেয়নি। হাতের কাছে যা ছিলো বাসা থেকে নিয়ে এসেছিলাম। তা-ই সামনে রেখে এবং স্মরণ থেকে সাহায্য নিয়ে ঐ 'একটা কিছু' লিখলাম। ফররুখ সম্পর্কিত লেখাটি এতো তাড়াতাড়ি মুদ্রিত হবে ভাবতে পারিনি। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছি। আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি; কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন করছি। আমার মতো একজন লেখকের প্রতি আপনার মনোযোগ সত্যিই আমার জন্যে আনন্দের। বিশেষ করে এই ভারাক্রান্ত দিনগুলোতে। আল্লাহ আপনাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।
৩. ভালো হোক, হোক মন্দ, আপনার ওপর আমি একটি লেখা তৈরি করতে চাই। আপনি জানেন, আশা এটি আমার অনেক দিনের। এখন আমার হাতে বেশ সময়। এই সময়ের মধ্যে কাজটা সেরে নিতে চাই। সেই জন্যে দরকার: আপনার বইগুলো। মোট কতো দাম হয়, জানাবেন, কিনে নেবো। এ পর্যন্ত আপনার ওপর প্রকাশিত লেখাসমূহ। ফটোস্ট্যাটের দরকার হলে, খরচ দেবো। আপনার যে সব সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে, সবগুলো। আপনার গড়ে তোলা সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর নাম। আপনার সম্পাদিত সংকলন-পত্র-পত্রিকাসমূহের নাম। আপনার একটি সম্পূর্ণ পরিচিতি। আপনার প্রকাশিত কলাম-নিবন্ধ-প্রবন্ধ-গদ্যসমূহ। আপনার ঐ কাজগুলো করার জন্যে আপনার কোনো তরুণ ভক্ত-সাহিত্যিককে কাজে লাগাতে পারেন। কিছু খরচ দিতে হলে বলবেন, আমি দেয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

আপনার ওপর লেখাটা শেষ করতে পারলেই তালিব ভাইয়ের ওপর লিখতে চাই।
দোয়াপ্রার্থী

ম.র.ম

(মতিউর রহমান মল্লিক)

প্রিয় হায়দার,

আস্ সালামু আলাইকুম,

ঢাকায় ফেরার সময় তোমাদের খুব কষ্ট দিয়েছি। তবে সেদিন কষ্ট করে থেকে, কর্তৃপক্ষের কাছে বলে, মাছ পাঠানোর ব্যবস্থা যদি না করে দিতে, সর্বোপরি আল্লাহর রহমত যদি না থাকতো, তাহলে ইজ্জত নিয়ে ঢাকায় ফেরা সম্ভব হতো না।

২. আমি চেষ্টা করবো ২৭ রমজান-রাতে বারুইপাড়ার উদ্দেশ্যে ঢাকা থেকে রওনা দিতে। সকাল-সকাল মাদরাসায় পৌঁছবো ইনশাআল্লাহ। তুমি থাকবে কিম্ব। দাদা-কে, মও. মোস্তফাকে জানিও, কোনোভাবে যদি মোবারক ভাই-কে জানাতে পারো তো খুব ভালো হয়। অন্তত ড. লতিফ ভাইকে জানিও। আর আবদুল লতিফ ভাই যদি একটু কষ্ট করে মোবারক ভাইকে জানান, তাহলে তাঁর পেরেশানী থাকবে না ইনশাআল্লাহ।

৩. ঈদ ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথেই করবো। ঈদের ঠিক পরের দু-দিন বাগেরহাট এবং কচুয়ায় সময় দিতে হবে। ওদের সাথে আলাপ হয়ে গেছে। তুমি সাথে থাকবে।

৪. শেষ পর্যন্ত ইতালি যেতে হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ মার্চে। কবি আল মাহমুদ ভাইও যাচ্ছেন। পুরো মার্চটাই ইতালির দিকে কাটবে হয়তো। একদম বলাবলি করবে না। শুধু দাদাকে দোয়া করতে বলবে।

৫. অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দারের সাথে অনেক স্বপ্ন, অনেক পরিকল্পনা নিয়ে কথা হয়েছে। তুমি সেই কথা ওর কাছ থেকে শুনে নেবে।

‘কেউ না করুক আমি [অর্থাৎ আমরা] করবো কাজ’।

৬. সবার জন্যে সালাম রইলো।

মল্লিক ভাই

আব্দুল গনি ভাই

সালাম নেবেন। ওরা গেলো। ওখানে আপনিই ওদের সবচেয়ে আপন। আপনাকেই বিরক্ত করবে বেশী।

আমি আমার সমস্ত দুঃখ নিয়েই থেকে গেলাম। মানুষ যা চায় তা সব সময় পায় না। আমার অবস্থা সারা জীবনভরই যেনো ঐ রকম। আসলে যারা বিদ্রোহী হতে পারে না তাদের জন্যে পদে পদেই বিপত্তি।

আমার পরীক্ষার জন্য ফকির সাহেবকে দোয়া করতে বলবেন। তার জন্যে আমার হৃদয় নিঙড়ানো সালাম রইল। যেতে যে পারলাম না কেনো তা তাঁকে বুঝিয়ে বলবেন এভাবে-

১. পরীক্ষা; ২. পত্রিকা; ৩. সংগীত ও ৪. ব্যক্তিগত সমস্যার কারণেই মল্লিক এলো না। সামনে আসবে। তার ওপর রাগ রাখবেন না। সে অপেক্ষাকৃত অসহায়। ওয়াস সালাম।

আপনারই ভাই

মল্লিক

মল্লিক রচনাবলী সংগ্রহের ইতিকথা

ড. মনোয়ারুল ইসলাম

কবি মতিউর রহমান মল্লিক। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ইসলাম ও দেশপ্রেমের জাতীয় চেতনায় সজীব এক আধুনিক কবি। তিনি তাঁর মেধা ও মননে যে মূল্যবোধের লালন করতেন তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকর্মেই এর পরিচয় বিদ্যমান। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, গীতিকার, সুরকার ও প্রখ্যাত বিপ্লবী সংগঠক। বাংলার জমিনে হেরার রাজ বুননে শিল্প সাহিত্যজ্ঞানে কবি নজরুল, ফররুখের পর তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।

সচরাচর বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিকদের লেখায় চেতনার বিভিন্ন উপাদান কাগজে সীমাবদ্ধ থাকলেও ব্যতিক্রমী মতিউর রহমান মল্লিক তাঁর ক্ষুরধার লেখনির মধ্যকার বিশ্বাস মূল্যবোধ ও চেতনা জনে জনে ছড়িয়ে দিতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তৈরি করেছেন অসংখ্য সাংস্কৃতিক কর্মী ও সাংস্কৃতিক সংগঠন।

আর এ জন্যই তাঁর মৃত্যুর পর অল্প কিছু লেখার পাণ্ডুলিপি আমরা হাতে পেলেও তাঁর লেখনির সবচেয়ে বড় অংশ সংগ্রহ করতে আমাদের সারাদেশ চষে বেড়াতে হয়েছে। ছুটতে হয়েছে বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্নজনের কাছে। আমার এ লেখায় মল্লিক রচনাবলীর লেখা সংগ্রহের কাজে যিনি যেভাবে সহযোগিতা করেছেন সবার নাম সংযুক্ত করার চেষ্টা করেছি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য। আর যে সকল পত্র পত্রিকা, স্মারক, সংকলনে কবির লেখা প্রকাশ হয়েছে তাঁর তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরেছি যা ভবিষ্যতে গবেষণার জন্য সহায়ক হবে।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক মৃত্যুবরণ করেন ২০১০ সালের ১২ আগস্ট। মৃত্যুর পর ২০১৪ সালে প্রথম তাঁর রচনাবলী প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ উদ্যোগের প্রায় চার বছর পর ২০১৭ সালে ২৬ জানুয়ারি জাতীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে দেশীয় সাংস্কৃতিক সংসদ প্রতিষ্ঠা হয়। বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ড. আ জ ম ওবায়েদুল্লাহকে এর আহ্বায়ক এবং আমাকে এর সদস্য সচিব করা হয়। আমরা একটু একটু করে সংগঠনের কাজ এগিয়ে নিতে থাকি। এর বেশ কিছুদিন পর কেন্দ্রীয় সাহিত্য সংস্কৃতি কমিটির একটি মিটিংয়ে মল্লিক রচনাবলীর

বিষয়টি এজেন্ডাভুক্ত হয়। আলোচনা-পর্যালোচনার পর রচনাবলী সংক্রান্ত গঠিত কমিটিকে তাগিদ দেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। এরপর কয়েক দফা তাগিদ দেয়ার পর ২৯ এপ্রিল ২০১৭ তারিখের মিটিংয়ে কেন্দ্রীয় সংসদের পরিচালনায় রচনাবলীর কার্যক্রম সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর কয়েকদিন পর ওবায়দ ভাই আমাকে নিয়ে বসলেন এবং রচনাবলীর কাজটি বিশেষ গুরুত্বের সাথে দেখার বিষয়ে বলেন। সাথে সাথে বেশ কিছু পরামর্শও দিলেন। আমি সে আলোকে কাজ শুরু করি। প্রথমে কবি আসাদ বিন হাফিজ ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করি এবং এ বিষয়ে পরামর্শ নিই। ভাই বেশ কিছু পরামর্শ দিলেন এবং কবি আফসার নিজাম ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করার জন্য বললেন। এরপর বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শিল্পী ও সুরকার অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করি। তিনি দেশের বাহিরে থাকায় মোবাইলেই সার্বিক বিষয়ে দীর্ঘ সময় ধরে কথা হয়। তিনি গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু পরামর্শ দেন। এবং যত্ন ও দরদ দিয়ে রচনাবলীর কাজটি সম্পন্ন করার প্রত্যাশা করেন। এরপর যোগাযোগ করি কবিপত্নী কথাসিল্পী সাবিনা মল্লিকের সাথে; তিনি অত্যন্ত খুশি হন এবং সার্বিক সহায়তার আশ্বাস দেন। এবং সাথে সাথে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শও দেন। এরপর যোগাযোগ করি কবি আফসার নিজাম ভাইয়ের সাথে। তাঁর সময়মত আমি সাক্ষাত করলাম। অনেক কথা হলো এবং কয়েকদিন পর উনার কাছে যা আছে তা আমাদের দিবেন জানালেন।

ইতোমধ্যে দেশীয় সাংস্কৃতিক সংসদে জনাব মনিরুল ইসলাম সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দান করেছেন। তাঁকে নিয়ে নিজাম ভাইয়ের কাছে যাই। তিনি তাঁর কাছে সংগৃহীত লেখাগুলো আমাদের দিলেন। যেগুলো দিয়ে আমরা ২০১৮ সালে জানুয়ারি মাসে মল্লিক রচনাবলী প্রথম খণ্ড প্রকাশ করি। ১ম খণ্ডে কবির কবিতার বই- আবর্তিত তৃণলতা, অনবরত বৃক্ষের গান, তোমার ভাষায় তীক্ষ্ণ ছোরা; গানের বই- ঝংকার, যত গান গেয়েছি, প্রাণের ভেতরে প্রাণ; ছড়ার বই- রঙিন মেঘের পালকি, নতুন চাঁদের আলো; প্রবন্ধের বই- মহানবী (সা.) ও মানবতাবাদ ছান পায়। এরপর অল্প কিছু রচনা আমাদের হাতে থাকে।

৫ এপ্রিল ২০১৮ মনিরুল ইসলাম ভাই তাঁর কাছে থাকা কবির কয়েকটি অভিভাষণের তথ্য দেন। আমি বিস্তারিত জানার চেষ্টা করি। তিনি বলেন ২০১৫ সালে গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী মাসুদ রানা ভাই আমাকে কয়েকটি সিডি প্লেয়ার দিয়ে বলেন 'এখানে দেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দেয়া কবি মতিউর রহমান মল্লিকের বেশ কয়েকটি অভিভাষণ আছে। একটু কষ্ট করে এগুলো শ্রুতিলিখন করে দাও। আমি সেগুলো শ্রুতিলিখন করে দিয়েছি, আমার কাছেও কপি আছে।' আমি মনির ভাইকে পরদিন নিয়ে আসার জন্য বলি। এদিন তিনি ৪টি অভিভাষণ দিলেন। পাতা উল্টিয়ে দেখলাম অভিভাষণগুলো

সাংস্কৃতিক কর্মীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অভিভাষণগুলো নতুন সংগ্রহ তালিকায় যুক্ত করি।

১১ এপ্রিল ২০১৮, সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা কবির লেখা সংগ্রহের বিষয়ে ড. আজম ওবায়দুল্লাহ এবং জনাব মনিরুল ইসলামসহ একটি মিটিং করি। প্রোগ্রামটি ছোট পরিসরে হলেও খুবই অর্থবহ ছিলো। সেখানে উঠে আসা গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও সিদ্ধান্তের আলোকে কাজ শুরু হয়। আমরা আবাবো সাক্ষাৎ করি কবি আসাদ বিন হাফিজের সাথে। তিনি আমাদের হাতে তুলে দেন- চিত্রল প্রজাপতি, নির্বাচিত প্রবন্ধ, নিষগ্ন পাখির নীড়ে, উলুঘ খানজাহান ও তাঁর খলিফাতাবাদ, অনূদিত উপন্যাস: পাহাড়ি এক লড়াকুসহ কয়েকটি কবিতা ও গানের প্রিন্ট কপি। এগুলোর সফট কপি আফসার নিজাম ভাইয়ের কাছে আছে এটাও বললেন তিনি। এরপর আমরা কবি আফসার নিজামের সাথে সাক্ষাতের জন্য তাঁর বাসায় যাই। তিনি প্রিয় কবির রচনার কিছু সফট এবং প্রিন্ট কপি আমাদের হাতে তুলে দেন। সেগুলো হলো, কাব্যগ্রন্থ- চিত্রল প্রজাপতি, নিষগ্ন পাখির নীড়ে, ছড়ার বই- লাল ফিতা, মুন্নার পান্ডা, ঘোর কাটুক, ভেজাল সমাচার, অনূদিত উপন্যাস- পাহাড়ি এক লড়াকু। প্রবন্ধের বই- নির্বাচিত প্রবন্ধ। কবির বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধও আমাদের হাতে তুলে দেন, বাগেরহাট সংস্কৃতি কেন্দ্রের প্রথম সম্মেলন : নতুন আলোর ঝলকানি, কিশোরকণ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার। একটি সফল ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান: প্রস্তুতি ও সাবধানতার অনুষঙ্গে, একটি সাংস্কৃতিক কর্মসূচি গ্রহণ করার আগে, সাহিত্যের প্রেমে সংস্কৃতির ভালোবাসায়, বর্ষাকালীন জাতীয় কবিতা উৎসব ২০০৩ এর অভিভাষণ, মাওলানা মুহাম্মদ শামছুদ্দীনকে লেখা চিঠি, সসাস কর্তৃক ‘অনুরণন’ কর্মশালা স্মারক ২০০০ এ প্রকাশিত ‘বাংলাদেশে ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন : একটি অন্তর্গত মূল্যায়নের খসড়া। কবি সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেনের কাব্যময় ক্যানভাস, একজন খাঁটি গল্পকারের পক্ষেই অবিরলতাকে স্পর্শ করা সম্ভব এবং কবি কামাল হোসেন খান একজন নিবেদিতপ্রাণ কবি নামে তিনটি ফ্ল্যাপ। ‘গানের মধ্যে আমি সবসময় গভীর এবং অপ্রতিরোধ্য আবেগ অনুভব করি’ শিরোনামে মাসিক নতুন কিশোরকণ্ঠে প্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকারও তাঁর কাছ থেকে পাই।

১৫ মে ২০১৮ কবি আহমদ বাসির ভাইয়ের সাথে মল্লিক রচনাবলীর লেখা সংগ্রহ বিষয়ে একটি মতবিনিময় করি আমাদের অফিসে। বাসির ভাই বললেন, আমার সম্পাদনায় মর্নিং ব্রিজ প্রকাশনী থেকে মল্লিক ভাইয়ের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কিছু সাক্ষাৎকার নিয়ে একটি বই বের হয়েছে। ভাইয়ের তথ্য অনুযায়ী মর্নিং ব্রিজ এর প্রকাশক হাসনাইন ইকবাল এর মাধ্যমে বইটি সংগ্রহ করি।

উপরোক্ত লেখাগুলোর মাধ্যমে রচনাবলীর আরো একটি খণ্ড বের করার মতো প্রয়োজনীয় লেখা জোগাড় হয়। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ছিল মতিউর রহমান মল্লিকের লেখা এখানেই শেষ হওয়ার কথা নয়। সবচেয়ে বড় বিষয় তিনি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কাজে সারাদেশ চেষ্টে বেড়িয়েছেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের গোষ্ঠীগুলোকেও তিনি গান, কবিতা ও অন্যান্য লেখা দিয়েছেন যার কোন কপি তাঁর সংগ্রহে ছিল না। তাই এ সংগ্রহের কাজ খুব সহজ হবে না এটাও বুঝার বাকী থাকল না। আমরা পরিকল্পনা এঁকে সবার সাথে যোগাযোগ শুরু করলাম।

আমাদের সংগ্রহের কাজ বেশ জোরেশোরে চলছে। ইতোমধ্যে দেশীয় সাংস্কৃতিক সংসদে ইয়াসিন মাহমুদ সাহিত্য কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দান করেন। মল্লিক রচনাবলীর পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের কাজে নানাভাবে তাঁকে কাজে লাগানো শুরু করি। দেশীয় সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম ও ইয়াসিন মাহমুদকে নিয়ে কিছু দিন পর পর ফলোআপ মিটিং করতে থাকি। এর সুবাদে যখন কিছু লেখা সংগ্রহ করতে সক্ষম হতাম তখন আনন্দটা আরো বেড়ে যেতো। এ কাজটা শুধু কাজ নয় যেন ভালোবাসায় পরিণত হতে লাগলো। বিশেষ করে সারাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তি ও সংগঠনের একটি তালিকা প্রস্তুত করে সেই তালিকা সামনে রেখে আমরা আমাদের প্রতিদিনের কার্য তালিকায় এই কাজটিও সংযুক্ত করি। মাঝে মাঝেই কবিপত্নী কথাশিল্পী সাবিনা মল্লিক, কবি আফসার নিজাম, কবি আহমদ বাসিরসহ আরো অনেকের সাথে এ কাজের অগ্রগতির লক্ষ্যে মতবিনিময় করি এবং আমাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখি। আর সাহিত্য সংস্কৃতি প্রেমীরা তাঁদের সংগ্রহে থাকা কবির রচনাবলী দিয়ে আমাদের সংগ্রহ কার্যক্রমে সহায়তা করতে থাকেন নিয়মিত।

তরুণ কবি ইয়াসিন মাহমুদ সবেমাত্র আমাদের অফিসে জয়েন করেছেন। তখন তিনি এমফিল গবেষণারত। তাঁকে মল্লিক রচনাবলীর লেখা সংগ্রহের দায়িত্ব দেই তিনি তা সানন্দে গ্রহণ করেন। এবং কোথাও কোন লেখা পেলেই সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ছবি তুলে পাঠানো শুরু করেন। ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ইং তাঁর নিজের সংগ্রহে থাকা স্মারক-সংকলন থেকে কবির বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনা আমাকে দেন। সেগুলো হলো- এম আব্দুল গফুর সম্পাদিত সমন্বয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী স্মারক ১৯৯৯ এ প্রকাশিত ‘বগুড়ার সীমাহীন মানুষ’ নামে একটি কবিতা, শহীদ রফিকুল ইসলাম স্মৃতি সংকলন ২০০২, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ‘রক্তে জাগে দ্রোহ’ এ প্রকাশিত ‘আলো ও সুঘ্রাণের ইতিহাস’ নামে একটি কবিতা। কবি শরীফ আবদুল গোফরান সম্পাদিত এবং ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত কবি গোলাম মোহাম্মদ স্মারক ২০০৩, ‘হিজল বনের পাখি’ তে দুটি গান- শিল্পকোণের শিল্পী আমার, সকল কষ্টে সে ছিলো আমার।

কবি হাসান আলীম সম্পাদিত ম্যাগাজিন, 'চারণ' ১৯৯০ প্রকাশিত 'উড়াল' নামে একটি কবিতা।

কবি আহমদ বাসির ছিলেন কবি মতিউর রহমান মল্লিকের আত্মভাজনদের অন্যতম। মল্লিকের এমন অনেক লেখা আমরা পেয়েছি যা আহমদ বাসির ভাইয়ের হাতে লেখা। তিনি মল্লিক রচনাবলীর সম্পাদনা কাজে বেশ সহযোগিতা করেছেন। তাঁর সংগ্রহে থাকা লেখাগুলো খুঁজে খুঁজে আমাদেরকে বিভিন্ন সময়ে প্রদান করেছেন। ৭ মে ২০১৯ কবি আহমদ বাসির বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনা আমাদের হাতে তুলে দেন। এদিন তিনি আমাদের দেন খন্দকার আবদুল মোমেন সম্পাদিত প্রেক্ষণ পত্রিকার জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০০৮ সংখ্যায় প্রকাশিত ধ্যানমগ্ন এক সাধকের প্রতিচ্ছবি, শাহাবুদ্দীন ভাইয়ের গ্রামের বাড়িতে একদিন নামে একটি প্রবন্ধ ও একটি স্মৃতিকথা। প্রেক্ষণ, জানুয়ারি-মার্চ ও এপ্রিল-জুন ২০০৭ বিশেষ সাহিত্য সংখ্যায় প্রকাশিত তুমি, লাশ খেকো এবং 'হৃদয় ও সজাগ থাকার রাত্রিদিন' নামে একটি কবিতা।

১১ জুন ২০১৯ রচনাবলী সংগ্রহের কার্যক্রম নিয়ে মনির ভাই এবং ইয়াসিন ভাইকে নিয়ে ফলোআপ মিটিং করি এবং অন্যান্য দায়িত্বের মাঝে মল্লিক রচনাবলী সংগ্রহের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করি। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ আসে আমরা যে যেখানেই যাই, সেখানে কোন আরক, সংকলন বা ম্যাগাজিন পেলে মল্লিক ভাইয়ের লেখা আছে কিনা তা যেনো সবাই খুঁজে দেখি। পরদিন সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের একটি প্রোগ্রামে যান ইয়াসিন মাহমুদ। সেখানে তিনি কবি আসাদ বিন হাফিজ সম্পাদিত ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের ১৯৯৬ সালের সীরাত আরকে প্রকাশিত 'সেরা মানুষের জীবন' নামে একটি কবিতা খুঁজে পান। এরপর দিন তিনি নিজের সংগ্রহে থাকা ইকবাল হুসাইন জীবন সম্পাদিত সাইয়ুম শিল্পীগোষ্ঠীর তিন দশক উৎসব পূর্তি আরক ডিসেম্বর ২০০৯ এ প্রকাশিত 'চিকিৎসা', খন্দকার আবদুল মোমেন সম্পাদিত প্রেক্ষণ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬ এ প্রকাশিত 'ডক্টর সৈয়দ আলী আশরাফ স্যার' নামের দুটি কবিতা, প্রেক্ষণ, ১ মার্চ ১৯৯৪ ফররুখ স্মরণ সংখ্যায় আবদুল মান্নান সৈয়দ : তাঁর ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য নামে একটি বুক রিভিউ খুঁজে পান।

পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাদের বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত আরক-সংকলন সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। পুরনো বইয়ের দোকান, কারো ব্যক্তিগত লাইব্রেরি, কোথাও গেলে কোন সংকলন চোখে পড়লে মল্লিক ভাইয়ের কোন লেখা আছে কিনা সেটা সার্চ করা শুরু করি। এভাবে খুটে খুটে টুকরো টুকরো সংগ্রহে আমাদের এই সংগ্রহশালা সমৃদ্ধ হতে থাকে।

১৪ জুলাই ২০১৯ কবি আহমদ বাসির ভাইয়ের কাছ থেকে বেশ কিছু লেখা সংগ্রহ করি। তিনি আমাদেরকে, দ্বীন কায়েমের পথে চলার, আজকের দেশের সব শত্রুকে, বাংলা ভাষার নাম, ভাষার জন্যে করেছি লড়াই, আল্লাহর পথে যারা দিয়েছে জীবন, এখনও অনেক ধৈর্য ধরতে হবে, আমাদের বুকে লেখা, কাল এখানে ছিল যে, আমরা সবাই গান গাহিব শুধু, শহীদ মালেক আজো আমায় ডাকে, ও আল্লাহ আল্লাহ গো..., আল্লা'র পথে ডাকছো যে-তুমি, তিনি এক, ইয়া সায়্যিদী ইসফালানা, সারা দুনিয়ায় আগুন জ্বলছে কেনো, প্রতিদিন যতো পারো, তুমি যারে চাও পেছনে ফেলতে, মিথ্যা বলা ছাড়লো না যে, মহাবোঝা, তোমার কথাই, চারিদিকে আজ স্বার্থের হানাহানি, মোরতাদ অভিশাপ ছাড়া কিছু নয়, গদীর লোভীরা দেখ সারাদেশ জুড়ে, কাশ্মীরে যত ফেলে থাবা হায়নারা, ভুলে ভুল করা, কঠিন হৃদয়, এই মহা পৃথিবীর পাত্র থেকে, এসো না আজ সবাই মিলে ঐক্য গড়ি নামে গুরুত্বপূর্ণ গান পাঠান। এবং সার্চ করলে আরো কিছু রচনা পাওয়া যাবে এটি আমাদের জানান। আমিও পরে আবার যোগাযোগ করবো এটি তাঁকে জানিয়ে রাখি।

২১ জুলাই ২০১৯ ইয়াসিন মাহমুদের দেওয়া সোর্স অনুযায়ী চট্টগ্রামের বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স থেকে প্রকাশিত শিশু-কিশোর দ্বীন দুনিয়ার সম্পাদক জনাব মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ স্যারের সাথে কথা বলি। মল্লিক ভাইয়ের কথা বলায় উনি আন্তরিকতা দিয়ে বিষয়টি দেখেন। কথা বলার সপ্তাহ খানিকের মধ্যে মাসিক শিশু কিশোর দ্বীন দুনিয়ার আর্কাইভ থেকে বেশ কিছু লেখা স্ক্যান করে ই-মেইলে পাঠিয়ে দেন। প্রাপ্ত লেখা থেকে 'কবিতার প্রতি ভালোবাসা, ঈদের রাতে, ঈদের কথা, বইকে তুমি বন্ধু করো' এই ৪টি কবিতা ফাইনাল করতে সক্ষম হই। লেখাগুলো শিশু কিশোর দ্বীন দুনিয়ায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত।

০৫ আগস্ট ২০১৯ তৎকালীন কিশোরকণ্ঠ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী সম্পাদক রাজিবুর রহমান পলাশের সাথে মল্লিক ভাইয়ের রচনাবলী প্রকাশের সার্বিক বিষয় শেয়ার করি। আমরা যে সারাদেশে মল্লিক ভাইয়ের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা লেখা সংগ্রহ করছি এবং সেই সাথে রচনাবলী প্রকাশের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে চাই সে ব্যাপারে তাগিদ বুঝালাম। তিনি বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নেন এবং তোফাজ্জল হোসাইন ভাইকে দায়িত্ব দেন। তিনি কিশোরকণ্ঠ ও মাসিক ছাত্রসংবাদের বিশাল একটি ভলিউম থেকে বাছাই করে যে লেখাগুলো দিয়ে সহযোগিতা করেন- মাসিক নতুন কিশোরকণ্ঠের বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত- সালাম ও শুভেচ্ছা, মানুষের গান, এবার আমার ঈদটা যেন, গীবতকারীরা নামে চারটি কবিতা, এক অহংকারী শাহজাদীর কথা ও দাদীর উপদেশ নামে ২টি গল্প, সেই সে ঈদের দিনগুলো নামে একটি স্মৃতিকথা এবং মাসিক ছাত্রসংবাদে

প্রকাশিত ‘এই অবরোধ’ নামে একটি কবিতা ও শহীদ মালেক আজো আমায় ডাকে নামে একটি প্রবন্ধ।

৪ ডিসেম্বর ২০১৯ অফিসিয়াল একটা কাজে নীলক্ষেতে যান ইয়াসিন মাহমুদ। সেখানে কবি ও সম্পাদক সীমান্ত আকরামের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি মনির উদ্দিন ইউসুফের ছেলের বাসায় যাচ্ছিলেন। তাঁর হাতে ইশারফ হোসেন সম্পাদিত একটি বই দেখতে পান। এটি একটি কবিতার সংকলন। বইটি ইসলামিক একাডেমি দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৫ সালে প্রকাশ করেন। সেখানে ইয়াসিন মাহমুদ তাঁর অনুসন্ধানী চোখে খুঁজে বের করেন ‘তোমাদের মতো’ নামে রাসূল (সা.) কে নিবেদিত মল্লিকের একটি কবিতা।

১০ জানুয়ারি ২০২০ জরুরী ভিত্তিতে রচনাবলী সংগ্রহের বিষয়ে আহমদ বাসির ভাই, ইয়াসিন ভাই, মনির ভাইকে নিয়ে বসলাম। সেখানে সংগ্রহ কার্যক্রমের আপডেট তুলে ধরলাম। সমস্যাগুলোও সামনে আনলাম। সমস্যার মধ্যে একটি ছিলো কিছু ভাইয়ের মান-অভিमानে তাঁদের কাছে থাকা কবির রচনাসমূহ না দেয়া। আমরা বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করলাম। আমার যতটুকু মনে পড়ে বাসির ভাই সেদিন বলেছিলেন ‘মনোয়ার ভাই চিন্তা করবেন না, মল্লিক ভাই তাঁর লেখাগুলো লিখেছেন আল্লার দ্বীনের জন্য, আল্লাহই এগুলো সংরক্ষণ করবেন, আর কেউ যদি এগুলো পুড়িয়ে মাটি করে দেয়, তারপরও মাটি ফেড়ে এগুলো আল্লাহ আপনার কাছে পৌঁছে দিবেন।’ তাঁর কথাগুলো ঐদিন আমাকে বড় সাহস যুগিয়েছিল। তিনি ধৈর্যের পারদ ঢেলে দিয়েছিলেন। মিটিংয়ে এ বিষয়ে তাঁদের সাথে ধৈর্যের সাথে যোগাযোগ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সংগ্রহের কাজ নতুন মাত্রায় শুরু হয়। কয়েক দিন পর আহমদ বাসির ভাইয়ের ফোন পেলাম, ‘উনি উচ্ছ্বাসের সাথে বললেন আমি আলমারির যে চাবিটি পাচ্ছিলাম না, সেটি পেয়ে গেছি আলহামদুলিল্লাহ। উনি বললেন আগামীকালই আপনাকে আপডেট দিবো ইনশাআল্লাহ। ঠিক তাই করলেন, পরদিন আনন্দের সাথে জানালেন অনেক লেখা পেয়েছি ইয়াসিন মাহমুদকে পাঠাবেন লেখাগুলো আপনার নিকট পাঠাবো। আমি আর দেরি না করে ইয়াসিন ভাইকে পাঠিয়ে দেই। ঐদিনই আহমদ বাসির ভাই যে লেখাগুলো দেন সেগুলো হলো- হতাশার কথা তুমি বলো না, আমাদেরই নাফরমানি, আমি তো আমার চেয়ে তোমাকে, আল কোরআনের পথ, আবুল কাশেম পাঠান, শহীদ হবার ভাগ্য, খানজাহানের পুণ্যভূমি, ইহুদীরা সময়ের শত্রু, হে করুণার আধার খোদা, যার কাছে প্রিয় বেশী, এক শহীদের রক্ত হতে, আল-কোরানের পথে, ঐক্য গড়ি, সারাদেশ জুড়ে আজ, চারিদিকে আজ স্বার্থের হানাহানি, যার যা খুশী, কাল দিয়েছো বেরুবাড়ি, পৃথিবীর শান্তি, তোমাকে স্মরণ করতে দেখেছি, কেউ না করুক, পৃথিবীর মাঝে নিজেকে এবার,

যখন দেশের সিংহাসনে, কিশোর কচি শীষ মোহাম্মদ, সুন্দর চোখ মুখের মানুষ, মিথ্যে কথা বলবো না, পাপ ছাড়ে না, ফুলের সুবাস, বৃষ্টি নামার পরে, শীত সকালেও শীত রাত্রেও, শীত যেন চাবুক আজ, আয় শীতে যাই গাঁয়ে, আমার গোনাহ অঁথে তবু, চোখ জুড়ানো গাছের সারি, এমন গজব কেউ কখনো, কিছু কিছু, বল ওরে বল বিজয় ওরে, কোন সাহসে চাও নেভাতে, কার কতটা ঈমান আছে, শাহজালালের তলোয়ার দেখে আমি, দু'টি নয়ন মুদিলে, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা, মূর্তি নিয়ে থাকবে, রসূল আমার পথ যে দেখান, পৃথিবীতে যত পড়ে শহীদের খুন, শহীদ মালেক আজো আমায় ডাকে, ঈদের গান, রমজান এলে, আল্লাহ যদি বিজয়ই দেন, যখন গভীর হয় রাতের আঁধার, চারিদিকে সন্তাস, আল্লা'র রাহে জেহাদ না করে, চেচনিয়া চেচনিয়া, আফগান, বাংলাদেশের মদিনায় ঐ দেখো, শাহজালালের সন্তানেরা, তোমার অভাবে অলস ছন্দ।

০২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ এমফিল থিসিস জমাদানের কাজে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়াতে যান ইয়াসিন মাহমুদ। সেই সুবাদে তিনি প্রফেসর ড. কামরুল হাসান স্যারের বাসায় যান এবং স্যারের সাথে মোবাইলে আমাকে কথা বলিয়ে দেন, স্যার প্রিয় কবির রচনাবলী প্রকাশের কথা শুনে খুবই খুশি হন। স্যার তাঁর লাইব্রেরিতে কিছু আরক সংকলনে কবির লেখা থাকার কথা বলেন। ইয়াসিন মাহমুদ স্যারের ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে সার্চ করে প্রেক্ষণ এর কিছু পুরাতন সংখ্যা খুঁজে পান। প্রেক্ষণ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫ সংখ্যায় 'ওবায়দুল হক সরকার পরম শ্রদ্ধেয়' নামে একটি কবিতা এবং অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০১ বিশেষ সাহিত্য সংখ্যা ও জানুয়ারি-মার্চ ২০০২ সংখ্যায় 'বাংলা সন : আমাদের ঐতিহ্য' নামে একটি প্রবন্ধের সন্ধান পান।

০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ IRD নতুন অফিসে শিফট করছি। সহযোগিতার জন্য ইয়াসিন মাহমুদকে সাথে নিই। বই-পত্র গোছানোর সময় তাঁর সামনে প্রথম প্রভাত নামে একটি আরক দৃষ্টিগোচর হয়। ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত বঙ্গবিজয়ের ৭৯৩তম বার্ষিকী আরক। সেখানেও খুঁজে পাওয়া যায় 'খিলজির উল্লেখ' নামে একটি কবিতা এবং একটি অভিভাষণ।

০৩ এপ্রিল ২০২০ কবি আহমদ বাসির ভাই পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের বেশ কিছু কাটিং পাঠান। যেখানে আমরা খুঁজে পাই ইকবালের দোয়া, মানুষের কি হলো, ঘোষণা, মহাকবি ইকবাল, ফররুখ আহমদ, শেষাবধি নজরুল, ঈদের আকাশ, ঈদের কথকতা, বুট, দালাল, সুখী, মানুষ, গরু, দলের মানুষ, পদ্য, প্রিয়তম-র জন্য কয়েক পঙ্ক্তি, কবি আল মাহমুদ, ঈদের দিনে, গানের শহর প্রাণের শহর নামে কবির অসাধারণ কিছু গান-কবিতা।

১৬ এপ্রিল ২০২০ শতাব্দী পত্রিকার লেখা সংগ্রহের কাজে ইয়াসিন মাহমুদ ভাইকে বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক হারুন ইবনে শাহাদাতের সাথে সাক্ষাতের জন্য সাপ্তাহিক সোনার বাংলা অফিসে পাঠাই। সোনার বাংলার লাইব্রেরিতে আব্বাস আলী খান সাহেবের উপর ‘মৃত্যুহীন প্রাণ’ নামে একটি স্মারক তাঁর চোখে পড়ে। যেখানে ‘তুমি চেয়েছিলে কুরআনের দিন’ নামে কবির একটি গুরুত্বপূর্ণ কবিতা পাওয়া যায়। আমি ফোনে শাহাদাত ভাইয়ের সাথে কথা বলি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

০৮ মার্চ ২০২০ বাংলাদেশে প্রথম করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয় এবং ক্রমেই এর তীব্রতা বেড়ে পরিস্থিতি ধুমধমে হতে থাকে। দ্রুতই পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভয়াবহ হয়ে ওঠে। স্কুল কলেজসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। পর্যায়ক্রমে সরকার অফিস-আদালতসহ সকল প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয় সরকার। চারিদিক লকডাউন ঘোষণা করা হয়। ফলে সবাই ঘরবন্দী হয়ে যায়। মানুষ বিচরণহীন পৃথিবী যেন ছোট হয়ে আসে। ঘরে বসে বসে দুশ্চিন্তায় কাটে সবার জীবন। এদিকে রচনাবলী সংগ্রহের কাজও অনেকটা স্থবির হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ভাবলাম, সময়টা কাজে লাগানো দরকার। মনির ভাই এবং ইয়াসিন মাহমুদ ভাইকে নিয়ে বাসায় বসলাম কিভাবে সময়গুলোকে বারাকাপূর্ণ করা যায়। গুরুত্বের সাথে আমরা পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং কিছু পরিকল্পনা ঠিক করলাম। ১. যেভাবেই হোক মল্লিক ভাইয়ের অগ্রস্থিত লেখা আমাদের সংগ্রহ করতে হবে। এক্ষেত্রে কখনো বাসায় ছোট করে অথবা অনলাইনে ফলোআপ মিটিং করবো এবং মাঝে মাঝে বাসায় ছোট করে বসবো ২. আমাদের তালিকাকৃত বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত যে সকল স্মারক, সংকলন, ম্যাগাজিন এখনো আমাদের হাতে আসেনি সেগুলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে কুরিয়ারের মাধ্যমে নিয়ে আসা। ৩. ইতোমধ্যে সংগৃহীত স্মারক, সংকলন, ম্যাগাজিন ও পত্রিকাগুলো সার্চ করে কবির নতুন লেখা খুঁজে বের করা। উক্ত পরিকল্পনার আলোকে আমরা কাজ ভাগ করে নিই এবং পরদিন থেকে কাজ শুরু করি।

২৫ মে ২০২০ ছসনে মোবারক সম্পাদিত এবং সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী কর্তৃক ২০১১ সালে প্রকাশিত মল্লিকের গান নামে বইটি অনুসন্ধান করেন ইয়াসিন মাহমুদ। পূর্বে সংগৃহীত গানগুলো বাদ দিয়ে বেশ কিছু গান নতুন সংগ্রহের তালিকায় যুক্ত করেন। সেগুলো হলো- টিক টিক টিক টিক যে ঘড়িটা, গান আমার কাঁদে, কেউ হুঁতে চায় তারার আলো, আশ্রা বলেন ঘর ছেড়ে তুই, কার কতটা ঈমান আছে, জিহাদের মানে হলো বাঁচতে শেখা, একজন মুজাহিদ কখনো বসে থাকে না, জেহাদ করতে চাই, পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়, এই দুটি চোখ দিয়েছে বলে, হে খোদা মোর হৃদয় হতে, রোদের ভেতর

ইলশে গুঁড়ি, কোন সাহসে চাও নেভাতে, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ বীর মুজাহিদ, এখানে কি কেউ নেই।

২৮ মে ২০২০ আমাদের হাতে আসে ইকবাল হাসান সম্পাদিত এবং সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী কর্তৃক ২০১৮ প্রকাশিত একটি বৃহৎ গানের সংকলন ‘সত্য ন্যায়ের গান’। যেখানে সাইমুম প্রকাশিত সকল গানের সংগ্রহ রয়েছে। আমি এবং ইয়াসিন ভাই টানা দুইদিন বিভিন্নভাবে যাচাই বাছাই করে সংগৃহীত গানগুলো নতুন সংগ্রহের তালিকায় যুক্ত করলাম। এটি ছিল এক সাথে পাওয়া বড় সংগ্রহ। সেগুলো হলো- আল্লাহ নামের ডাক গুনেছি, সত্য ঢাকা যাবে না, শাহজালালের সেই, পুলসিরাতের সাথী তিনি, বিপুবী রেনেসাঁর কাফেলার জয়, আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাহ, সত্যের নামে সংগ্রামী ছিল, এই জাগরণ ইসলামী জাগরণ, পরিবেশ যাই থাক ভালো কিবা মন্দ, শপথের শ্বেত পতাকা, রমজানেরই পবিত্রতা করি সংরক্ষণ, রবিউল আউয়াল এলে তোমারি গান গাই, আল্লাহ আমায় ক্ষমা করে দাও, ইসলামী বিপ্লবের বড় প্রয়োজন, শুধু সময় হয় না তাঁর দ্বীনের কাজে, মিছিল আর কবিতার বন্ধন চাই, আল কুরআনকে ভালোবেসে, রক্তই মূলত শক্তি, এই কাফেলা রুখতে পারে সাধ্য কার, আল্লাহর পথে যারা দিয়েছে জীবন, দিন এলো আবার, আমরা একটা নতুন সমাজ, আসছে শতাব্দী তো আমাদের, দেশের মাটি রক্ষা করার, জীবন ফুরিয়ে যদি একদিন মরণ আসে, আমাদের উৎসব আমাদের আয়োজন, যে গানে শেখার কিছু নেই, যে সকল যুবক দ্বীনের কাজে লেগে থাকে সারাদিন, সাগরের ঢেউয়ের দোলাতে, কখন কে যে হারিয়ে যাবা, খারাপ কথাটা না বলাটাও।

৫ জুন ২০২০ কবি আহমদ বাসির ভাইয়ের দেওয়া তথ্যমতে প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ: এক সর্বম্পর্শী প্রেরণা শিরোনামে প্রিয় কবির লেখাটি কয়েকটি পর্বে দৈনিক সংগ্রামে ছাপা হয়। লেখাটির সন্ধানে প্রথমে একদিন ইয়াসিন মাহমুদকে দৈনিক সংগ্রাম অফিসে পাঠাই কিন্তু কূল কিনারা না পেয়ে ফিরে আসে। পরে আবারও সময় নিয়ে ইয়াসিন মাহমুদকে দৈনিক সংগ্রাম অফিসে পাঠাই এবং দৈনিক সংগ্রামের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক বিশিষ্ট ছড়াকার, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক কবি সাজ্জাদ হোসাইন খান এর সাথে কথা বলি, তিনি বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে নেন। সাথে সাথে কবি রেদওয়ানুল হককে এর ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব দেন। তিনি আন্তরিকতার সাথে সংগ্রাম আর্কাইভ থেকে পূর্ণাঙ্গ লেখাটি উদ্ধার করে দেন।

১৬ জুন ২০২০ আমার অফিসের অফিস সহকারী ইমরান আলী মন্ডল ‘সুন্দর সুন্দর সুন্দরবন যে আমার’ নামে গানটি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সংগ্রহ করে দেন। এই গানটি বিখ্যাত একটি গান। কিন্তু আমাদের সংগ্রহে ছিলো না। একটি গান হলেও আমাদের গৌরবের সুন্দরবন নিয়ে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহ।

০১ জুলাই ২০২০ ফররুখ আহমদ জন্মশতবর্ষ স্মারকের কাজে ইয়াসিন মাহমুদকে আহমদ বাসির ভাইয়ের কাছে পাঠাই তিনি বাসির ভাইয়ের কাছ থেকে কবি আবদুল হাই শিকদারকে নিয়ে প্রকাশিত স্মারকে চোখ বুলাতে বুলাতে পেয়ে যান 'কবিতার মতো নাম' কবিতাটি। স্মারকটি ২০১৩ সালে আহমদ বাসির সম্পাদিত 'আশি লক্ষ ভোরের কবি' নামে প্রকাশিত হয়।

১২ জুলাই ২০২০ কবি আহমদ বাসির ভাই মল্লিকের দুটি কবিতা- ইব্রাহীমের কোরবানী ছিলো, বুশ যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে না নামে এবং নকীব এ প্রকাশিত কবি মতিউর রহমান মল্লিকের মুখোমুখি নামে একটি দুর্লভ সাক্ষাৎকার আমাদের সংগ্রহ করে দেন।

২০২০ সালের আগস্ট মাসজুড়ে মননে মল্লিক নামে আমরা দেশীয় সাংস্কৃতিক সংসদের উদ্যোগে জাতীয়ভাবে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। ঐ আয়োজন চলাকালীন অনেকের সাথে আমার কথা হয়। সবাইকে কবির রেখে যাওয়া রচনা দিয়ে সহায়তা করার অনুরোধ করি। এরপর দেশ-বিদেশ থেকে মল্লিকের ভক্ত-অনুরক্তরা তাঁদের কাছে সংগ্রহে থাকা ছবি, লেখা, চিঠি আমাদের পাঠাতে থাকেন। মননে মল্লিক আয়োজনের এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল। সে সময় আমরা সন্ধান পাই 'সোনার বরিশাল' নামে একটি গানের। পরে ০৫ জানুয়ারি ২০২১ সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী থেকে 'সোনার বরিশাল' নামে গানটি সংগ্রহ করি।

২৭ আগস্ট ২০২০ বই দুনিয়ার জনপ্রিয় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম পাঠাগার ডট কম থেকে ২৪ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ থেকে প্রকাশিত স্মরণিকা থেকে কবির গুরুত্বপূর্ণ একটি অভিভাষণ সংগ্রহ করে দেন ইয়াসিন মাহমুদ।

৩০ আগস্ট ২০২০ রংপুর জেলার সাংস্কৃতিক দায়িত্বশীল জনাব আব্দুল গণি ভাই একটি চিঠি পাঠান। যেটি তাঁকে উদ্দেশ্য করে কবি মতিউর রহমান মল্লিক লিখেছিলেন। চিঠিটি আমরা নতুন সংগ্রহ তালিকায় যুক্ত করি।

১২ জানুয়ারি ২০২১ মল্লিক রচনাবলীর রুটিন ওয়ার্ক হিসেবে নাজিম আল ইসলাম মাহিন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করি। তিনি তাঁর কাছে কিছু ছড়া কবিতার সন্ধান দিলেও তা খুঁজে বের করতে সময় লাগবে বলে জানান। ভাই অত্যন্ত আন্তরিকতার মানুষ এটা জানতাম বিধায় আমিও লেখাগুলো দ্রুত প্রাপ্তির বায়না দিয়ে রাখি। আলহামদুলিল্লাহ দুদিনের মাথায়-শীতল ছায়া, ভোরের আলো, সেই মেয়েটি, মুন্না, রূপা, উপজেলা নামে ৬টি ছড়া তিনি আমাদের দেন। যার সবগুলোই নতুন সংগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়।

১০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, বাচিকশিল্পী শরীফ বায়জীদ মাহমুদ ভাইয়ের সাথে কথা হয়। ভাইকে মল্লিক রচনা সংগ্রহের বিষয়ে আপডেট

জানিয়ে কবির কোনো রচনা তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে কি-না বা অন্য কারো কাছে আছে এমন কোন সোর্স থাকলে জানতে চাই। বায়জীদ ভাই বললেন, না এ রকম কিছুতো আমার সংগ্রহে নেই ভাইয়া। তবে সংগ্রহ কার্যক্রমের অগ্রগতি জেনে খুশি হলেন। ঠিক দু'দিন পর কল দিয়ে বায়জীদ ভাই বললেন- মনোয়ার ভাইয়া, একটি কবিতা খুঁজে পেয়েছি, যেটি মল্লিক ভাই আমাদের বিয়ে উপলক্ষে লিখেছেন। আমরা ওয়ালমেট করে রেখেছি। এটা রচনাবলীতে যাবে কিনা চিন্তা করে দেখ? আমি বললাম অবশ্যই যাবে, আমাকে একটু ছবি দিন প্লিজ। পেয়ে গেলাম 'প্রিয় বায়জীদ ও তাবাসসুম' নামে মল্লিকের অসাধারণ একটি কবিতা।

অনেকদিন ধরেই খুঁজছি 'সুর শিহরণ' এবং 'প্রত্যয়ের গান' নামে দুটি গানের সংকলন। মুরব্বিদের কাছ থেকে শুনেছি এ দুটোই আমাদের প্রথম দিককার সংকলন যেখানে মল্লিক ভাইয়ের অনেক গান আছে। সাইমুমের পরিচালকসহ অনেকের সাথে কথা বলেছি কিন্তু কোনভাবেই পাচ্ছিলাম না। ১ মার্চ ২০২১ প্রিয় মনিরুল ইসলাম ভাই দীর্ঘ প্রত্যাশিত বই দুটি নিয়ে হাজির, আমি তো সংকলন দুটো পেয়ে যারপর নাই আনন্দিত হই। এরপর উন্টিয়ে দেখলাম 'প্রত্যয়ের গান' সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী ১৯৮৪ সালে প্রকাশ করেছে। বইটিতে মল্লিকের অনেক গান পাই। যার অনেক গান ইতোমধ্যে সংগ্রহ হয়েছে। তারপরও সেখান থেকে বাছাই করে জনতার মনে উত্তাল ঢেউ, আমরা জেগেছি জাগাব এবার, জনতার মনে চেতনার শিক্ষা জ্বলছে, শহরের ফুটপাথে নামে ৪টি গান নতুন সংগ্রহের তালিকায় যুক্ত করি।

'সুর শিহরণ' নামে গানের যে সংকলনটি হাতে পেলাম তাঁর প্রথম দিকের পৃষ্ঠাগুলো না থাকায় সম্পাদক, প্রকাশক ও প্রকাশকাল জানা সম্ভব হলো না। তবে সিনিয়রদের থেকে যতটুকু জেনেছি এটিই আমাদের প্রথম গানের সংকলন। সংকলনটি থেকে বল না'রায়ে তাকবীর, ইসলামী রেনেসাঁর কর্মী আমি, ভয় নেই নেই ভয়, মানবতার মুক্তি সনদ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, চোখ রাংগাবার ধারি নাকো ধার, আমরা কারো ভয় করি না, পাহাড় পর্বত উপড়ে ফেলার শক্তি রাখে যারা নামে ৭টি গান নতুন সংগ্রহের তালিকায় যুক্ত করি।

অনেকদিন ধরে 'তৌহিদী চট্টলা' নামে গানটি খুঁজছিলাম কিন্তু কোন সন্ধান পাচ্ছিলাম না। পরে চট্টামের ঐতিহ্যবাহী পান্জেরী শিল্পীগোষ্ঠীর গানের সংকলনে উক্ত গানটি থাকতে পারে বলে ওয়াকিফহাল হই। ৫ জুন ২০২১ অফিসের অন্য একটি কাজে ইয়াসিন মাহমুদকে ফকিরাপুলে পাঠালে সসাসের স্টোর রুমে পান্জেরীর গানের সংকলনটি তাঁর দৃষ্টিপাত হয়। পরে সসাসের তৎকালীন প্রকাশনা সম্পাদক তৌহিদুজ্জামানের কাছ থেকে তিনি সংকলনটি

সংগ্রহ করেন। সংকলনটি আব্দুস সামাদ রাজু সম্পাদিত, পান্জেরী গানের সংকলন ২০২০ নামে। সেখানে তৌহিদী চট্টালা, মজলুম শোনো ওই কাঁদে, আমাদের রুখতে চাবে, পাহাড়ের পাশ দিয়ে, অশেষ সম্ভাবনার কুসুম, পান্জেরী নামে পান্জেরী শিল্পীগোষ্ঠীর থিম সং সহ নামে মোট ৬টি গান পাওয়া যায়।

২৫ জুলাই ২০২০ কবি আহমদ বাসির ভাই ‘একজন তুমুল কবি এবং এই বধ্যভূমি একদিন স্বদেশ ছিলো কাব্যগ্রন্থ’র রিভিউ ও ‘আবদুর রহমান সাহিদ আত্মহত্যা করছে’ শিরোনামের নামের একটি গল্প আমাদের দেন।

৩০ জুলাই ২০২১ মতিউর রহমান মল্লিকের অগ্রস্থিত লেখার সোর্স হিসেবে এবার বিভিন্ন সংকলনে চোখ রাখার চেষ্টা করি। ভাবলাম আমার নিজের লাইব্রেরিতে কি আছে দেখি। সেখানে সমন্বিত সাংস্কৃতিক সংসদ সসাসে থাকাকালীন ২০১৬ সালে আমার প্রকাশিত ‘সাম্যের গান’ ও ‘ফুল পাখিদের গান’ নামে দুটি গানের সংকলন খুঁজে পাই। মলাট উন্টিয়ে দেখি এই সংকলনের বহু গানই আমাদের নতুন সংগ্রহের তালিকায় আসেনি। কবি ইয়াসিন মাহমুদকে সাথে নিয়ে কয়েকদিন যাচাই বাছাই করে ‘সাম্যের গান’ থেকে যেমন তুমি দিলে জমিন দিয়েছো আসমান, আয় না সবাই এক হয়ে যাই, প্রশংসা সবই কেবল তোমারই, মিথ্যাবাদীর বন্ধু হয়ো না, চরিত্রবান মানুষ ছাড়া বন্ধু বাছাই করবে না, ঈদ এলো মানুষের জন্য, আল্লাহকে সত্যি ভালোবাসে যে, ওদের ঘরে সুখ দিও গো দিও সাক্ষ্যনা, বর সাজিয়ে দিলাম তোমায়, আবার এলো রমজান, এক হও মুসলিম এক হও আজ, মানুষকে ভালোবেসে লাভই বেশি, বিজয়ের দিন হোক শপথের দিন, তলায়াল বাদরু আলাইনা, যার এতায়াত করলে জীবন নামের গানগুলো নতুন সংগ্রহের তালিকায় যুক্ত করি।

৮ আগস্ট ২০২১ নতুন সংগ্রহের ধারাবাহিকতায় সমন্বিত সাংস্কৃতিক সংসদ থেকে প্রকাশিত শিশুতোষ নির্বাচিত গানের সংকলন ‘ফুল পাখিদের গান’র পৃষ্ঠা উল্টাতে থাকি। এবং এখানেও যাচাই বাছাই করে অনেকগুলো গানের সন্ধান পাই। সেগুলো হলো- হঠাৎ শাপলা দেখে থমকে দাঁড়াই, দু’চোখ ভরে দেখি তবু তৃষ্ণা মেটে না, পড় এবং পড়, যে কোন কাজ কর না ভাই, মন দিয়ে লেখাপড়া মন দিয়ে খেলা, কারোর সাথে দেখা হলে, মনের মধ্যে থাকে যদি, সূর্য ওঠার আগে ওঠো, পরের জন্যে করলে কিছু, নিয়ম মতো চলার ভেতর লুকিয়ে আছে গতি, সাহস আছে বলেই আমি, নিজের দাঁতটা নিজেই মাজো, বৃষ্টি হলো এক পশলা, গাছের দিকে তাকাও যদি, বই পড় বই পড়, বই পড়রে, খোটা দিয়ে কথা বলা ঠিক নয়, পাপা-বাবা ভাল্লাগে না, পরীক্ষা হয় যতই কঠিন।

১৮ সেপ্টেম্বর ২০২১, সুলতান আহমদ সম্পাদিত এবং ২০১২ সালে প্রকাশিত 'মল্লিক সে তো গানের পাখি' নামে একটি স্মারক থেকে কবির গুরুত্বপূর্ণ ছড়ার পাণ্ডুলিপি 'পদ্মপালগীতিকা' সংগ্রহ করেন ইয়াসিন মাহমুদ। তিনি ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ পাঠাগার ডটকম লাইব্রেরি থেকে কিশোরকণ্ঠ গল্প সমগ্র-১ সংগ্রহ করেন। যেখানে আমরা খুঁজে পাই অনুবাদ গল্প: অচেনা অশ্বারোহী।

একবার বাংলা সাহিত্য পরিষদ খন্দকার আবদুল মোমেন সম্পাদিত প্রেক্ষণ পত্রিকার পুরাতন কপি স্বল্পমূল্যে বিক্রির ঘোষণা দেয়। বিষয়টি দেখে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ আমি ইয়াসিন মাহমুদ ভাইকে তা সংগ্রহের কাজে পাঠাই। সেখানেও একটি গল্পের সংকলন তাঁর নজরে আসে। সংকলনটি বাংলা সাহিত্য পরিষদ ১৯৮৫ সালে 'নির্বাচিত গল্প' নামে দেশি-বিদেশি বেশকিছু গল্পকারের গল্পের সমন্বয়ে প্রকাশ করে। সংকলনটি সংগ্রহের জন্য আমি বাংলা সাহিত্য পরিষদের উপ-পরিচালক তোহিদুর রহমান ভাইয়ের সাথে কথা বললে তিনি আন্তরিকতার সাথে একাঙ্গে সহযোগিতা করেন। আমরা এ সংকলনে খুঁজে পাই 'এক পেয়ালা অশ্রু' এবং 'বেদীন' নামে কবির দুটি অনুবাদ গল্প।

২০ অক্টোবর ২০২১ ইয়াসিন মাহমুদ ভাই জানুয়ারি-মার্চ ও এপ্রিল-জুন-২০১১ মল্লিক স্মরণ সংখ্যায় প্রকাশিত হায়দার আলীকে লেখা একটি চিঠি এবং ২০১৩ সালে প্রকাশিত উৎসঙ্গ, সাজ্জাদ হোসাইন খান সংখ্যায় প্রকাশিত সাজ্জাদ হোসাইন খানকে লেখা একটি চিঠি বাছাই করে দেন। ১৯ নভেম্বর ২০২১ প্রেক্ষণ-শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি সংখ্যা (জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০০১) সংগ্রহ করেন। সেখানে আমরা খুঁজে পাই 'সংস্কৃতির স্বপক্ষে' নামের একটি প্রবন্ধ।

১৫ নভেম্বর ২০২১ আমার মল্লিক রচনাবলী সংগ্রহের অগ্রগতি পর্যালোচনার বিষয়ে আবারও বসি। বিভিন্ন জনের দেয়া তথ্যসূত্র মোতাবেক যে রচনাগুলো পাচ্ছি না তা নিয়ে সেখানে বিস্তার আলোচনা হয়। যার মধ্যে বিশেষ করে 'হাদীসের আলোকে কবি ও কবিতা' প্রবন্ধ ছিলো অন্যতম। আমাদের আলোচনায় উঠে আসে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র প্রকাশিত স্মারক সংগ্রহের বিষয়। কারণ ইতোপূর্বে সংগৃহীত কিছু স্মারক থেকে গুরুত্বপূর্ণ লেখা পেয়েছি। ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র এদেশের সুস্থধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংগঠন। সংগঠনটি এ যাবত অনেক স্মারক-সংকলন প্রকাশের কাজ সম্পন্ন করেছে। একসময় কবি মতিউর রহমান মল্লিক এই সংগঠনের সভাপতি ছিলেন। এ মিটিংয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিই তাঁদের প্রকাশিত সকল স্মারক সংগ্রহের। বর্তমান সভাপতি যাকিউল হক জাকি ভাইয়ের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলি। উনি আন্তরিকতার সাথে সার্বিক সহায়তার বিষয়ে নিশ্চয়তা দেন। এর দুদিন পরেই আমি ইয়াসিন মাহমুদকে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের অফিসে পাঠাই। তিনি সেখানে 'চলো যাই চলো সেন্টমার্টিন' (সমুদ্রের ঘ্রাণ- কক্সবাজার সেন্টমার্টিন-ছেঁড়াদ্বীপ ভ্রমণ স্মারক

২০০৭ ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতিকেন্দ্র) এবং ‘হয়তো সূর্য নেই সশরীর’ (সীরাতে আরক- ২০০৪, প্রকাশনায়- ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র) নামে ২টি নতুন লেখা পান। এ যাত্রায়ও ‘হাদীসের আলোকে কবি ও কবিতা’ পেলাম না।

এর কয়েকদিন পর ইয়াসিন মাহমুদ ভাই বললেন- মনোয়ার ভাই ‘হাদীসের আলোকে কবি ও কবিতা’ প্রবন্ধটি রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হয়েছে বলে জানতে পারলাম। আমার বাড়ীতেও কিছু আরক আছে, সেখানে ওটা থাকতে পারে। আমি দ্রুত এটি সংগ্রহের বিষয়ে বললাম। ইয়াসিন ভাই তখন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘বাংলাদেশে ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা ও প্রসার (১৯৭১-২০১০) বিষয়ে এমফিল গবেষণারত। তাঁরও গ্রামের বাড়ী থেকে পূর্বে সংগৃহীত কিছু বই আনা দরকার ছিল বিধায় উনি পরের সপ্তাহেই গ্রামের বাড়ী গেলেন এবং নিজের পাঠাগার থেকে কবির অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ লেখা পেয়ে আমাকে জানালে আমি যারপর নাই খুশি হলাম। কারণ দীর্ঘদিন খুঁজেও ‘হাদীসের আলোকে কবি ও কবিতা’র মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটি পাচ্ছিলাম না। ২৬ নভেম্বর ২০২১ তিনি সরদার আবদুর রহমান সম্পাদিত রাজশাহী সংস্কৃতিকেন্দ্রের যুগপূর্তি উৎসব আরক ২০১৩ ‘দিগন্ত’ এ প্রকাশিত ‘হাদীসের আলোকে কবি ও কবিতা’ নামে প্রবন্ধ, আযাদ আলাউদ্দীন সম্পাদিত, হেরাররশি শিল্পীগোষ্ঠীর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আরক ২০০৪ এ প্রকাশিত ‘উপশমহীন এক কষ্টের স্মৃতি’ নামে একটি প্রবন্ধ, শাহিদ উল ইসলাম সম্পাদিত কবিধ্বনি, আবদুল হাই শিকদার সংখ্যা, প্রকাশকাল ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০০২ এ প্রকাশিত ‘একজন কবি আবদুল হাই শিকদার’ নামে একটি প্রবন্ধ, মইম সুমন সম্পাদিত ‘শ্রুতি’, ২০০৮ এ প্রকাশিত ‘প্রথম অডিও গ্র্যান্ডবাম : প্রসঙ্গ কথা’ নামে একটি স্মৃতি প্রবন্ধ, শাহিদ উল ইসলাম সম্পাদিত কবিধ্বনির নবম সংখ্যায়, আসাদ বিন হাফিজ সংখ্যায় কবিকে নিবেদিত আসাদ বিন হাফিজ নামের একটি ছড়া আমার হাতে তুলে দেন।

দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বাসীধারার বেশকিছু সাহিত্য সংগঠন আছে; যারা দীর্ঘদিন ধরে সুস্থ ধারার সাহিত্য-সংস্কৃতির কাজ করছে। এর মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্দীপন সাহিত্য পরিষদ অন্যতম। এ পরিষদ থেকে ‘নির্বর’ নামে একটি পত্রিকা বের হয়। যার বয়স এখন প্রায় ত্রিশ। একদিন নিয়মিত ফলোআপ মিটিংয়ে ইয়াসিন মাহমুদ- নির্বর পত্রিকার কথা বললে বিষয়টি তাঁকে দেখার জন্য বলি। উনি পত্রিকাটির তৎকালীন সম্পাদক ওয়াহিদ জামান ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করেন। ২৬ নভেম্বর ২০২১ ওয়াহিদ জামান ভাই খুবই আন্তরিকতার সাথে তাঁর সংরক্ষণে থাকা সকল সংখ্যা ঘেটেঘুটে ‘শুরু, চলে যায়, সাম্প্রতিক, সঙ্গ’ নামে ৪টি কবিতা আমাদের পাঠান।

২৭ নভেম্বর ২০২১ বিশিষ্ট লেখক ও সম্পাদক বদরুল ইসলাম মুনীর ভাই আমাদের IRD অফিসে আসেন। নির্ধারিত কাজ শেষ হলে আমি ভাইকে মল্লিক রচনাবলী প্রকাশ করার পরিকল্পনার বিষয়টি অবহিত করি। বদরুল ইসলাম মুনীর ভাই সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ে চিন্তক এবং মল্লিক ভাইয়ের খুব কাছেই একজন মানুষ। তিনি বিষয়টি জেনে খুব খুশি হলেন। এবং বললেন আমরা বিবর্তন নামে একটি সাহিত্য সংগঠন করেছিলাম। মল্লিক ভাই ‘বিবর্তন সংগীত’ নামে আমাদের সংগঠনের থিম সং লিখে দিয়েছেন। আপনি চাইলে এটা আপনাকে দিবো। আমি পাওয়ার আকুতি জানালাম। ভাই তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরি সার্চ করে একদিন পরই আমাকে পাঠালেন। আমি ফোন করে কৃতজ্ঞতা জানালাম এবং গানটি নতুন সংগ্রহের তালিকায় যুক্ত করে নিলাম। তার কিছু দিন পরে গঙ্গরাজ এবং একজন মোসতফা কামাল নামে আরেকটি কবিতা পাঠালেন।

২৮ নভেম্বর ২০২১ দেশীয় সাংস্কৃতিক সংসদ এর মুখপত্র ‘শতাব্দী’র ডেভেলপমেন্ট নিয়ে একটি মিটিং করি পত্রিকাটির প্রকাশক ড. আ জ ম ওবায়দুল্লাহ ভাইয়ের সভাপতিত্বে। পত্রিকাটির সহকারী সম্পাদক হিসেবে ইয়াসিন মাহমুদ এবং মনিরুল ইসলামও ছিলেন মিটিংয়ে। ওবায়দ ভাই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত পত্রিকা দেখার জন্য বলেন, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত ‘নোঙর’ পত্রিকাটিও দেখার জন্য বলেন। আমরাও তাই করেছিলাম। ইয়াসিন মাহমুদ আমাদের সংগ্রহে থাকা নোঙরের সকল সংখ্যাগুলো দেখতে যেয়ে পেলেন ‘কখনো জীবন যেন’ নামে মল্লিকের একটি কবিতা। কবিতাটি নোঙর, পঞ্চম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০০৭ এ প্রকাশিত।

৩০ নভেম্বর ২০২১ কবির সহধর্মিণী সাবিনা মল্লিকের সাথে দেখা করতে তাঁর বাসায় যাই আমি ও মনিরুল ইসলাম। ভাবীর সংরক্ষণে থাকা কবির লেখার খাতার একটি বাউন্ড দিলেন। সেখান থেকে- শিমুল আগুন এবং ভাষার উচ্চায়, চেতনা, সার্ক, কারো ভাগে আগুন পড়ে, যেসব ছেলে-মেয়ে, পাতাবাহার, বৃষ্টি আসে গো, মায়ের-বাপের কথা শোনা, পুরস্কার, চরিত্র-বল, পড়ালেখা করে না যে, লেনদেন যে ভালো নয় সে নামের কবিতা এবং শহীদ মুজাহিদ, শিল্পীর কাজ, বাংলা ভাষার নাম, আমার দেশের তরে, কাজের মানুষ, ধৈর্যের গান, আমরা গান লিখি, সবার ভাগ্যে জোটে না, কষ্টের এক অমূল্য তালিকা, কবি ও একটা মৈও-এর গল্প, নয় নয় নয় কোন কল্পনা, এক অনুপম সত্যের, ঈমান এনেছি এই, অবিচল থাকো সংযত থাকো, ভালো কাজের ভালো ফল, সত্যিকারের বিশ্বাসী লোক, সবটুকু জেনে দাও ফতোয়া, মানুষ হিসেবে যারা অধম, বদলেছে ভাই যুগের হাওয়াও, পবিত্রতার পরশ ছড়ায়, ভাগ্যের যত বন্ধ দুয়ার, রেজেক যেমন বস্টন হয়, কাজ-খিয়-লোক, পদবী এবং অর্থ যাদের, নিয়মনীতি, অপসংস্কৃতি, আবার উঠেছে শোর, দাওয়াত পেলে যাওয়াই ভালো,

একদিন অপরাধী শান্তি পাবেই, ভালো-মন্দ যাচাই করতে পারে যে, ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক, নামাজ পড়া যেমন ফরজ, সেহরী খাওয়ার সময় ওঠার স্বভাব, পাঁচ বেলা এই ঢাকার শহর, তাফহীমুল কোরান, আঠাশে অক্টোবরের কাহিনী, কুরানের কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ, ইসলামী ব্যাংকের গান, দৈনিক সংগ্রাম, তোমরা যারা বন্ধু ছিলে, যে পারো সে সান্ত্বনা দাও, জীবন দিশেন শহীদ হলেন, বিশ্বের নেতা বিপ্লবী এক স্বাধীনতা প্রিয় জ্ঞানী, গার জোরে নিয়ে যাবে সবকিছু, ইহুদীরা সময়ের শত্রু, ফারাফা বাঁধ দিয়েছিলো যারা, এতো যে হিংসা, মনের পর্দা হলেই তবে, কাজের কাজী-১, কাজের কাজী-২, গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় রাজনৈতিক, অর্থ-বিস্ত-পদ মর্যাদা, পূর্ণ মানুষ হতে হলে, আমরা গান গাই আল্লাহর, আমরা শিল্পী অনুপম, নামের গানগুলো পেয়ে যাই।

২৯ ডিসেম্বর ২০২১ ‘আমাদের সংস্কৃতি : গানের আনন্দে নাটকের ইচ্ছায়’ প্রবন্ধটির সোর্স দেন মরহুম কবি আহমদ বাসির। উনি বলেছেন-পানজেরী শিল্পীগোষ্ঠীর কোন একটি সংকলনে লেখাটি পাওয়া যাবে। এ ব্যাপারে পানজেরীর সাবেক পরিচালক হাফেজ আবদুল্লাহ ও শাফায়েত উল্লাহর সাথে কথা হয়। কিন্তু কোন আশানুরূপ ফল পাওয়া গেলো না। তারপর ভাবলাম চট্টগ্রামের বিশিষ্টজনদের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। পরে ইয়াসিন মাহমুদকে আমীরুল ইসলাম ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে বলি। আমীরুল ভাই, প্রথমে কয়েক দফায় খুঁজলেন। তারপর কিছুদিন পর আমীরুল ইসলাম ভাই বললেন, অনেক কষ্টে ফিস্টিটি উদ্ধার করতে পারলাম। লেখাটি মাসুম জামান জুয়েল সম্পাদিত পানজেরী শিল্পীগোষ্ঠীর উৎসব স্মারক ১৯৯৬ এ প্রকাশিত।

কবি আফসার নিজাম ভাইয়ের সাথে রচনাবলীর কাজে বিভিন্ন সময় কথা বলি ও সোর্স নিই। একদিন বললেন, মনোয়ার ভাই, বাসা গোছাতে গিয়ে মল্লিক ভাইয়ের কিছু ডায়েরি ও লেখালেখির খাতা পেয়েছি। আশা করছি, এর মাঝে কিছু লেখা পাওয়া যাবে। বাসায় আসেন, চা খাই। নিজাম ভাইয়ের দাওয়াত মিস করলাম না। ২ মার্চ ২০২২ ইয়াসিন মাহমুদকে সাথে নিয়ে নিজাম ভাইয়ের মিরপুরের টেকেরবাড়ির বাসায় গেলাম। তিনি আমাদেরকে কবির ৩টি ডায়েরি দিলেন। সেটা নিয়েই ফিরে এলাম। নিজাম ভাই, ইয়াসিন মাহমুদকে সন্তোষ খানিক পরে পাঠাতে বললেন। আমিও তাঁর কথা মতো ইয়াসিন মাহমুদকে পাঠালাম। ঐদিন নিজাম ভাই আরো কিছু কবির ব্যবহৃত খাতা ও নোটপ্যাড আমাকে পাঠালেন। অমূল্য রচনা হাতে পেয়ে অনেক আনন্দিত হলাম। পাতা উন্টিয়ে উন্টিয়ে দেখছিলাম আর মল্লিক ভাইয়ের কথা মনে করছিলাম। নতুন অনেক কিছু পাবো এই আশায় পূর্বের সংগ্রহের সাথে মিলানোরও প্ল্যান করে নিলাম। পেয়েছিও তাই আলহামদুলিল্লাহ। ১ম দিনে সার্চ করে কবির লেখা যে কবিতাগুলো পাই সেগুলো হলো- বাংলাদেশের মানুষ আমি, বড় করো অন্তর

আকাশের মতো, সাজজাদ হোসাইন খান, জাকিরের বিয়ে, হাসানের জন্য, আজমের নাম, হেমন্ত, স্বচ্ছতা, পবিত্রতা, প্রেম, বাংলাদেশের মানুষ আমি, বড় করো অন্তর আকাশের মতো, সাধারণ পদ্য, আন্তরার মানে, আতিথেয়তা, টাকার খেলা, এক হৃদে, আমার একটা নদী ছিল, যেমন গাছ, ভাষাতত্ত্ব, ফলক কবিতা, দেশ বিকানোর কড়চা, আদব যথোচিত, ব্যক্তিত্ব, গাছ, খাদ, আপনার দিকে, একজনই এসেছিলো ধরার ধূলায়, একশত ভাগ কাদের সে তুরূপ, নারীদের গান, শরৎ এলো ধানের ক্ষেতে, বিজয়ের অনিশেষ সুখ, বাঘ সহসা দু'গাল চাটে চাটুক না, উদ্ধত মন উপলব্ধির পত্র কি লেখে না, ক্রুশ, জটি মাसे ।

২য় দিন অনুসন্ধান করে কবির আরো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ লেখা পাই। সেখানে সবমিলে নিম্নোক্ত কবিতা ও গান নতুন সংগ্রহে যুক্ত করি। সেগুলো হলো- রাসূল (সা.)-এর শানে, ডানা খোলার শব্দাবলী, নজরুল, বিদ্যুৎ, মোবাইল, ফলক কবিতা, ধাওয়া, সালমানের বিয়ে উপলক্ষে, বিবাহ বার্তা, দালাল, সাধারণ, অলস, একটা কবিতা, তেল, উল্টোটাই, বৃশ, খতম, ভয় আজ সব দিক, সকল দোষের, সত্যবাদী সমাচার, ঔদ্ধত্য, একদা যখন, ভালো লোক সে হে, আমার ভালো লাগে, একা একা আমি আর বয়ে পারছি না অসুখ। একটা দুটো দোস্ত না, সবচে' বড় বন্ধু সবার, দিতে দিতে হাত আসুক, ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা, খ্যাতির পিপাসা, ভাঙবে না কভু থামবে না তবু, সুস্থ দেহ চাই সুস্থ মন, বাইরের খাবার, ভালোবাসা, এক পশলা, বিজয়ের সূর্যটা, আপনি সূর্য আপনি জ্যোতির আধার, আনুগত্য, কেউ তো লেখে না চিঠি, বইয়ের পড়াই শেষ পড়া নয়, মুসলমানের ধ্বংসের মূলে, শয়তানীতে তারচেয়ে, আল্লাহতালার বান্দা যারা, জীবন-যুদ্ধে বীর-পুরুষের, ঈদের খবর বয়ে আলোময় চাঁদ, শরৎ এলো, বাদলা দিনে, পাখির মতো পাখা মেলতে, হায়াত-মউত তাঁর হাতে, আল্লাহ ছাড়া করবো না তো, পষ্ট কথা পষ্ট করো, কষ্ট করো, একদিন তোমার কিছুই হবে না।

৩য় দিনে অনুসন্ধান করে বেশ কিছু প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, অভিভাষণ পাই। সেগুলো হলো- কবি আল মাহমুদ : তাঁর ৬৩তম জন্মদিনের ঘ্রাণ ও গৌরব, কবি ফারুক মাহমুদ, বেগম ফররুখ : যিনি আমাদের খালান্মা ছিলেন, আমাদের সিদ্দিক জামাল ভাই, প্রিয় কবি গোলাম মোহাম্মদ স্মরণে, ছড়াকার আমিনুল ইসলাম, সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক আহ্বাসন, ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রূপরেখা, বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্র : দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে একটি তাৎক্ষণিক স্মরণ, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার পটভূমি : প্রকৃতি ইতিহাসের সন্ধান, কোরবানীর ঘটনা অভূতপূর্ব, একটি সাংস্কৃতিক কর্মসূচি গ্রহণ করার আগে, কোরানের আলোকে মুসলমান জাহ্নতচিন্তা ও আলোকিত দৃষ্টির অধিকারী হয়ে

থাকে, কে নিজের পরিবার পরিজনের ব্যাপারে জবাবদিহির অনুভূতি, স্মৃতির মানিক : অখণ্ড সাইমুয়ের অখণ্ডাংশ কিছু কিছু, ফ্রান্স সফরের টুকরো স্মৃতি, মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বাংলা ভাষায় সংস্কৃতি শিক্ষা দিবসের তাৎপর্য। এদিন আরও পেলাম বহুল প্রত্যাশিত অনূদিত উপন্যাস- মহানায়ক। তবে সেটা আংশিক। একটি খাতায় মল্লিক ভাইয়ের নিজের হাতে লেখা কয়েকটি পৃষ্ঠা মাত্র। এরপর অনেক অনুসন্ধান করছি কিন্তু এখনো পাইনি। নিয়মিত খুঁজেছি এবং কেউ পেলে আমাদের দিবেন এই প্রত্যাশায় আছি।

১৪ মার্চ ২০২২ মল্লিক রচনাবলীর কাজে ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ স্যারের সাথে আমার কথা হয়। আমরা আমাদের লেখা সংগ্রহের আপডেট তথ্য দিয়ে বললাম, স্যার, এর বাইরে আপনাদের জানা থাকলে একটু বলুন। একদিন স্যার বললেন, 'সাপ্তাহিক সোনার বাংলা'য় মল্লিক ভাইয়ের একটি সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে নব্বই দশকের দিকে। তবে সন তারিখ মনে নেই। স্যারের তথ্য অনুযায়ী হারুন ইবনে শাহাদাত ভাইয়ের সাথে কথা বলি। উনি কাউকে পাঠাতে বলেন, আমি ইয়াসিন মাহমুদকে পাঠাই। তবে আর্কাইভ ঘাঁটাঘাঁটি করে পাওয়া গেলো না। তারপর মাহফুজ স্যারকে আপডেট দিলাম। লেখাটি পাওয়া যাচ্ছে না। স্যার বললেন দেখি আমার বাসায় একটু সার্চ করি। স্যারের সাথে, কয়েক দফায় কথা বলি। স্যার বললেন- না, লেখাটি পাচ্ছি না। সেখান থেকে প্রায় মাস দুয়েক পরে হঠাৎ একদিন স্যারের ফোন। বললেন জিনিস পেয়েছি, কিভাবে পাঠাবো? স্যারকে কুরিয়ারে পাঠানোর অনুরোধ করলাম। এর ৩ দিন পর ইয়াসিন ভাই লেখাটি এনে আমার হাতে দিলেন। এটি পাওয়ার পর আমাদের মাঝে অন্যরকম অনুভূতি তৈরি হলো। সাক্ষাৎকারটি ১৯৯৬ সালের ৮ মার্চ 'সাপ্তাহিক সোনার বাংলায়' প্রকাশিত হয়।

শিল্পী তাওহীদুল ইসলাম একজন অনুসন্ধানী মানুষ। তিনি শিল্প সাহিত্যের সংগ্রাহক হিসেবেও অতুলনীয়। ৬ এপ্রিল ২০২৩ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে তাঁর কোন এক কাজে যান। সেখানে ম্যাগাজিন গুলট-পালট করতে গিয়ে কবির দুটি লেখা পেয়ে যান। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি লেখা দুটি ছবি তুলে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দেন। সেখানে 'মানুষকে এখন মানুষই সন্ধান করে ফিরছে' নামে একটি কবিতা এবং 'তিনি আর উত্তর দেবে না' নামে একটি স্মৃতি প্রবন্ধ পাই।

২৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে বিভিন্ন সময়ে সংগ্রহ করা বেশ কিছু ডকুমেন্ট আমরা অনুসন্ধান করি। সেগুলো পেপার কাটিং, ম্যাগাজিন, স্মারক- সংকলন ছিলো। অনুসন্ধান করে নিম্নোক্ত শিরোনামের গান ও কবিতাগুলো পাই।

১০ এপ্রিল ২০২৩, মনু ইসলাম সম্পাদিত এবং সেন্টার ফর বাংলাদেশ কালচার কর্তৃক ২০০৮ এর সংবর্ধনা স্মারকে প্রকাশিত ‘কালের ফলকে হোক চির অক্ষয়’ নামে একটি কবিতা, নাবিক সংকলন থেকে ‘দেখো, অর্থ’ নামে দুটি কবিতা ইয়াসিন মাহমুদ সংগ্রহ করে দেন।

১০ মে ২০২৩ শেখ আবুল কাসেম মিঠুন ভাইয়ের লেখা সংগ্রহ উপলক্ষ্যে তাঁর কিছু কাগজ পত্র, ডায়েরি গোজগাজ করছি। হঠাৎ ‘শিকশিকার’ নামে ট্যাবলেট সাইজের একটি পত্রিকা চোখে পড়লো। এই পত্রিকাটি ঘেটেঘুটে ‘কফি ও চতুর্দিকে’ নামে ২টি কবিতা পাই। এটি ছিলো শিকশিকার পত্রিকার ৭ম বর্ষপূর্তি সংখ্যা। ৮ম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা- মার্চ ২০০৯, মাহমুদুল হক সম্পাদিত, ফেনী থেকে প্রকাশিত।

২২ জুন ২০২২ ঈদের ছুটিতে তখন সবাই বাড়িতে গিয়েছেন। আমি ঢাকায় আছি। ইয়াসিন ভাই কল দিয়ে বললেন- ভাই মল্লিক ভাইয়ের ২টি কবিতা পেয়েছি। বাড়িতে এসে একটু বইপত্র গোছাচ্ছিলাম। ঘাটতে ঘাটতে লেখা দুটি পেলাম। আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাচ্ছি। দেখলাম দুটি লেখাই নতুন সংগ্রহ। ‘গোলপাতা’ নামে একটি কবিতা। যেটি বাগেরহাটের খানজাহান শিল্পীগোষ্ঠীর ‘গোলপাতা’ পত্রিকায় প্রকাশিত। আরেকটি ‘বৈঁচে রবে চিরদিন’ নামে কবিতা। যেটি ২০০৮ সালে আবু জাফর মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ সম্পাদিত বরিশাল বিভাগীয় ফোরাম, ঢাকা, কর্তৃক প্রকাশিত ‘স্মৃতিতে অন্ধান যারা’ স্মারকে প্রকাশিত হয়।

১২ জুলাই ২০২২ শিল্পী আকরাম মুজাহিদ ভাই একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কয়েকটি গান মোবাইলে গেয়ে শেয়ার করেন। আমি গানগুলি শোনার চেষ্টা করি। আমার কাছে সেটি মল্লিক ভাইয়ের গান বলেই মনে হয়। দেরি না করে ভাইকে ফোন দিলাম এবং গানটি মল্লিক ভাইয়ের কি না জানতে চাইলাম। মুজাহিদ ভাই বললেন হ্যাঁ এগুলো মল্লিক ভাইয়ের পুরনো দিনের গান। ভাবলাম এগুলো এখন কেউতো গায় না, তাই শেয়ার করলাম। উনি বললেন প্রথম যে গানটি শেয়ার করেছি ‘মোদের যাত্রা আল্লাহর পানে’ নামে, এটি শহীদ আবদুল মালেক ভাইয়ের উক্তি দিয়ে মল্লিক ভাইয়ের লেখা। আমি কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম। যাই হোক নতুন গান পেলাম। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম এবং আরো কিছু থাকলে পাওয়ার প্রত্যাশা করলাম। সংগ্রহ তালিকায় নতুন যুক্ত হলো ‘মোদের যাত্রা আল্লাহর পানে, কথায় কাজে মিল দাও আমায়, আল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ’ নামে ৩টি গান।

২৪ জুলাই ২০২২ মল্লিকগীতি প্রকাশের উদ্যোগ হিসেবে উদ্ভাদ তাকজ্জল হোসাইন খান ভাই সহ আমরা বসেছি। সেই মিটিংয়ে মাসুদ রানা ভাইও ছিলেন।

আমি বলছিলাম আপনাদের কাছে মল্লিকের নতুন কোন গান থাকলে দিবেন। তখন মাসুদ ভাই ‘পাষণ পাষণ মন’ নামে একটি গানের তথ্য দিলেন এবং একটু সুরও শুনিয়ে দিলেন। কিন্তু পুরোটা মনে নেই জানালেন। তবে এটা যে মালিক আব্দুল লতিফ ভাইয়ের সুর করা তাও জানালেন। আমি নোট রাখলাম। পরদিন লতিফ ভাইকে ফোনে পেলাম এবং বিষয়টি জানালাম। ভাই তথ্য ঠিক আছে বললেন আর গান লেখার প্রেক্ষাপটও জানালেন, পুরো গান তারও মনে নাই বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন। তবে জাগরণ শিল্পীগোষ্ঠী এটি প্রথম প্রকাশ করেছে এটি জানালেন। পরে তাঁদের কাছেও পেলাম না। একটু নিরাশ হলাম। কিন্তু হাল ছাড়লাম না। গানটির কথা এতো সুন্দর এটি আমাকে পেতেই হবে। আমি ফোন করলাম তৎকালীন সসাসের নির্বাহী পরিচালক ইদ্রাফিল হোসেন ভাইয়ের কাছে। উনি বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নেন এবং কয়েকদিনের মাথায় গানটি সংগ্রহ করে দেন।

২৬ জুলাই ২০২২ ‘পিকনিক’ নামে কবির একটি গুরুত্বপূর্ণ কবিতা সোশ্যাল মিডিয়াতে আমার চোখে পড়ে। পরে চেক করে দেখি এটি আমাদের সংগ্রহে নেই। আমরা নতুন সংগ্রহের তালিকায় এটি যুক্ত করি। কবিতাটি ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র প্রকাশিত স্মরণিকা ‘পিকনিকে শালনায়’ প্রকাশিত হয়।

২৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ইং তারিখে বেশ কিছু ডকুমেন্ট আমরা অনুসন্ধান করি যেগুলো বিভিন্ন সময়ে সংগ্রহ করা পত্রিকার কাটিং, ম্যাগাজিন ও স্মারক-সংকলন ছিলো। অনুসন্ধান করে নিম্নোক্ত শিরোনামের গান ও কবিতাগুলো পাই। খোদা তোমার নামেরই গান, মানুষেরে তুমি সুমতি দাওগো প্রভু, তোমার শিল্পী, চলো চলো চলো মুজাহিদ, সত্যের জন্য আসমান জমিন, অনেক বেশি উদার হলে, মনোনিত প্রতিনিধি, খোদার পথে চলতে গেলে, ইসলাম আসছে সে আসবেই আসবে, তাঁর সে খবর আকাশ দিয়েছে, দেহ আর মন রুগ্ন যাপন, ঈদ আসে না কার ঘরে, আমরা সুন্দর পৃথিবী চাই, এই দুনিয়ার বন্ধু স্বজন যত আছে শোন, আল্লাহর আইন আর, অর্থ-বিস্ত-পদমর্যাদা, সেই অভিমানী, গানের জন্য গান করি না, কণ্ঠতো দেখি, আল্লাহ তালার বান্দা যারা, আল্লাহ ছাড়া করবো না তো, আয় রাসূলের পথে চলি, কেউ যদি চাও এই উম্মতের, মানুষের পরিণাম, আনুগত্য।

১৮ জুন ২০২৩ নাইম আল ইসলাম মাহিন ভাই ‘কে যেন কয় কোরবানী দে’ নামে একটি গান এবং ২১ জুন ২০২৩ ‘ফুলের কুঁড়ি ফুলের কুঁড়ি, গোলাপ ফুলে মন বসে না’ নামে দুটি গান আমাকে পাঠান। এর মধ্যে ‘গোলাপ ফুলে মন বসে না’ নামের গানটি কবির ঘনিষ্ঠজন বিশিষ্ট আইনজীবী এডভোকেট বদরুদ্দোজা এর কাছ থেকে সংগ্রহ করেন।

তরুণ শিল্পী ও সুরকার নাসির উদ্দীন আল্ মামুন ভাই। তিনি জাতীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন সসাসের সহকারী নির্বাহী পরিচালকসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর সাথে কথা বলি মল্লিক রচনাবলী বিষয়ে। তিনি মল্লিক ভাইয়ের একটি গান নিজে সুর করেছেন এবং সেটিসহ গাজীপুর মহানগরীর স্পন্দন শিল্পীগোষ্ঠী মল্লিক ভাইয়ের দুটি গান প্রকাশ করেছে বিষয়টি জানান। আমি দ্রুত সংগ্রহ করে দেয়ার জন্য বললাম। নাসির তাই দুদিনের মাথায় ২৭ জুন ২০২৩ অডিওসহ ‘আয়রে আয় স্ব-বুঝ অবুঝ, কভু আনন্দে কখন ব্যথায় নামে গান সহ দুটি গান মোবাইলে পাঠান। ‘কভু আনন্দে কখন ব্যথায়’ নামের গানটি দীর্ঘদিন খুঁজছিলাম, অনেকের সাথে যোগাযোগ করেছি কিন্তু কোথায় পাচ্ছিলাম না।

১৫ জুলাই ২০২৩ সোশ্যাল মিডিয়াতে একটি পোস্টার আমার দৃষ্টিগোচর হয়। যেখানে ‘সূর্যের দিন এসে ঘন ঘোর আঁধিয়ার’ লেখা সম্বলিত সুন্দর কথামালা দেখি। পোস্টারের নিচের দিকে তাকাতেই ইসলামী ছাত্রীসংস্থার নাম দেখলাম। বিষয়টি অনুসন্ধানের চিন্তা করি। সূত্র ধরে ইসলামী ছাত্রীসংস্থার পেজ ঘুরে দেখলাম। সহজেই অডিওসহ পুরো গান পেলাম। এবং নিশ্চিত হলাম এটি মল্লিক ভাইয়ের লেখা ইসলামী ছাত্রীসংস্থার থিম সং। নতুন তালিকায় যুক্ত হলো আরো একটি গান।

২০ জুলাই ২০২৩ ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ স্যারের পেজে ‘মননে মল্লিক’ নামে একটি লাইভ অনুষ্ঠানের ভিডিও লক্ষ করলাম। খুব মনোযোগ দিলাম নতুন কোন গান পাই কিনা। পরিচিত গানই সবাই পরিবেশন করছিলেন। একটুপর শিল্পী রোকনুজ্জামান এর নাম ঘোষণা হলো, রোকন ভাই ‘যদি গভীর রাতে প্রশ্ন জাগে মনের আগ্নিনায়’ নামে সুন্দর কথামালার একটি গান গাইলেন। যেটি আমার কাছে নতুন বলে মনে হলো। পরে মিলায়ে দেখলাম এটি আমাদের সংগ্রহে নেই। গানটি নতুন তালিকায় যুক্ত করে নিলাম।

৮ মে ২০২৪ ‘গানের জন্য গান করি না সুরের জন্য সুর’ নামে গানটি রাজশাহী থেকে শিল্পী ও সুরকার শোয়েব আলী ভাই মনির ভাইয়ের মাধ্যমে পাঠালেন। গানটি আমার কাছে নতুন বলে মনে হলো। পরে মিলায়ে দেখলাম এটিও আমাদের সংগ্রহে নেই। গানটি নতুন তালিকায় যুক্ত করে নিলাম।

৩০ ডিসেম্বর ২০২৩ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা প্রকাশিত শহীদ স্মরণিকা ‘যে ফুলের দ্বাণ চির অম্লান’ তৎকালীন সভাপতি শাখাওয়াত সজিব সৌজন্য পাঠান। আরকটি মূলত পূর্বে প্রকাশিত কয়েকটি স্মারকের একটি সংকলন স্মারক। ভাবলাম মল্লিক ভাইয়ের কিছু না কিছু পাবো। প্রথমে সূচিপত্র দেখা শুরু

করলাম। পেলাম নিবেদিত কবিতা, একটু খোঁজতেই ‘বানিয়া লুকার সর্বশেষ খবর’ নামে মল্লিকের একটি কবিতা পেয়ে গেলাম।

১৬ জুলাই ২০২৪ মল্লিক রচনাবলী নিয়ে ইয়াসিন মাহমুদ ভাই আর আমি কাজ করছি। হঠাৎ ড. আ জ ম ওবায়দুল্লাহ ভাইয়ের ফোন। তিনি বলেন—তোমার হোয়াটসঅ্যাপ চেক করো, মল্লিক ভাইয়ের একটি লেখা দিয়েছি দেখো। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। কথা শেষ করেই দেখি ‘পাখিও ডাকতে ডাকতে’ শিরোনামের একটি সুন্দর গান। গানটি কোথাও যায়নি বলে মনে হলো, চেক করে নতুন সংগ্রহ তালিকায় যুক্ত করি।

২৫ জুলাই ২০২৪ কবি ও গবেষক ড. ফজলুল হক তুহিনের মাধ্যমে ‘ইয়ে’ নামে একটি কবিতা সংগ্রহ করি। কবিতাটি কবি সাঈদ চৌধুরীর বিয়ে উপলক্ষে লেখা। এটিই আমাদের সর্বশেষ সংগ্রহ।

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত অপ্রকাশিত কয়েকটি পাণ্ডুলিপি (প্রায় সাতশত পৃষ্ঠা) নিয়ে ২০২৪ সালে রচনাবলীর উদ্যোগ নেয়া হয়। যা দিয়ে বড়জোর দুই খণ্ড বের করা সম্ভব হতো। কারণ কবি মতিউর রহমান মল্লিক ছিলেন একজন চারণ কবি। তাঁর জীবদ্দশায় সকল লেখা তিনি একত্রে সংরক্ষণ করে যেতে পারেননি। আবার সব লেখা প্রকাশিত ও গ্রন্থিত হয়নি। সাহিত্য সংস্কৃতির কাজে তিনি দেশের যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই তাঁর সৃষ্টিকর্ম রেখেছেন। এ জন্য কিছুটা দেরিতে হলেও আমরা সারা দেশের আনাচে-কানাচে বিভিন্নভাবে সার্চ করে মল্লিকের অমূল্য লেখনিগুলো একত্রিত করার চেষ্টা করেছি। যা আজ ছয় খণ্ডে বের হচ্ছে। এখানেই আমাদের স্বার্থকতা।

এভাবে খুঁজে খুঁজে মল্লিকের সৃষ্টিসম্ভার একত্রিত করতে না পারলে ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও নতুন প্রজন্মের অপরিমেয় ক্ষতি হতে পারতো।

সংগঠন প্রেমী কবি মতিউর রহমান মল্লিক দেশের গুরুত্বপূর্ণ জনপদে গড়ে গেছেন অগণিত সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠন। সে সকল সংগঠনের স্মারক, সংকলন, ম্যাগাজিন ও পত্র-পত্রিকায় লিখে গেছেন দেশ, মাটি, মানুষ ও বিশ্বাসের কথা। তাঁর অনেক লেখাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বিভিন্ন জনপদের কাগজের পাতায় পাতায়। ফলে কত লেখা লিখেছেন, কাকে কোন লেখা দিয়েছেন সে সত্য বের করা সত্যি দুরূহ। তারপরও তাঁর হাতে গড়া সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠনসহ বিভিন্ন সংগঠন, সংস্থা, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে আমরা যোগাযোগ করেছি। সবাই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা বিপুল সংখ্যক ক্যাসেট, ভিসিডি, বই, স্মারক, সংকলন, ম্যাগাজিন ও পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করেছি। এর কোনোটি ই-মেইলে আবার কোনোটি লোক

মারফত। কবির কর্মস্থলের প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ, বিশেষ করে কবি আফসার নিজাম তাঁর পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ ও সরবরাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ ও সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন মরহুম কবি আহমদ বাসির। দেশীয় সাংস্কৃতিক সংসদের সাহিত্য কর্মকর্তা কবি ইয়াসিন মাহমুদ এবং সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম এ সংগ্রহের ক্ষেত্রে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং কবি পরিবারের সার্বিক সহায়তায় এ সংগ্রহ হয়ে উঠেছে পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ। উল্লেখ্য অনেকেই একই লেখা দিয়েছেন। যিনি যে লেখা প্রথম দিয়েছেন আমরা সেইটিই সংগ্রহের তথ্য তালিকায় উল্লেখ করেছি।

পরিশেষে তাঁদের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা যাদের যত্নে রাখা মল্লিকের সৃষ্টির সন্ধান দিয়ে আমাদের ধন্য করেছেন। মল্লিকের এই অমূল্য সৃষ্টির সন্ধান অব্যাহত থাকবে। আপনাদের সন্ধানে মল্লিক ভাইয়ের অপ্রকাশিত কোন লেখা থাকলে আমাদের অবহিত করবেন। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে তা যুক্ত করা হবে। মল্লিক রচনাবলী প্রকাশের মত এত বড় সৃষ্টিকর্মে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি অনিঃশেষ কৃতজ্ঞতা। বিশেষ করে কবি পরিবারের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা। তাঁদের একনিষ্ঠ সহায়তা আমাদের এই কাজকে গতিশীল করেছে। আমাদের এই সংকলনে আপনার গোচারীভূত যে কোনো ভুলের ব্যাপারে আমাদের অবহিত করবেন। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে আমরা সংশোধন করে নেব।

অ্যালবাম



নাগরিক ফোরামে বক্তব্য প্রদান
করছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক



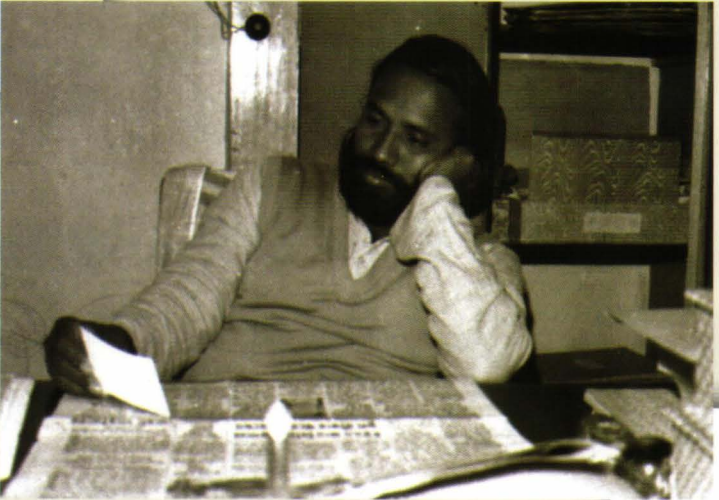
৮০'র দশকে স্টুডিওতে গান রেকর্ডিংয়ে কবি ও শিল্পীবৃন্দ



বাংলা সাহিত্য পরিষদের আয়োজনে ১ম সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলনে
বক্তব্য প্রদান করছেন কবি।



সাহিত্য সম্মাননা ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিকদের
সাথে কবি মতিউর রহমান মল্লিক



ধ্যানে মগ্ন কবি মতিউর রহমান মল্লিক



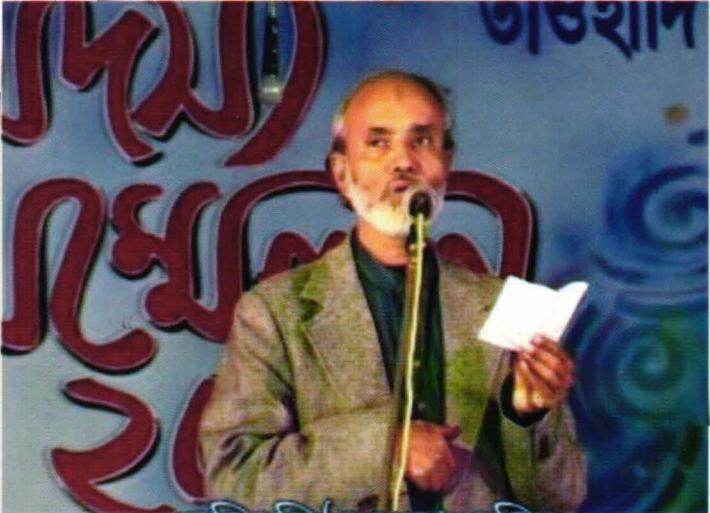
মরহুম আব্বাস আলী খান এর স্মরণসভায় কবি মল্লিক আলোচনা করছেন



সুন্দরবন ভ্রমণে ভিজুয়াল গানে কবি ও ৩জন প্রখ্যাত শিল্পী, গীতিকার ও সুরকার
শিল্পী তাফাজ্জল হোসাইন খান, শিল্পী সাইফুল্লাহ মানছুর, শিল্পী মশিউর রহমান

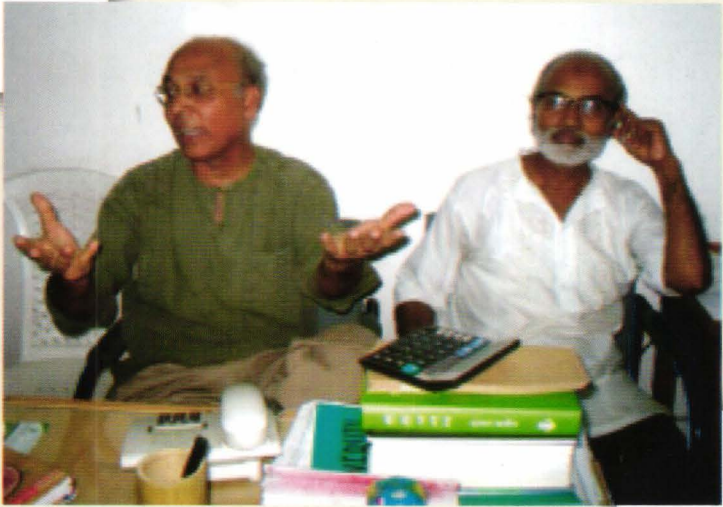


প্রধান কবি আল মাহমুদ এর সাথে কবি মতিউর রহমান মল্লিকের একান্ত মুহূর্ত



সাংস্কৃতিক সম্মেলনে কবিতা আবৃত্তি করছেন কবি

www.nagorikpathagar.org



কবি আবদুল হাই শিকদারের সাথে একান্ত কবিতা আড্ডায় কবি মল্লিক



কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠানে কবির ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ অংশগ্রহণ



WAMY আয়োজিত ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে কবি আল মাহমুদ, সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আব্দুর রউফসহ কবি মল্লিক



মহান স্বাধীনতা দিবসে আলোচনা সভা ও ছড়া-কবিতা পাঠের আসরে কবি মল্লিক



২৬ মার্চ এর আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন কবি মল্লিক



সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠীর উৎসবে সাবেক পরিচালকদের সম্মাননা
ট্রেস্ট প্রদান করছেন কবি



বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্রের শুটিং ফ্লোর, গ্রন্থাগার ও স্টুডিও এর
শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক



পুরস্কার গ্রহণ করছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক



কবি নজরুলের ১০৮তম জন্মোৎসবে
কবি আল মাহমুদসহ অন্যান্য মেহমানদের সাথে কবি



ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ'র ৩৮তম মৃত্যুবার্ষিকীর আলোচনা সভায়
ড. কাজী দীন মুহাম্মদসহ অন্যান্য মেহমানদের সাথে কবি



ফ্রান্সের প্রকৃতির সাথে মিশে কবির চিন্তামগ্ন অবস্থা



ফ্রান্সের নিরিবিলা পরিবেশে সৃজনশীল লেখনীতে ব্যস্ত কবি



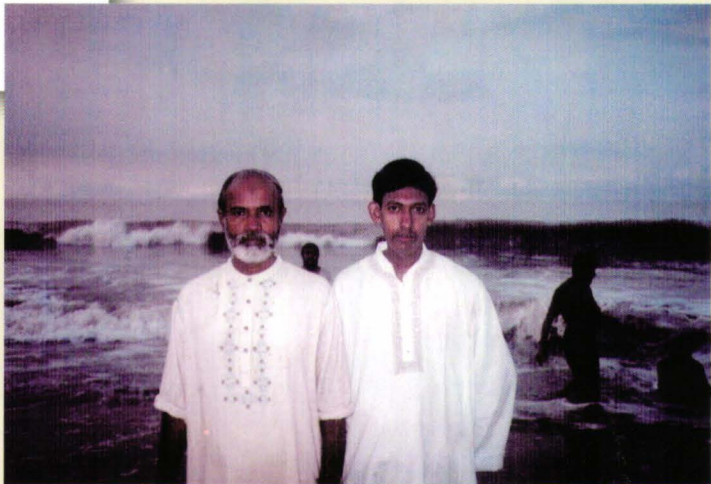
বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি আল মাহমুদকে ফুলেল
গুভেচ্ছা জানাচ্ছেন কবি মল্লিকসহ অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকগণ



বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্রের লাইব্রেরিতে কবি



আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন কবি মল্লিক



সমুদ্র ভ্রমণে কবি মতিউর রহমান মল্লিক

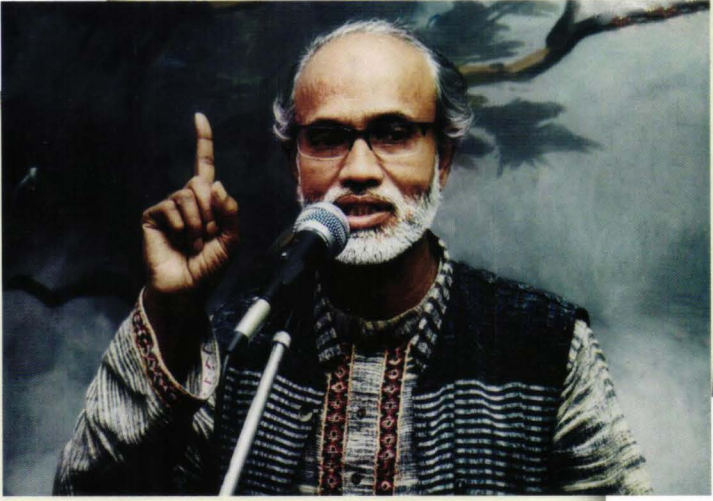


ফ্রান্সের একটি বাগানে ফটোসুটে কবি মতিউর রহমান মল্লিক



বাগেরহাটের কাটাখালী বাজারে 'বাকুইপাড়া ইসলামী সাহিত্য পরিষদ'

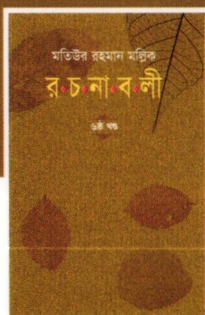
উদ্বোধন করছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক



বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্রের একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত কবি মল্লিক



অসুস্থ কবি হাসপাতালে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে
ভক্তদের সাথে হাস্যোজ্জ্বল কুশল বিনিময়



Motiur Rahman Mollik
Rachanabali- 6th Part

Published on September 2024
Price: 650 Tk only



ISBN: 978-984-98985-2-8